স্বদেশে বিদেশে

ডঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন; কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬২

প্রকাশক

পি. ব্যানার্জী

৯১টি জয়কিষেণ স্ট্রীট

পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী

মুদ্রাকর

পি. কে. পাল

শ্রীসারদা প্রেস

৬৫ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

যাঁদের অনেকদিন হারিয়েছি

কিন্তু যাঁদের আশীর্বাদ কখনও হারাইনি।

দেখেছি, শুনেছি, বুঝেছি কি ?

সুদীর্ঘ (১৮৯১—১৯১১) ঘরে-বাইরের জীবন।

অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, ৮০র কোটায় পা দিয়ে এখন এই লেখা আরম্ভ করেছি। যা ভাল তা অনেক দেখেছি, যা ভাল বলে মনে হয়নি তাও অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, যা বোঝা শক্ত তা বুঝতে চেষ্টা তো করেছি। বুঝেছি কিনা জানি না।

এখন জীবনের শেষ অধ্যায়ে অতীতের স্মৃতি-কথা আর একবার ঝালিয়ে নিলে, নিজের বোধহয় অনেকটাই ভাল লাগতে পারে, অন্যদের কেমন লাগবে জানি নে। তবে নেই কাজ তো খই ভাজ—এই প্রাচীন প্রবচনটি মেনে নিয়ে এই কাজে হাত দিলাম।

রবি ঠাকুরের কবিতার এই লাইনগুলিও আমাকে এই সংকল্পে প্রেরণা দিয়েছে। কবিতার সেই অংশটি হল :—

বুঝেছি কি বুঝি নাই সে তর্কে কাজ নাই
ভাল মোর লেগেছে যে রইল সেই কথাই।

আজ শ্রাবণ মাস (১৩১৭ সাল) বর্ষার দিনে, জীবনের গোড়ার দিকে ফিরে যাচ্ছি। আমার জন্মও হয়েছিল শ্রাবণ মাসে ৮০ বছর আগে। খুব ছেলেবেলার কথা দু-একটির বেশী মনে পড়ে না। যখন আমার দু'বছর মাত্র বয়েস, তখন আমার বোনকে তার জন্মের পরের দিন দেখেছিলাম। আমার চার বছর বয়েসে আমার ভাই সুজনের জন্মাবার আগে অম্বালা থেকে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) ট্রেনযাত্রা খানিকটা মনে আছে। আর ওকে ওর জন্মদিনে যেমন দেখেছিলাম বেশ মনে আছে।

অম্বালায় বাবা ওকালতি করতেন। ওঁর অফিসে, যেখানে ওঁর মুন্সী কাগজ-পত্র নিয়ে থাকত (সেটা ছিল আমাদের বাড়ির সামনে, রাস্তার ওধারে), কয়েকটি ঘর ছিল। সেখানে প্রায়ই দেশ থেকে কোন না কোন অতিথি এসে থাকতেন। এর মধ্যে দুজনকে ভাল করে মনে আছে। একজন ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, আর অন্যটি ছিলেন স্বামী সদানন্দ। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দর অম্বালা আসবার কথা ছিল, তাই তাঁর আসবার কিছুদিন আগেই

এঁরা দুজন এখানে এসেছিলেন ও আমাদের বাড়িতেই উঠেছিলেন। সদানন্দ সত্যই সদানন্দ ছিলেন। আমাকে অনেক গল্প বলতেন—বিশেষতঃ হিমালয়ের কথা। বরফঢাকা পর্বতচূড়া দেখবার যে ঝোঁক আজও আছে, বোধহয় সেই থেকেই তার সূত্রপাত। নিরঞ্জনানন্দ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—তাঁর কাছে আমাদের (আমি ও আমার ভাইবোনের) তেমন জমত না।

স্বামী বিবেকানন্দ অম্বালায় এসেছিলেন, ছাউনিতে (Amballa Cantonmentএ) তাঁর জন্য বাংলো নেওয়া হয়েছিল। আমাদের অতিথি দুজন স্বামীজীও সেখানে চলে গেলেন। বাবা রোজ সন্ধ্যাবেলা নিজের কাজকর্ম সেরে ছাউনিতে (শহর থেকে ৩।৪ মাইল দূরে) যেতেন, আর রাত ৯।১০টা আন্দাজ ওঁদের সঙ্গে দেখাশুনা করে বাড়ি ফিরতেন। আমাদের সেইজন্যে আর স্বামী বিবেকানন্দকে দেখা হয়নি।

মহাপুরুষের দর্শন তো হল না; তবে অম্বালা থাকতেই হিমালয় দর্শন হয়ে গেল। বাবা অম্বালা শহরেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, তেতলা বাড়ি; তার ছাত থেকে ভোরবেলা পুব দিকে সাদা ঝকঝকে বরফঢাকা পাহাড় দেখা যেত। এ দেখিয়েছিলেন মা। বড়ই ভাল লাগত ছেলেবেলায় এই হিমালয় দর্শন। তারপর ৭৩।৭৪ বছর কেটে গেছে—এখনও বরফের পাহাড় দেখলে তো দূরের কথা তার কথা শুনলে প্রাণটা নেচে ওঠে।

অম্বালা ছাড়বার আগে বাংলা ও ইংরাজি পড়া খানিকদূর এগিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা মার কাছে প্রায়ই বাংলা কবিতার বই ও অন্য ছোটদের বই (রবিঠাকুরের নদী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অবনীন্দ্র ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা) পড়তাম, মা'ই পড়তেন, আমরা শুনতাম। ইংরাজি আমি ও মা একসঙ্গেই পড়তাম বাবার কাছে। অম্বালায় থাকতেই Goldsmithএর Vicar of Wakefield আমরা দুজনে শেষ করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে Jane Austinsএর Pride & Prejudice এইখানেই আরম্ভ করা হয়েছিল। সবই কি বুঝতাম? তবে ভাল লাগত।

আর এখানে আমাদের ছোট ঘোড়াটির (বোধহয় kulu pony) কথা ভুললে চলবে না। আকারে খুবই ছোট ছিল, সোনালী রঙ আর মোটাসোটা সুন্দর দেখতে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নিয়ে আসা যেত। আবার তার গায়ে এত জোর ছিল যে আমাদের তিন ভাইবোনকে পিঠে নিয়ে খুব ছোটাছুটি করত। ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাছাকাছি গাঁয়ের অনেক ক্ষেত, সবুজ মাঠ ঘুরেছি। যেমন

দেখতে সুন্দর ছিল, দুষ্টুও ছিল তেমনি। অম্বালা ছাড়বার সময় ঘোড়াটিকেও ছাড়তে হল।

আমরা লাহোরে এলাম বোধ হচ্ছে ১৮৯৯ সালে। আনারকলিতে বাদশাহী আমলের মস্ত সরায়ের সামনে একটি তেতলা বাড়ি, দোতলায় ও তেতলায় আমরা উঠে এলাম। নীচের তলায় বড় বড় দোকান ছিল, আর সামনের বড় রাস্তায় রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত লোকজনের ভিড় চলত।

বাবা লাহোর চীফ কোর্টএ (পরে ঐটি হাইকোর্ট হয়েছিল) ওকালতি করতেন। আমরা আগেকার মতন বাড়িতেই পড়তাম। এই সময় মার সঙ্গে Charles Dickensএর David Copperfield ভাল করে পড়ি। ও বইটির যে কোন জায়গা থেকে যে কোন লাইন কেউ শোনালে আমি তার context ঠিক বলতে পারতাম। এই সময়েই হেমবাবুর (৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), নবীন সেনের ও মাইকেল মধুসূদনের অনেকগুলি কাব্য সবাই একত্রে পড়েছিলাম।

অম্বালা ছাড়বার ও লাহোরে আসার সময় বাইরের জগতে বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল। বাংলা খবরের কাগজ পড়তাম খুব মনোযোগ দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ আর চীনের মুষ্টিযোদ্ধা বিদ্রোহ (Boxer rising) বাংলা 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রে নিয়মিতভাবে পড়া চলত। পিকিংএ ইংরাজ দূতাবাস অবরোধ, জাপানী ও ইউরোপীয় সৈন্যদলের পিকিং আক্রমণ, পিকিং লুট, চীনের বুড়ী রাণীর রাজধানী থেকে পলায়ন এসব খবর শুনতে ও পড়তে কখনও কোন ক্লান্তি আসত না। সেই সময় থেকেই চীনের বিষয় যতদূর সম্ভব জানবার ইচ্ছা সেই ছেলেবেলা থেকেই এখন পর্যন্ত অটুট রয়েছে।

১৮৯৭ সালে অম্বালায় থাকতে রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি উৎসব দেখেছিলাম। লাহোরে আনারকলির বাড়ি থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে অফিস-ফেরতা কেরানীবাবুদের কালো ব্যাজ পরে লাইনবন্দী হয়ে বাড়ি ফেরার দৃশ্যও দেখেছিলাম। যাঁদের ব্যাজ জোটেনি তাঁরা বুদ্ধি করে কালো ছাতাটা খুলে গম্ভীরভাবে বেশ যাচ্ছিলেন অন্যদের সঙ্গে।

১৯০৩ সালে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করি বারো বছর বয়েস পুরো হবার আগেই। সেই বছরই আমরা সবাই কলিকাতা যাই। আমার ঠাকুরদাদার খুব অসুখ করেছিল। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বারাসত থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল, মাস দুয়েক পরে তিনি মারা গেলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঠাকুরদাদা (৺কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) কানপুর সরকারী হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন ছিলেন। সিপাহীরা তাঁকে ধরে তাদের নিজেদের দলের যুদ্ধে আহতদের দেখাশুনা করবার জন্যে আটকে রাখে।

ঠাকুরমা এক দেওরের সাহায্যে কানপুর থেকে নৌকাযোগে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। ঠাকুরদাদার নামে ওয়ারেণ্ট বেরোয় 'To be hanged wherever found' (যেখানে ধরা পড়বেন সেইখানেই যেন ফাঁসী দেওয়া হবে)। দু-তিন বছর অজ্ঞাতবাসের পর অনেক কষ্টে ঐ হুকুম বদলাতে পারা গিয়েছিল। উনি ফিরে এসে বারাসতের হাসপাতালের অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন হলেন, কিন্তু আর প্রমোশন হয়নি। উনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম কি দ্বিতীয় গ্রুপের পাস-করা ছাত্র ছিলেন।

১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধের সময় দেশের ছেলে-বুড়োর মধ্যে কি উত্তেজনা! জাপান, এশিয়ার ছোট একটি রাজ্য, রুশকে—ইউরোপের একটি বিশেষ শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে বড় বড় যুদ্ধে জলেস্থলে হারিয়ে দিচ্ছে। এ তো এক অভাবনীয় ব্যাপার! বেশ মনে আছে এক-একটি যুদ্ধজয়ের খবরে আমরা কি রকম আনন্দ পেতাম। Admiral Togo-র Tsushimaর নৌযুদ্ধে Russian Baltic fleet ধ্বংস, Marshal Oyamaর Mukdenএর মহাযুদ্ধে (Napoleonএর যুগের পরে তখন পর্যন্ত অত বড় যুদ্ধ হয়নি) Russian General Kuropatkinকে পরাজিত করা, Nogiর দুর্ভেদ্য Port Arthur দখল করা—এসব প্রাণমাতানো খবর চীন থেকে নিয়ে পারস্য দেশ পর্যন্ত সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশেও কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লববাদ শুরু হল।

১৯০৫ সালে ফার্স্ট আর্টস (F. A. এখনকার Intermediate Examination) পাস করে গুরুজনদের আজ্ঞায় এক বছর ছুটি ভোগ করা গেল। এতদিন বাড়িতেই পড়েছি, সবায়ের মতে আরও এক বছর পরে কলেজে ভর্তি হলেই হবে। কোন তাড়াতাড়ি নেই। বাড়িতে বেশীর ভাগ বাবার কাছেই পড়েছি। তবে Intermediate (তখন F. A.) stageএ অঙ্কটা কাকাবাবু (৺অসিতচন্দ্র, তিনি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন) আরম্ভ করিয়ে দিয়েছিলেন। জ্যাঠামশায়ের (৺সুরেশচন্দ্র, তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) তখন অসুখ করেছিল—তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর কাছে ভাল করে অঙ্ক শিখি। তিনি M. A Mathematicsএ First class first ও gold medalist ছিলেন, State

Scholarship পেয়েছিলেন, তবে ঠাকুরমার আপত্তি থাকায় বিলেত যাননি।

এই এক বছর ছুটিতে নিজের পছন্দমত বই Scott, Dickens প্রভৃতির বই পড়ে ও লাহোরে খুব বেড়িয়ে কাটানো গেল। ১৯০৬ সালে III yearএ (B. A. Previous classএ) Forman Christian Collegeএ ভর্তি হলাম। ওটি ছিল লাহোরের খুব নামকরা কলেজ, আর আমাদের জানাশোনা সুরেনবাবু (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) ওখানে অঙ্কের প্রফেসর ছিলেন। এই প্রথম বাড়ির বাইরে পড়াশোনা করা। স্কুলেও তো কখনও যাইনি। দিনকতক অস্বস্তি বোধ হয়েছিল। কিন্তু খুব শীঘ্রই সে ভাবটা কেটে গেল।

সেবার আমরা সবাই কসৌলি গিয়েছিলাম। এই প্রথম hill station দেখা। বড়ই ভাল লেগেছিল। ডালিয়া, জিরেনিয়ম প্রভৃতি ফুল এই প্রথম দেখলাম। কসৌলী থাকতেই শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দে মাতরম্' সংবাদপত্র প্রথম পড়ি। দিনকতক পরেই তাঁর কারাবাসের খবর বেরুল—আর 'বন্দে মাতরম্'এ প্রকাশিত হল রবি ঠাকুরের "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতাটি। কবিতাটি লোকের মুখে মুখে আবৃত্তি হত।

আমাদের বাড়িতে অন্ততঃ খানিকটা জাতীয়তাভাব ছিল। লাহোর কংগ্রেসের কয়েক মাস আগে আমাদের বাড়িতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে Sir Surendra Nath Banerjee) দুদিন ছিলেন। সেই সময় তিনি Bradlaugh Hallএর ভিত্তিস্থাপন করেন। সেই বছরেই (১৯০৯এর ডিসেম্বর মাসে) লাহোরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশন হল। তখন কংগ্রেস মধ্যপন্থী, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রবরকার সভাপতি হয়েছিলেন। সুরেন বাঁড়ুয্যে এসেছিলেন, তিলক এসেছিলেন, বোম্বাই করাচী থেকে পার্শী নেতারা এসেছিলেন। মাদ্রাজ, মালাবার থেকেও কপালে তিলক পরা, লম্বা চুলে ঝুঁটি বাঁধা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে বাবা Visitor's ticketএ Bradlaugh Hallএ এই কংগ্রেসের অধিবেশনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুই বুঝিনি, কিন্তু দেশবিদেশের বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশেষতঃ নানা রকমের পাগড়ি, টুপি, ইত্যাদি খুবই ভাল লেগেছিল।

এখন আবার আমার কলেজের IVth yearএর (বি. এ. ফাইনাল) কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আমাকে Double Course Mathematics (Pure & Applied) নিতে হয়েছিল। English অবশ্যই ছিল—অঙ্ক দুটি বিষয়, ইংরাজি একটি। ইংরেজী সাহিত্য খুবই ভাল লাগত (Hale's Longer

English Poems, Autocrat of the Breakfast Table, Essays of Addison and Steel etc. এখনও সুবিধে পেলেই পড়ি)। অঙ্ক মোটেই ভাল লাগত না, তবে বিলেতের পরীক্ষায় ঐ বিষয়েরই বেশী কদর—তাই আমাকে অঙ্ক নিতেই হয়েছিল। খুব খেটেখুটে অঙ্কতে ভাল নম্বরই পেয়েছিলাম আর বি. এ. পরীক্ষায় ফল মন্দও হয়নি। তবে মন ও শরীরের ওপর ধকল বেশীই হয়েছিল। আর বি. এ. পাস করবার সময় (১৯০৮ মে বা জুন) আমার বয়েস সতেরো বছর পুরো হয়নি। পরিশ্রম বেশী হওয়ায় অনিদ্রায় ভুগলাম, আর যখন তার বাড়াবাড়ি হত জোরে জ্বর আসত। শরীরটা ভেঙে পড়ল। এ সময়ে আবার বাবার খুব অসুখ করল। দেশ থেকে বড়দাদা (পিসতুতো ভাই) ও ছোটমামা এসে আমাদের কলকাতায় নিয়ে গেলেন। হাওয়া বদলাতে আমাদের দুজনের শরীর বেশ তাড়াতাড়ি সেরে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে আমরা গোরাবাজার (বহরমপুর) আমার মামারবাড়ি গেলাম।

আমার দাদামশাই (৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বহরমপুরের বড় উকিল ছিলেন—ওঁর মক্কেলদের মধ্যে ওখানকার রাজা, বড় বড় জমিদার প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। খুব লম্বা, খুব ফর্সা একটি প্রতিভাশালী personality ছিলেন আমার মাতামহ। মুখে মুখে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস এমন করে বলতেন যে ছেলেবেলা থেকেই সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসএর কাহিনী আমাদের খুব ভাল করে জানা হয়ে গিয়েছিল—অবশ্য non-official version, ইংরাজদের লেখা বিবরণটা নয়। ১৯২৪ সালে London School of Oriental Studiesএ আমার tutor Prof, Dodwellকে এই আমাদের নিজেদের দিকটা কিছু শুনিয়েছিলাম। তাঁর এসব কথা ভাল লাগেনি।

বহরমপুরে দাদামশায়ের সঙ্গে আমরা দুই ভাই খুব ঘুরেছিলাম। কাশিমবাজার, নসীপুর, কুঞ্জঘাটা রাজবাড়িগুলি উনি আমাদের দেখিয়ে এনেছিলেন। এ তিন জায়গাই ওয়ারেন হেস্টিংসএর স্মৃতির সঙ্গে বিশেষরকম জড়িত। মহারাজ নন্দকুমারের কুঞ্জঘাটার অবস্থা বিশেষরূপে শোচনীয় দেখলাম। দাদামশায়ের খাতিরে আমাদের এইসব জায়গায় খুব ভাল অভ্যর্থনা হয়েছিল।

অসুখ সেরে গেছে তাই নিশ্চিন্ত হয়ে লাহোরে ফিরে এসে আবার এম. এ. ক্লাসে ঢোকা গেল। এবার আর অঙ্ক নয়—ইংরাজি সাহিত্য। পাঠ্যপুস্তকগুলি খুবই ভাল লাগত—বিশেষতঃ কবিতার বইগুলি—Ward's English Poets, etc.। আর অঙ্ক ছেড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে দুঃখের

বিষয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে আর পড়া হল না। লাহোরে অনেক উচ্চপদস্থ বাঙালী ছিলেন—বড় বড় government Officials ইত্যাদি—কিন্তু সুরেনবাবুর মত লোকপ্রিয় কেউ হতে পারেননি।

আমার কিন্তু এম. এ. পড়া আবার বন্ধ হল। আবার সেই অনিদ্রা, আবার জ্বর, জ্বর deliriumএ দাঁড়াত, মনে হত যেন visions দেখছি। আর সেই স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলি একেবারে অজানা অচেনা। আমার তখনও অসুখ চলছে, শয্যাগত আছি, সেই সময়ে আমার ছোট বোন মায়ার বিয়ে হয়ে গেল একটি সদ্য ডাক্তারী পাস-করা ছেলের সঙ্গে। ভগ্নীপতির নাম অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়। মায়া শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, লাহোরে আমরা রয়ে গেলাম—মা, বাবা, আমি, ছোট ভাই সুজন ও মেজদাদা (মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়—আমার পিসতুতো ভাই)। মেজদা আমাদের সঙ্গেই মানুষ হয়েছিলেন—আমরা অনেকদিন ওঁকে নিজের ভাই বলেই জানতাম।

আস্তে আস্তে সেরে উঠলাম, কলেজে প্রায় তিন বছর গেলাম না—বাড়িতেই English literature (বিশেষতঃ Standard novels—Scott, Dickens, V, Hugo's Les Miserables প্রভৃতি (in English Translation) পড়বার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। আর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য এই সময়ে আরম্ভ করেছিলাম। Entrance (Matric) ও F. A. (Intermediate) দুই পরীক্ষাতেই Latin নিয়েছিলাম—বিলেতের পরীক্ষায় কাজে লাগবে বলে। তবে Latin পড়াবার লোক পাওয়া গেল না (বাবার কাছেই যতদূর হল পড়া গিয়েছিল)—তাই আর এ বিষয়টা বেশীদূর এগুলো না। সংস্কৃত খুবই ভাল লেগেছিল। প্রথমে বাবার কাছে, তারপর ছোটকাকার (গোবিন্দবাবুর) কাছে খুব আগ্রহের সঙ্গে ও বেশ তাড়াতাড়ি রঘুবংশ, গীতা, রত্নাবলী ইত্যাদি পড়তে পেরেছিলাম। ১৯০৯ সালে বাবার Law Collegeএ ছুটির সময় (বাবা তখন Lahore Law Collegeএ অধ্যাপক হয়েছেন—Lahore Law Collegeটি পাঞ্জাব, Frontier (পেশাওর) সমস্ত অঞ্চলটির একমাত্র Law College) আমরা সকলে কাঙ্গড়া Valleyর ধরমশালা গেলাম। এ জায়গার স্থানীয় নাম ভাগসু—পিছনেতে ধওলাধার (১৫০০০ফুট গিরিশ্রেণী), সামনে সুন্দর কাঙ্গড়া উপত্যকা। উপত্যকার মধ্য দিয়ে বেয়াস—বিপাশা—অনেকগুলি শাখা-উপশাখা নিয়ে প্রবাহিত।

ম্যাকলিয়ডগঞ্জের (Upper ধরমশালা) খানিকটা নীচে বাসা

পেয়েছিলাম, তবে রোজই ওপরের দিকেই বেড়াতে যেতাম। ম্যাকলিয়ড-গঞ্জে পার্শী শেঠের দোকানটি বড় সুন্দর ছিল আর সেখান থেকে ধওলাধারের রাস্তা আরও ওপরের দিকে গেছে। ঐ রাস্তায় দেবদারুর (Himalayan Fir বা Cedar) জঙ্গলটি আমাদের খুব ভাল লাগত। তারই কাছে রাস্তার ধারেই একটি ভূমিকম্পে ভাঙা বাংলোর ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে কাঙ্গড়া ধরমশালা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভাঙা বাংলোটির কয়েক একর জমি ছিল। Oak, rhododendron, pine প্রভৃতি গাছ চারিদিকে ছিল। মায়ের জায়গাটি পছন্দ হল। পার্সী শেঠ নওরোজীর সাহায্যে বাবা কোনিয়ম (পুরানো বাংলোটির নাম) কিনে নিলেন। ৬০ বছর কোনিয়ম আমাদেরই ছিল। ১৯১১ সালে দালাইলামার একটি সেক্রেটারী লামা-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য কোনিয়ম আমাদের কাছ থেকে কিনে নিলেন। আমাদের শেষ কোনিয়ম দেখা হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। এখান থেকে নেবেই সেই বছরে চীনযাত্রার আয়োজন করি।

যাক, আবার ১৯১০ সালে ফিরে আসি। প্রথমে আউটহাউস তৈরী করে, তারপর "কোনিয়ম"এর main building তৈরী হল। এবার আর ভেতরকার দেওয়াল পাথর দিয়ে গাঁথা হল না। ভূমিকম্পের পর এখন এই অঞ্চলে ধজির দেওয়ালের প্রচলন হয়েছিল। ছোট ছোট কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ছোট ছোট পাথর ঠুকে ঠুকে তারপর প্লাস্টার করে দেওয়াল তোলা—এই হল ধজি। আমাদেরই হাতার ওক (দিশী নাম বান) গাছের কাঠের ফ্রেমে পুরনো বাংলার পাথর ভেঙে নুড়ির মত করে ধজির কাজ বেশ ভাল করে হয়ে গেল।

প্রথম বছর বড়দিনের সময় বরফ পড়লে বাড়ির কাজ বন্ধ করে নীচে চলে যাই। তার পরের বছর মার্চ মাসে ফিরে এসে নভেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ করা হল। কোনিয়ম ঝকঝকে তকতকে নতুন বাড়ি হয়ে দাঁড়াল। বাবাকে Law Collegeএর জন্যে, সুজনকে তার F. Sc. classএর জন্যে কয়েকমাসই লাহোরে থাকতে হত। আমি আর মা আমরা দুজনেই কোনিয়ামে বরাবরই থাকতাম, বাড়ি তৈরীর কাজ দেখতাম।

কোনিয়মের দুই বারান্দা থেকে দু'রকমের দৃশ্য—সামনেটি থেকে ধওলা-ধারের একটি চূড়া, পেছনের বারান্দা থেকে কাঙ্গড়া উপত্যকার সুন্দর দৃশ্য। ১৯১১য় আমরা যখন লাহোর থেকে এসে নতুন বাড়িতে উঠলাম তখন গুচ্ছ গুচ্ছ লাল রডোডেনড্রন ফুলে বাড়ির চারিধার আলো করে রয়েছে।

ধওলাধার বরফঢাকা হয়ে নাম সার্থক করেছে। পাহাড়ের গায়ে জংলী লতানে গোলাপ গোছা গোছা সাদা ফুলে এবড়োখেবড়ো পাথর ঢেকে রেখেছে। বাড়ি থেকে কয়েক গজ পথ বেরোলেই ত্রিযুণ্ডের গায়ে একটি বড় জলপ্রপাত কালিবনের গায়ে সাদা ধপধপে পৈতের মত দেখা যায় সম্বচ্ছরই। ঐ জলপ্রপাতের জলেই Upper Dharamsalaর সব পানীয় জল যোগানো হয়। বাড়ির নীচের রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়েই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ভাগসুনাথের মন্দির—দূর দূর থেকে যাত্রীরা আসে, মন্দিরের সুন্দর কুণ্ডতে স্নান করে ভাগসুনাথের দর্শন ও পূজা করে।

সত্যই মনোরম স্থান। লামাদের হাতে কোনিয়ম দিয়ে দিতে সত্যিই মনে কষ্ট হয়েছিল—তবে ওদের হাত থেকে ওটিকে উদ্ধার করাও সম্ভব ছিল না। বয়স বেশী হওয়ার জন্য অত উঁচু জায়গায় যাওয়াও আমার বারণ ছিল—এই সব নানা কারণে কোনিয়ম হাতছাড়া হয়ে গেল।

মায়ের শরীর অনেকদিন থেকে ভাল যাচ্ছিল না। ১৯১১র মাঝামাঝি অপারেশন হল। Dharamsala Cantonmentএর মিলিটারী হাসপাতালের ইংরেজ ডাক্তার অপারেশন করলেন। অপারেশন করে এসে আমাকে যখন তিনি বললেন Cancer advanced stageএ পৌঁছেছে, শীঘ্রই সব শেষ হয়ে যাবে, তখন একটা যন্ত্রণা সমস্ত শরীরে অনুভব করেছিলাম—মা মারা যাবার সময়েও ওরকমটা অনুভব করিনি।

এর কিছুদিন পরেই তো লাহোরে নেমে আসতে হল। মায়ের তখন অস্থিচর্ম-সার শরীর—তবে শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল থাকতে চেষ্টা করতেন। ছোট্ট খুকি এলা (মেজদার মেয়ে) ওঁর খুবই আদরের পাত্রী ছিল। শরীরের কষ্ট খুবই ছিল, সাধ্যমত কষ্টের ভাব প্রকাশ করতেন না। কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রি, প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, ১১ই নভেম্বর (১৯১১) মায়ের রোগভোগ শেষ হল। প্রায় শেষ মুহূর্তে বলেছিলেন তিনি—যেন আবার আমাদের সকলের কাছে ফিরে আসেন, আর পরজন্মে বাবার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি না হয়।

আমার জীবনের এক অধ্যায় এখানে শেষ হল। মার স্মৃতিজড়িত ছিল বলেই ধরমশালা ও কোনিয়মের কথা বিশেষরূপে বলেছি।

আবার পড়াশুনা আরম্ভ হল নতুন করে। বিষয়ও নতুন নিলাম—ইতিহাস, B. A.তে History পড়িনি যদিও। ঔরংজেব, শিবাজীর বিষয় সবিস্তারে পড়া (স্যার যদুনাথের বই তখন নতুন বেরিয়েছে), Europeএর

Renaissance Period (Cambridge Modern History Vol I বোধহয় তার বেশীদিন আগে প্রকাশিত নয়) এসব Standard Works পড়া খুবই ভাল লেগেছিল। জীবনে যেন একটা নতুন উৎসাহ, উত্তম এসেছিল। এক বছর পরেই পরীক্ষা দিলাম—পাসও করে গেলাম। আরও পড়বার আগ্রহ ছিল—এবার Economics নিলাম। কখনও Economics পড়িনি—প্রায় Economicsএর definition থেকে আরম্ভ করতে হল। Marshall (বড় ও ছোট) ও Taussigsএর কৃপায় পাসও করলাম M. A. Economics। দু'বছরে দুটি আলাদা আলাদা বিষয়ে M. A. পরীক্ষা আমি আর একটি ছাত্র দিয়েছিলাম। এই দুজনেই পাস করেছি Punjab University থেকে। এখন তো কোন Universityই এক বছরে M. A. পরীক্ষা দিতে দেয় না।

তখন যেন নেশা জেগেছিল—আর একটি বিষয়, English নিয়ে তৃতীয়বার M. A. পাস করার ইচ্ছা খুবই ছিল। কিন্তু এবার অনেকে আপত্তি তুললেন। মনে আছে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী (উনি মার বন্ধু ছিলেন) এ সময়ে মায়াকে দেখতে আসতেন (মায়ার তখন অসুখ বেড়েছে)। আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, বিজন, এবার কি করবে? আমি যখন বললাম এবার ইংরাজিতে M. A. দেব—উত্তরটা তাঁর পছন্দ হয়নি।

সত্যি কথা—উচ্চশিক্ষা যদি ভাল করে করা যায়—ভাল ভাল Standard literature পড়ে (বিশেষতঃ সেই সময়ের সমসাময়িক লেখা পড়ে) তাহলে যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায়। Cram books পড়া, কেবল পরীক্ষা পাস করবার জন্যে, লেখাপড়ায় ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।

১৯১৩ সালের গোড়াতেই আমার বোন মায়া মারা গেল। বেচারী অনেকদিন থেকে ভুগছিল। মা মারা যাবার সময় ও লাহোরে ছিল না—শ্বশুরবাড়িতে ছিল। সে-রাত্রে স্বপ্নে সে দেখে যে একটি স্টেশনে মা রেলগাড়িতে বসে আছেন—ও তাঁকে দেখতে গেছে। যখন মায়া ওঁর সঙ্গে যেতে চাইল, ওঁর গাড়িতে উঠতে চাইল, মা বারণ করলেন, বললেন, এখন নয়, কিছুদিন পরে তুমিও আসবে।

আমাদের পাঁচজনের Home Circleএ এখন তিনজন রয়ে গেলাম—মেজদাকে নিয়ে চারজন। আমার ভাই সুজন এর কয়েক মাস পরে বিলাত চলে গেল ডাক্তারী পড়তে। বাবার ইচ্ছা ছিল যে আমি আইন পড়ি, উকিল হই। ওঁর Law Collegeএর ছাত্রেরা পেশাওর (Peshawar) থেকে দিল্লী পর্যন্ত

ওকালতি করছে—তাদের সাহায্যে আমি লাহোর হাইকোর্টে (এখন আর চীফ কোর্ট নেই) যদি প্র্যাকটিস করি নিশ্চয়ই পারব।

আমি উকিলও হলাম না, ট্রিপ্‌ল্‌ এম.-এও হলাম না। Government Collegeএর Professor Wathen (Economics পড়বার জন্যে আমি Govt. Collegeএ ভর্তি হয়েছিলাম) একটি employment bureau খুলেছিলেন। Wathenই আমাকে অমৃতসর খালসা কলেজে Economics-এর Lecturer করে পাঠালেন।

খালসা কলেজে যোগ দেবার আগেই (তখন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল) আমাদের কাশ্মীর যাত্রার সুযোগ হল। লাহোরের প্রবীণ উকিল যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কাশ্মীরের মহারাজার Legal Adviser ছিলেন। যোগেনবাবু অবসর নিয়ে তখন কলকাতায় নিজেদের বাড়িতে থাকতেন। মহারাজ যখন ডাকতেন তখন এদিকে আসতেন, দিনকতক আমাদের কাছে লাহোরে থেকে কাশ্মীর যেতেন। ১৯১৪ সালে বাবার গরমের ছুটির সময় উনি আবার কাশ্মীর যাবেন বলে লাহোরে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার তখন অমৃতসর কলেজের কাজের জন্যে ওখানকার Hony. Secretaryর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে—তবে appointment letter কলেজ কমিটির মিটিং হবার পর পাব এই স্থির হয়েছে। আর এই meeting গরমের ছুটির শেষে হবে জানানো হয়েছে।

সুতরাং আমরা সবাই (বাবা, আমি ও মেজদাদা—ওরও হাইকোর্টে ছুটি ছিল) free ছিলাম। ঠিক হল আমরা তিনজনে যোগেনবাবর সঙ্গে কাশ্মীর যাব। চাকরকে সঙ্গে নিয়ে, বাড়ি বন্ধ করে, আমরা ট্রেনে রাওলপিণ্ডি পৌঁছুলাম। সেখান থেকে একটি ভিক্টোরিয়া ফিটনে মরি, কোহালা, বারমুলা হয়ে পাঁচদিনে আমরা শ্রীনগর পৌঁছুলাম।

শ্রীনগর খুব ভাল করেই দেখা হল। মহারাজার দরবারও দু-তিনদিন আমরা দেখে এলাম। পূজার দরবারে মহারাজ পূজায় বসতেন ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্মফুল নিয়ে। মন্ত্রীমশাই পূজাঘরের চৌকাঠের কাছে বসতেন, আর মহারাজা এক-একটি ফুল কোষাতে ফেলছেন আর মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের কাজকর্ম বিষয়ে কথা কইছেন। পূজা শেষ হলে, বাইরের বড় হলঘরের সভা ভঙ্গ হত।

শ্রীনগরের কাছাকাছি হ্রদ, শঙ্করাচার্য, ক্ষীরভবানী মন্দির প্রভৃতি দেখে আমরা অমরনাথ যাত্রীদলে যোগ দিলাম। ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের প্রসিদ্ধ মার্তণ্ড মন্দির (Greek Styleএর বিরাট ব্যাপার) রাত্রে চাঁদের আলোয় দেখে

পহলগাম পৌঁছুলাম। ভোরবেলা উঠে অমরনাথ যাত্রা শুরু হল। সামনে কোলাহাই তুষারশৃঙ্গ, পাশেই খরস্রোত পরিষ্কার নীল জলের প্রবাহ লিডার নদী। বড়ই মনের ফুর্তিতে চড়াই চড়তে লাগলাম। 'চন্দনবাড়ি' পৌঁছে দেখলাম যে অনেক যাত্রী লিডারে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাইছে। অনেকটা চড়াই চড়ে এসেছি, গায়ে ঘাম ছিল, সে-সব ভুলে গিয়ে আমিও সেই পরিষ্কার নীল জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঠিক একটু ওপরে নদী একটি প্রকাণ্ড বরফের স্তূপের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে আসছে। জলে নামবার মিনিটখানেক পরেই আমাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় নদী থেকে তোলা হল। জোরে জ্বর এল—আমাদের তিন-জনের আর অমরনাথ দর্শন হল না। কষ্টেসৃষ্টে পহলগাম (তখন সামান্য একটি গ্রাম মাত্র) ফেরা গেল—আর সেখান থেকে আরও খানিকটা গিয়ে ঝিলামের তীরে একটি নৌকা পাওয়া গেল—তারপর দক্ষিণবাহিনী নদী খুব শীঘ্রই শ্রীনগরে পৌঁছে দিল।

পৌঁছেই খবরের কাগজে দেখা গেল First World War আরম্ভ হয়ে গেছে। ঐ কাগজেরই আর এক পাতায় এক কোণে দেখলাম যে অমৃতসরে খালসা কলেজে একজন Double M. A. Economics Depttএ নিযুক্ত হয়েছেন। লাহোরে ফিরে গিয়ে যখন বাড়ি খোলা হল তখন আমার appointment letter পাওয়া গেল—দরজার ফাঁক দিয়ে পিওন গলিয়ে দিয়ে গেছে।

কাশ্মীর থেকে ফেরা হল Fruit Season প্রায় শেষ করেই—mid Septemberএ। ফল খুব খেয়েছি সবাই—French Pear (অত ভাল এর পরে Franceএও পাইনি), বব্বুগোশা (খুব ছোট, খুব নরম, খুব মিষ্টি ফল, ২।৩ দিনের মধ্যেই খারাপ হয়ে যায়), নানা রকমের apple (অম্‌রি প্রভৃতি), plum, cherry, apricot, কাঁচা আখরোট—এ সব পেট ভরে সকলে খেয়েছি। কাশ্মীর দেশ-বিদেশের ধনী বিলাসীদের টেনে আনে—কিন্তু ওদেশের লোক (শতকরা নব্বইজন মুসলমান) বড় গরীব। সে-সময়ে (১৯১৪ সালে) ডোগ্‌রা রাজপুত্ররা ওখানে রাজত্ব করত—কাশ্মিরী বামুনরা ভাল ভাল কাজে বহাল ছিল—মুসলমানদের অবস্থা ভাল ছিল না। করণসিংজীর ঠাকুরদাদার দাদা তখন ওখানকার মহারাজ ছিলেন।

এবার অমৃতসর খালসা কলেজে শিক্ষকজীবন আরম্ভ। Economics class III yearএ (তখন Inter Stageএ Economics ছিল না) প্রথম খুললাম।

আর কিছুদিন পরেই Ancient History of India পড়াতে লাগলাম। কারণ History Professor ছিলেন ইংরাজ, প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ও জায়গাগুলির নাম উচ্চারণও তিনি করতে পারতেন না। পরের বছরই আমার Economics Class তিনগুণ বেড়ে উঠল। শেষের দিকে কলেজে M. A. Economics Classও খোলা হয়েছিল।

Finance Depttএর All India Competition পরীক্ষায় কিন্তু আমি Economics Paperএ যে নম্বর পেয়েছিলাম তার চেয়ে History Paperএ অনেক বেশী পেয়েছিলাম। Economicsএ সেরকম নম্বর পেলে তো Finance Depttএ ঢুকতাম। এখন মনে হয় আমার শিক্ষকের জীবন সব দিক দিয়েই ভাল হয়েছে—অফিসে কাজ করা পোষাত না। তবে এটা ঠিক যে All India Competitionএ বেশ উচ্চস্থান (তখন দুটি Candidate প্রথম ও দ্বিতীয়টিকেই কেবল নেওয়া হত) পেয়ে একটা Self-Confidence হয়েছিল—তার নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে।

খালসা কলেজের দুটি সহকর্মী ও বন্ধুর নাম এখানে করে রাখি—ওরকম দুটি বন্ধু বোধহয় আর পাইনি। একটি হলেন কাশ্মীরা সিং (ওঁর মেজ ছেলে এখন লেফটেনাণ্ট জেনারেল হয়ে অবসর নিয়েছেন), আর একটি ছিলেন বাবা হরকিষণ সিং (পরে উনি গুজরানওয়ালা গুরু নানক কলেজে অনেকদিন প্রিন্সিপাল ছিলেন)। এ দুজনের মতন উন্নতচরিত্র লোক আমি কমই দেখেছি। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও আমার একটি গুণ আছে—সব জায়গায় সব রকম লোকের সঙ্গে খুব ভাব করে নিতে পারি। এর একটি উদাহরণ আমাদের খালসা কলেজের 'Sages of the Bamboo Grove'—প্রাচীন চীনের একটি কবিগোষ্ঠীর নামানুকরণে আমাদের একটি কাব্য, ধর্ম প্রভৃতি চর্চার জন্য চারটি 'জ্ঞানী'র একটি বিশেষ অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী। এই 'জ্ঞানী'রা হলেন Hervey সাহেব (নবাগত ইংরাজ প্রফেসর), আমার দুই পূর্বোল্লোখিত শিখ বন্ধু এবং আমি নিজে। অনেক দিন আমাদের এই "বাঁশবাগানের জ্ঞানী গোষ্ঠী" বেশ ভাল ভাবেই কাজ চালিয়েছিল।

এবার আমার বিবাহের কথা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। বুঝিয়ে বলা দরকার কারণ এ বিষয়টি অনেকের মতে একটু যেন mysterious।

আগেই বলেছি যে B. A. পরীক্ষার সময় আমার শরীর বড় খারাপ হয়েছিল—অনিদ্রা জ্বর প্রায়ই হচ্ছিল। দু-তিন রাত না ঘুমিয়ে জোরে জ্বর আসত,

deliriumএ দাঁড়াত। মনে হত যে ঘরের দেওয়ালে চলচ্চিত্রের মতন কিছু দেখছি। অনেক সময় মনে হত ঐ দৃশ্যগুলি চীন দেশের। পরে De Quinceyর Visions of an Opium Eaterএ পড়েছি যে ঐ আফিং-সেবীটিও ঐরকম চীনের দৃশ্য দেখতেন আর তাঁর ওসব দেখে মনে বড় অস্বস্তি হত। আমার কিন্তু ঐ চীনের ছবি বেশ ভাল লাগত। ১৯০৮ সালের এক শীতের রাত্রে ঐরকম আধো-জাগা আধো-ঘুমানো অবস্থায় আমি চেঁচিয়ে বলেছিলাম: 'যাঃ, চীনের রাণী তো মরে গেল।' পরে বাবার কাছে শুনেছিলাম যে তার দু-একদিনের মধ্যে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে বৃদ্ধা Dowager Empress of China Tzu Hsi মারা গেছেন আর তাঁর বোনপো সম্রাট Kuang Hsi আত্মহত্যা করেছেন (সম্ভবতঃ বাধ্য হয়ে)।

এরপরও কিছুদিন খুব ভুগেছিলাম। আস্তে আস্তে সেরে তো গেলুম, কিন্তু একটা ভয় রয়ে গেল। আবার যদি ওরকম অসুখ করে, তাহলে শরীর ও মনের কি অবস্থা হবে? আবার আর একরকম মনোভাবও দেখা দিল। Visions যা দেখেছি—ওগুলি কি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি? আবার কি ওসব দেখা যাবে? আর ওই সব জায়গায় যাবার ইচ্ছাও খুব ছিল। রবি ঠাকুরের 'মানস ভ্রমণে' আছে: "ইচ্ছা করে…থাকি সর্ব লোকসনে দেশদেশান্তরে…তিব্বতের গিরিতটে বৌদ্ধমঠে…যেথা প্রাচীন চীন নিশিদিন কর্মানুরত।" আমার এ কবিতাটি বড়ই প্রিয় ছিল। একটা আকাঙ্ক্ষাও এই ধরনের মনে জেগে উঠছিল।

সুতরাং একদিকে ছিল ভয়—অসুখে শরীর ও মন ভেঙে যাবার। আর একদিকে এই আশা-আকাঙ্ক্ষা—দেশবিদেশ পর্যটন আর অনুরূপ জীবনযাপন। এ দু'রকম জীবনে বিয়ে করলে কেবল নিজেকে নয় আরেকজনকেও বিপদে ফেলা। সুতরাং আমার বিয়ে করা উচিত হবে না—সমস্যার এই হল সমাধান। এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কিন্তু টিকল না। দাদামশাই দিদিমার অনুরোধ, নিজেরই মনে দ্বিধা এই পণ রাখতে পারব কিনা, আরেকটা সংশয়ের মত মনোভাব অতবেশী উচ্চাশা রাখা সম্বন্ধে—এই রকম নানা চিন্তা ভিড় করে মনে এসে মতটা বদলে দিল। আজ পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর পরে (১৯১৬ সালে আমাদের বিয়ে হয়েছিল) বুঝেছি সব দিক দিয়ে মত বদলানোটা ভাল হয়েছিল। আর এখনও ওর consequences ভালই হচ্ছে।

আমার কলেজের জীবনে ফিরে যাওয়া যাক। অমৃতসরে আমি বেশীর ভাগ একাই থাকতুম—কারণ ওখানে প্রতিবেশীরা সবাই শিখ পরিবার, আমার স্ত্রী

ওদিককার ভাষা একেবারেই জানতেন না, আর নেহাৎ ছেলেমানুষও ছিলেন। তাই বাবা ওঁকে লাহোরে মেজদার স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গেই রেখেছিলেন। আমি প্রতি রবিবারে ও অন্য ছুটির দিন লাহোরে যেতাম। এই লাহোর অমৃতসর জীবনযাপন A Tale of Two Cities হয়েছিল—পরে আরও কয়েকবার এইরকম tale of two cities হয়েছে (London-Paris, মীরাট-দিল্লী, মীরাট-কলকাতা)।

এই সময় একটি Punjab University tripএ আমরা খাইবার (Khyber Pass), পেশাওর (Peshawar) প্রভৃতি পশ্চিম সীমান্তের কয়েকটি জায়গা বেড়িয়ে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম। যখন আমাদের ট্রেন সিন্ধুতীরে "আটক" পৌছল তখন লাহোরের পাঠান ছাত্ররা আমাদের খুব ঠাট্টা করতে লাগল। প্ল্যাটফর্মে আমাদের নামতে বারণ করে চেঁচাতে লাগল। "গাড়িতে জানলা দরজা বন্ধ করে বসে থাক—পাঠানরা চারিদিক থেকে গুলি ছুঁড়বে, তোমাদের ছাড়বে না।" আমরা তো নির্বিঘ্নে "আটক" পার হলাম—এখানে সিন্ধু ও কাবুল নদের সঙ্গমে প্রাচীন "আটক" দুর্গ এখনও সীমান্ত রক্ষা করছে। মহারাজা মানসিং আটক পার হতে চাননি আজ থেকে ৪০০ বছর আগে—তখন আকবর তাঁর কাছে বলে পাঠিয়েছিলেন জগদীশ্বরের এই পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে কিসের "আটক" ?

পেশাওরে শাহী সরায়ে (কাবুলের আমীরের—তখনও কাবুল নৃপতি আমীরই ছিলেন—অনুচরেরা পেশাওরে এসে এই সরায়ে উঠতেন) আমরা দুদিন রইলাম। এখান থেকে দূরে কাবুল শহরের ওপর বরফঢাকা পাহাড়টি বড় সুন্দর দেখিয়েছিল। সরাই থেকে বেরিয়েই 'কিস্সাখানি বাজার'। লম্বা দাড়িওয়ালা উট বোখারা সমরকন্দ থেকে কার্পেট আলুবোখারা বাদাম ইত্যাদি নিয়ে আসছে, ক্যারাভানগুলি বাজারের সরায়ে ঢুকছে, উট-চালকদের চেহারা অদ্ভুত (তাতার জাতীয়), তাদের পোশাকও বিচিত্র। এই বাজারে ঢুকলে মনে হয় যে মধ্য এশিয়ার কোন শহরে হঠাৎ এসে পড়েছি।

তার পরের দিন বাসে করে খাইবার পাস্এ ঢোকা গেল। বড়ই রুক্ষ পরিবেশ, সরু গিরিপথ দিয়ে দাড়িওলা উটের সারি যাচ্ছে আসছে, রাস্তায় যারা কুলিমজুরের কাজ করছে তাদেরও পিঠে বন্দুক, কোমরে পিস্তল। আমাদের বাস পাহাড়ে চড়তে চড়তে লাণ্ডি কোটাল দুর্গে গিয়ে থামল। বড় কেল্লা, সামনে হাইল্যাণ্ডার প্রহরী। আমরা এইখান থেকেই ফিরলাম, পরের

বাসটি (ওতে Punjab Universityর Vice-Chancellor Sir John Meynard ছিলেন) আরও ওপরে গিয়ে Landi Khana Fortএ পৌঁছেছিল। এখানে পাস্‌এর রাস্তায় একটা সাদা লাইন টানা আছে আর লেখা আছে "It is absolutely forbidden to cross this line" (এ লাইনের ওদিকে যাওয়া একেবারে বারণ)। এ লাইনের ওদিক থেকে কাবুল রাজ্য আরম্ভ।

ফেরবার পথে আলি মস্‌জিদে পেশাওর কলেজে চা খাওয়া গেল। এই জায়গায় শিখ-পাঠানে অনেক যুদ্ধ হয়েছিল। একবার সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শিখেরাই জেতে। পাঠানদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে হয়। সেদিন তাদের বোধহয় জয়লাভের বেশ আশা ছিল—বড় বড় ডেগে প্রচুর পরিমাণে পোলাও রাঁধা হয়েছিল। শিখ সৈন্যদের সেদিন আহার জোটেনি—আর এদিকে পাঠানদের রান্না পোলাও প্রস্তুত। মহারাজ রণজিৎ সিং বুদ্ধিমান লোক—চট্ করে সমস্যার সমাধান করলেন: "প্রত্যেক ডেগে দশ ঘা জুতো লাগাও—মুসলমানী বেরিয়ে যাবে—তারপর নির্ভয়ে খেতে শুরু কর।"

এর পরের বছর University trip তক্ষশীলা গিয়েছিল। মহাভারতের তক্ষশীলার তখনও খোদাই কাজ আরম্ভ হয়নি। কতকগুলি ছাত্রাবাসের ভিত্তি আমরা দেখেছিলাম, তবে তা বোধহয় বৌদ্ধযুগের। Greek period-এর অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল—সুন্দর সুন্দর অনেক গান্ধার স্টাইলের মূর্তি তক্ষশীলার মিউজিয়ামে জড় করা হয়েছে। Apollo ও বুদ্ধ প্রায় এক হয়ে গেছেন এই গান্ধার শিল্পে। পেশাওর মিউজিয়ামেও খুব ভাল গান্ধার ভাস্কর্যের নমুনা আছে। আর পেশাওরের পাশেই একটি গভীর গর্ত দেখা যায়। এখান থেকে অনেক খুঁড়ে সম্রাট কণিষ্কের seal দেওয়া একটি ছোট সোনার কৌটোয় বুদ্ধের চিতাভস্ম Archaeological Deptt কিছুদিন আগে পেয়েছিলেন। এখানেই কণিষ্কের বিখ্যাত স্তম্ভ ছিল, চীনা পরিব্রাজকেরা যার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

পেশাওর হল প্রাচীন পুরুষপুর—এর কাছে আরেকটি প্রাচীন নগর ছিল—পুষ্কলাবতী। এটি ছিল Parthian সম্রাট, নৃপতিরা Gondopharesএর রাজধানী। Prof. Sylvain Liviর মতে যে সব Magi নৃপতিরা শিশু যীশুকে দর্শন করতে যান Gondophares তাঁদেরই মধ্যে একজন।

আরও শোনা যায় যে এঁরই রাজ্যে যীশুর নিজের দীক্ষিত শিষ্য St. Thomas ভারতে এসেছিলেন। St. Thomas এদেশে Syrian Christian

সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। আর এই রাজ্যেই চিত্রাল যাবার পথে চারসদ্দার কাছে একটি টিলার ওপর বিরাট বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল, কেবল পা দুটি আছে (ফুট চারেক লম্বা) আর টিলার নীচে একটি বৌদ্ধমঠের কয়েকটি ভাঙা দেওয়াল। চীনা পর্যটকেরা এই তীর্থের বর্ণনা করেছেন। এখন এ জায়গাটির নাম তখ্‌ত-এ-বাহি।

তক্ষশীলায় আমাদের মাধোস্বরূপ বৎসের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। পরে ইনি Director General of Archaeology হয়েছিলেন আর হরাপ্‌পার বিষয়ে ওঁর বিখ্যাত বই লেখেন।

আবার খালসা কলেজে ফেরা যাক। এই সময়েই বিশেষতঃ অমৃতসরে আর আমাদের খালসা কলেজে 'আকালি' আন্দোলনের ঢেউ উঠল। এই বিক্ষোভে পঞ্জাবের দৈনন্দিন জীবনটাই যেন বদলে গেল—আর আমাদের খালসা কলেজে তো রীতিমত বিপ্লব ঘটল। এতে আমার জীবনেও একটা বিশেষ পরিবর্তন হয়ে গেল।

এও একটি নতুন অধ্যায় আরম্ভ করবার মতই ব্যাপারে দাঁড়াল। এখানে বলে রাখি যে এই কাহিনীতে এখন থেকে আমার নিজের বা নিজেদের লোকের কথা যথাসম্ভব কম করেই বলব—নিজেদের কথা কেবল যোগসূত্রের মত ব্যবহার করব।

আকালি বিক্ষোভ শিখসমাজে বিশেষভাবে তোলপাড় এনেছিল। এর একটু আগেকার কথা বলা দরকার। মহারাজ রণজিৎ সিং তো শেষাশেষি প্রায় গোঁড়া হিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বড় বড় হিন্দু মন্দিরগুলিতে (জ্বালামুখী, পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রভৃতিতে) হীরে, সোনা মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি অনেকে হিন্দু ছিলেন। তারপর অনেক পাঞ্জাবী গৃহস্থঘরে কেউ শিখ কেউ হিন্দু প্রায়ই দেখা যেত। গোঁড়া শিখেরা ভয় পেল যে শিখেদের আলাদা অস্তিত্ব থাকবে না—বৌদ্ধদের মত হিন্দুসমাজে বিলীন হয়ে যাবে। হয়তো এতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টেরও কিছু হাত ছিল। তাঁদের রাজনীতির মূলমন্ত্র হল Divide and Rule—শিখেদের (বিশেষতঃ শিখ সৈন্যদলকে) হিন্দুদের থেকে আলাদা করে রাজভক্ত হয়ে যাতে থাকে তার জন্য বিশেষ চেষ্টা নিশ্চয়ই হয়েছিল। সেই মামুলি কাহিনী এখানেও শোনা গেল। সরকারী চাকরি, ভোটের (Votes for Councils, Assemblies etc.) সংখ্যা নির্ধারণ, স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে সরকারী সাহায্য এসব নিয়ে তো হিন্দু-

মুসলমানে বিবাদ লেগেই ছিল—এখন শিখ হিন্দুতেও লেগে গেল।

তারপর আর একটি গুরুতর ব্যাপার হল—গুরুদোয়ারা (শিখমন্দির) নিয়ে। বড় বড় গুরুদোয়ারাগুলিতে, যেমন নানকানা সাহেবে (গুরুনানকের জন্মস্থানের বড় মন্দিরে) মহান্তরা প্রায়ই খাঁটি হিন্দু হয়ে পড়েছিলেন আর অনেক জায়গায় (এমন কি অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরে) হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও রাখা হয়েছিল। গোঁড়া শিখদের পক্ষে তো এসব ব্যাপার অসহ্য বোধ হল। এর বিরুদ্ধে তাঁদের চ্যালেঞ্জ হল আকালি আন্দোলন।

খালসা কলেজেও এই বিক্ষোভের প্রভাব এড়াতে পারিনি। আমাকেই কলেজের অবৈতনিক সেক্রেটারী (এক সম্ভ্রান্ত শিখ সর্দার) জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি আর্যসমাজী কিনা। আর্যসমাজীদের বরাবরই একটু militant mood ছিল (আগে ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে, এ সময় শিখেদের প্রতিও বিদ্বেষ ভাব দেখা দিয়েছিল)। আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় মনোভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হল—শিখেদের মধ্যে আবার নতুন করে শিখ ইতিহাসের গৌরবের দিন-গুলির উপর একটি গভীর টান। ইংরেজরা যে কতকগুলো দুরাচার মন্ত্রী ও সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ পেয়ে লাহোরের শিখরাজ্য আত্মসাৎ করতে পেরেছিল, সেইসব স্মৃতি এখন তরুণ শিখদের মধ্যে ভালভাবেই জেগে উঠল।

১৯১৪ সালে যখন আমি খালসা কলেজে ঢুকেছিলাম তখন এক ইংরেজ প্রিন্সিপাল ছিলেন একটু রূঢ় প্রকৃতির। এক রাত্রে মিঃ রাইটকে খুন করতে এসে এক শিখ যুবক ভুল করে কেমিস্ট্রীর প্রফেসর Mr. Duniclifféকেই ছোরার আঘাত করলে। তার কিছুদিন পরেই রাইট সাহেব এ কলেজ থেকে স্থানান্তরিত হলেন—নতুন প্রিন্সিপাল হয়ে এলেন আমাদের Govt. college-এর History, Politics-এর Professor G. A. Wathen I. E. S.। আমরা দু-তিনজন তো তাঁরই ছাত্র ছিলাম—বলতে গেলে Wathen সাহেবই আমাকে খালসা কলেজে পাঠিয়েছিলেন। আর উনিও ছিলেন চতুর ও মিশুক লোক, দিনকতকের মধ্যেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন—আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সত্যি, তিন-চার বছর আনন্দেই কেটেছিল Wathen সাহেবের সময় আর কাশ্মীরা সিং, বাওয়া হরকিষণ সিং, Hervey সাহেবের মত বন্ধুদের সঙ্গে থেকে। শনিবারের সন্ধ্যায় লাহোর যাওয়া আর সোমবার সকালে অমৃতসর ফিরে আসা, weekdayগুলি ছাত্রদের সঙ্গে পড়াশুনা ও বাঁশবাগানের জ্ঞানীদের (Sages of the Bamboo Grove) ছোট্ট

সমিতিটিতে যোগদান করা—এইসব নিয়ে দিনগুলি বেশ ভালভাবেই কাটত।

স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে এ পৃথিবীতে কি বেশীদিন থাকা যায়! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই চারিদিকে গোলযোগ শুরু হল। কানাডা-ফেরত শিখেদের মধ্যে "গদর" বিক্ষোভ, গান্ধীজির অহিংসা অসহযোগের জন্য দেশব্যাপী আহ্বান, আর এসবের উত্তরস্বরূপ সরকার তরফের রাওলাট অ্যাক্ট। এবার অমৃতসরেই আগুন জ্বলে উঠল। কিচ্‌লু (কাশ্মীরি মুসলমান ও অমৃতসরের একজন হিন্দু ডাক্তার, নামটি এখন মনে পড়ছে না—সম্ভবতঃ সত্যপাল) রাওলাট অ্যাক্ট-এর ধারা অনুসারে কোন সুদূর অনির্দিষ্ট কারাগারে বন্দী হলেন। শহরে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। একটি ইংরেজদের ব্যাঙ্ক পুড়ে গেল, দু-একজন ইংরেজকে ক্রোধোন্মত্ত জনতা আক্রমণ করল।

তিনদিন অমৃতসর 'আজাদী' অর্জন করেছিল। ব্রিটিশ পুলিস বা গোরা সৈন্য শহরে ঢুকতে পায়নি। আমরা তিন-চারজন সে সময় শহরে ঢুকেছিলাম (কলেজ থেকে শহর আড়াই মাইল দূর)। তখন সত্যি সত্যি হিন্দু-মুসলমানে কি অদ্ভুত সদ্ভাব—আমাদের সেদিন কত লোকের সঙ্গে (হিন্দু, শিখ, মুসলমান) কোলাকুলি করতে হয়েছিল—দু-তিন জায়গায় রাস্তায় চলতে চলতে সরবৎও খেতে হল। স্বর্ণমন্দিরের কাছে যখন পৌঁছুলাম তখন শোনা গেল কাছেই জালিয়াঁ-ওয়ালা বাগে (তখন বাগ বা বাগানের চিহ্নমাত্র ছিল না—চারিদিকে দোতলা-তেতলা বাড়ির মধ্যে খানিকটা পোড়ো জায়গামাত্র ছিল) একটা মেলা বসেছে। আমরা মেলা দেখবার জন্য ওদিকে এগুলাম—কিন্তু চার-পাঁচজন আমাদের বিশেষ করে বারণ করলে যে ওখানে যেও না, একেবারেই ঢোকবার জায়গা নেই। আমাদের আর জালিয়াঁওয়ালা বাগে সেদিন যাওয়া হল না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানতে পারা গেল যে সেখানে ঢুকলে আর জ্যান্ত ফিরতে হত না। আমরা যখন শহর থেকে বেরিয়ে স্টেশনের কাছে রেলওয়ে ব্রিজের ধারে এসে পড়েছি তখন গোরা পাহারা পুলটা ঘিরে ফেলেছে। আমাদের চ্যালেঞ্জ করল, আমরা তো "ফ্রেণ্ডস্" বলে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম। যখন কলেজের দিকে এগুচ্ছি, হেঁটেই যাচ্ছি, তখন দেখা গেল আমাদের কয়েকটি কলেজের ছাত্র রক্তাক্ত শরীরে কলেজে ফিরছে। তাদের মুখে খানিকটা খবর শোনা গেল। কলেজে পৌঁছে Wathen সাহেবের কাছে পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। তখন তাঁকে ও অন্য দুটি সাহেব অধ্যাপক ও তাঁদের পরিবারবর্গকে শহরের কেল্লায়

গোবিন্দগড় নিয়ে যাবার জন্য গোরা অশ্বারোহী সৈন্য এসেছে। Wathen সাহেব তো কলেজ ছেড়ে যেতে চাননি। তবে সরকারী হুকুম জারী হয়েছিল যে কোনও ইয়োরোপীয়ান সেদিন কেল্লার বাইরে থাকবে না—কারণ তাদের মারা পড়বার ভয় আছে। Wathen সাহেবের কাছে আমরা জানলাম যে আমরা যে সময় শহরে ঢুকেছি সেই সময়েই General Dyer গুর্খা সেপাহী নিয়ে জালিয়াঁওয়ালা বাগে যান, আর ঢোকবার বা বেরুবার (কারণ অন্য কোনও রাস্তা ছিল না) রাস্তা বন্ধ করে ফায়ার করবার আদেশ দেন। সেদিনকার রিপোর্ট ছিল ৫০০-৬০০ হতাহতের সংখ্যা—পরে দাঁড়িয়েছিল ১০০০-১২০০।

সাত-আটদিন অমৃতসর থেকে সরকারী কর্মচারী ছাড়া কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। বাইরের কোনও খবরের কাগজে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা একেবারে বেরুতে দেওয়া হয়নি। প্রায় কুড়িদিন পরে যখন স্পেশাল পারমিট নিয়ে লাহোর যেতে পেরেছিলাম তখন আমি অনেককে এ খবরটা দিই। আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে দু-একজন খবরের কাগজের লোক ছিলেন (অমল হোম ছিলেন তাঁদের সঙ্গে)। সবপ্রথম বোধ হয় এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজে জালিয়াঁওয়ালা বাগের ভীষণ কাণ্ডের বর্ণনা প্রথম প্রকাশিত হয়।

এরই মধ্যে—বোধ হয় এই হত্যাকাণ্ডের সাত-আটদিনের ভিতরেই—General Dyer খালসা কলেজে খবর পাঠান যে তিনি কলেজে আসবেন ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের ধন্যবাদ দিতে যে তারা এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল না এই বলে। যাক, তখন আমরা একটি ভাল কাজ করেছিলাম। আমরা Principal Wathenকে গিয়ে বললাম যে General যদি সদর দরজা দিয়ে কলেজে ঢোকেন আমরা খিড়কির দরজা দিয়ে সবাই—ছাত্র ও শিক্ষক বেরিয়ে যাব কলেজ খালি করে। বলাবাহুল্য, General Dyer কলেজে আসেননি। আমাদের ওপর কিন্তু তখন থেকে সরকারের 'সুনজর' পড়ল। আর খালসা কলেজও ক্রমশঃ আকালি আন্দোলনের একটি বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠল।

১৯১৯ সালে আমার পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। আমার বড় ছেলের জন্ম এই বছরের ১লা জানুয়ারীতে। জালিয়াঁওয়ালা বাগে যে আমরা বন্দুকের গুলিতে মরতে মরতে বেঁচে গেলাম সেও এই বছরের রামনবমীর দিনে। General Dyerকে যে আমরা নিরাশ করতে পেরেছিলাম (তিনি সত্যিই আশা করেছিলেন যে আমরা ভয়ে ভয়ে কলেজে তাঁর রীতিমত অভ্যর্থনা করব আর

তাতে লোকে বুঝবে যে তিনি দেশের উপকারই করেছিলেন গুলি চালিয়ে)—সেও ১৯১৯-এর এপ্রিল মাসে। এই বছরই গরমের ছুটিতে একলা একলাই বেরিয়ে রাজপুতানা, বোম্বাই, পূর্ববঙ্গের খুলনা প্রভৃতি জায়গা ঘুরে এসেছিলাম। আর এই বছরেই খুব ধুমধামে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হল।

এ কংগ্রেসের নাম দেওয়া হয়েছিল Victory Congress। রাওলাট অ্যাক্ট-এর দরুন যাঁরা রাজবন্দী হয়েছিলেন, তাঁরা ছাড়া পেয়ে অমৃতসর কংগ্রেসে এলেন। যখন তার দু-একদিন আগে কারামুক্ত মহম্মদ আলী, শৌকত আলী, দুটি ভীমকায় ভাই (লোকের আন্দাজ ছিল, শৌকত আলীর শরীরটি মাপে সাত ফুট বাই ছ ফুট) গান্ধীজিকে প্রায় কোলে করে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে ঢুকলেন তখন মহাসভায় সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। সে কী উত্তেজনা, কী হর্ষধ্বনি! প্যাণ্ডেল যেন ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছিল!

সেবার দেখলাম দেশের সব নেতাদের। গান্ধীজি তো ছিলেনই, তাঁর পাশে জিন্না সাহেবও ছিলেন— নিখুঁত বিলাতী পোশাকে। তিলক এসেছিলেন, সি. আর. দাশ, বিপিন পাল, মোতিলাল নেহরু সপরিবারে, আর পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, অজিত সিং, কানাডা-প্রত্যাগত 'গদর' পার্টির কয়েকটি শালপ্রাংশু মহাভুজ শিখসর্দার, মাদ্রাজ ও আরও দক্ষিণের খ্যাতনামা ব্যক্তি, এঁরাও ছিলেন—এরকম ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলন এর আগে কখনও হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের এটি ছিল প্রথম অধ্যায়।

এইখানেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। আমরা তো জালিয়াঁ-ওয়ালা বাগের ঘটনার পর থেকেই খদ্দর পরতে আরম্ভ করেছি। Wathen সাহেব তো আমাদের নতুন পোশাক দেখে হেসেই অস্থির। যাক, আমরা তো তুচ্ছ মানুষ—এদিকে সি. আর. দাশ, মোতিলাল নেহরু প্রমুখ বড় বড় লোক সব ছেড়ে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন—নিজেদের দৈনিক হাজার হাজার টাকা আয়, বিলাসের জীবন সব ত্যাগ করে। সত্যি, ও সময়টা মনে রাখবার মত। বিশালকায় শিখেরা যখন সেই অহিংস সংগ্রামে পুলিসের লাঠির আঘাতে ভূপতিত হল—এরা একবারও প্রত্যুত্তরে হাত তুলল না, চুপচাপ সব সহ্য করে গেল—সেও একটা অপূর্ব ব্যাপার। অহিংস যুদ্ধ বাস্তবিক ইতিহাসে একটি নতুন ধরনের যুদ্ধপ্রণালী।

১৯১৯ ও ১৯২০ সাল এইভাবেই চলল। নতুন ডাক এল এবার ছাত্রদের প্রতি। স্কুল-কলেজ ছেড়ে এই নতুন রকম সংগ্রামে যোগ দাও। আলিগড়

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হল। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় টলটলায়মান।

যখন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির এরকম ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা সেই সময় হঠাৎ গান্ধীজি আর মদনমোহন মালবীয়া মহাশয় খালসা কলেজে এলেন। Wathen সাহেব তো নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন—তবে বুদ্ধিমান লোক, তাঁদের কলেজের সুন্দর মাঠ দেখালেন, খুব আপ্যায়িত করবার চেষ্টা করলেন। আমার বাড়িতে তখন মেয়েছেলে তো কেউই ছিলেন না—ঐখানেই অনেক সময় ছোটখাটো আড্ডা হত। এবারও সবাই এ দুজন মাননীয় অতিথিকে আমার গৃহে নিয়ে এলেন। গান্ধীজি ও মালবীয়াজি, Principal Wathen ও দুজন সাহেব (I. E. S. Professor), সর্দার যোগেন্দ্র সিং (উনি পরে পাঞ্জাবের মন্ত্রী হয়েছিলেন) ও আমরা দশ-বারোজন খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে আমার ছোট পড়বার ঘরেতে বসে বা দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছাত্র ও শিক্ষকেরা non-cooperation movement-এ যোগ দেবে কিনা এ বিষয়ে তো মালবীয়াজি ও গান্ধীজিরই মত বিরোধ, সাহেবরা অবশ্যই মালবীয়াজির সঙ্গে একমত। আমরা শুনেই গেলাম। অতিথিদের জল খাওয়ালাম। ঘণ্টাখানেক পরে সভাভঙ্গ হল। দুজন নেতা শহরে ফিরে গেলেন। কারুর কারুর সন্দেহ রয়ে গেল যে তাদের কলেজে আগমন—আমাদেরই (বাওয়াজি, কাশ্মীরা সিং ও চাটুজ্যে এই তিনজনের) কাজ। এ সন্দেহটা কিন্তু ভুলই ছিল।

অতটা উত্তেজনার পর ১৯২০ সাল খানিকটা ঢিমে চালেই চলল। আমার ছোট ভাই সুজনরাজ Durham University (New Castle) থেকে M. B. পাস করে ফেরবার জাহাজ পেতে অনেক দেরি হওয়ায় বিলেতেই আটকে রইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিছুদিন যাতায়াতে ঐ রকম গোলমাল চলেছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ইউরোপ থেকে অনেক স্কলার, বিশেষতঃ আবার এদেশে আসতে লাগলেন। একজনের কথা খুব ভাল করেই মনে হচ্ছে, Mr. Foucher, ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ইনি কাবুলে অনেক পুরাতন স্তূপ প্রভৃতি দেখেশুনে বৌদ্ধযুগের নতুন মালমশলা যোগাড় করছিলেন। তারপর তিনি লাহোরে আসেন। ওখানকার সিনেট হলে তিনি কম্বুজের (Cambodia) Anqkor Vat (নগরবাট) আলোকচিত্র দিয়ে অতিসুন্দরভাবে দেখিয়েছিলেন। কম্বুজ ও অঙ্কোরের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তার জের এখনও থামেনি। কালই (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সাল) মীরাট কলেজে কম্বুজ ও অঙ্কোরের বিষয়ে ঘণ্টাখানেক বলে এলাম। আর ১৯২৪ সাল থেকে তো কম্বুজ, যবদ্বীপ প্রভৃতি সুদূর দেশে

ভারতীয় কৃষ্টির প্রভাব বিস্তার বর্ণনার কাজে হাত দিয়ে নিজের পড়া ও পড়ানোর আমূল পরিবর্তন করে ফেললাম। ছিলাম Economics-এর লেকচারার, এর পর ইতিহাসের অধ্যাপক হলাম। আর এই বদলাবার পালার টাল সামলাতে দেশে-বিদেশে ঘুরতে হল। সত্যি কথা, এ ঘোরাটাকে পরম সৌভাগ্য ভেবেছিলাম তখনও, এখনও তাই ভাবি। Mr. Foucher-এর অঙ্কোর বর্ণনা বাস্তবিকই আমার পক্ষে একটি স্মরণীয় ব্যাপার।

১৯২০ সালের প্রথম দিকে সুজন বিলেত থেকে ফিরল। প্রথম দিকটা লাহোরেই ডাক্তারী প্র্যাকটিস শুরু করলে। কয়েক মাস পরে কলকাতায় চলে গেল আর শেষ পর্যন্ত সেখানেই রইল। বিলাত থেকে ফেরার দু-চার মাসের মধ্যে ওর বিয়ে হল। ঐ বছরেই শেষের দিকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অমিতা মৈনপুরীতে (শ্বশুরমশাই সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন) জন্মগ্রহণ করল। ওর 'ভাত' (অন্নপ্রাশন) হয়েছিল নতুন ধরনে। সে সময় আমরা ধরমশালায় ছিলাম। বাবা এক গদ্দী (ঐ পাহাড় অঞ্চলের বামুন ক্ষত্রীদের গদ্দী উপাধি) পুরুতের বন্দোবস্ত করলেন, যে ঘরের দেওয়ালে মায়ের চিতাভস্মের একটি ছোট কৌটো পোঁতা ছিল, সেই ঘরটিতে খুব ভাল করে হোম ইত্যাদি করা হল। তারপর কোনিয়মের (বাংলোর পুরাতন নাম) সামনের মাঠে গদ্দীদের নাচ হল। আমাদের ভাণ্ডারি চৌকিদার নাচ গান বাজনার সব বন্দোবস্ত ভালই করেছিল।

একটি স্মরণীয় ভ্রমণ

যদিও অমৃতসরে আকালি আন্দোলন আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছিল—সে সত্ত্বেও খালসা কলেজ কোনও গুরুতর গোলমালে পড়েনি। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে একটি বহুদিনের যা প্রায় স্বপ্নের মত দুরাশা বলেই বোধ হত সেটি এবার সত্যি সত্যি বাস্তব জীবনে করে ফেলবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আর এর সুযোগও এল অপ্রত্যাশিতভাবে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির প্রফেসর রায়বাহাদুর শিবরাম কশ্যপ আই. ই. এস. কয়েক বছর থেকে হিমালয়ের বরফে ঢাকা কতকগুলি সুউচ্চ স্থানে বোটানি ডিপার্টমেণ্টের জন্য লতাপাতা ফুল-ফলের খোঁজে যেতেন। এই বছর (১৯২২ সালে) তিনি হিমালয়ের ওপিঠে খাস তিব্বতে মানস সরোবর কৈলাসের দিকটিতে ঘুরে আসবেন। দু-তিনটি সঙ্গী তাঁর দরকার ছিল। তাঁর ছাত্ররা খানিকটা পথ (হিমালয়ের এদিকেই) তাঁর সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক ছিল, হিমালয় টপকাতে মোটেই রাজী ছিল না। বোটানি ডিপার্টমেণ্ট কর্মচারীর মধ্যেও কারুর এগুবার লক্ষণ দেখা গেল না। এই খবরটি আনলেন আমাদের কাশ্মীরা সিং। শোনামাত্রই আমি ও বাওয়া জয়কিষণ সিং, কশ্যপ মশায়ের তিব্বত যাত্রাসঙ্কল্পে যোগদান করবার আমাদের আন্তরিক ইচ্ছার কথা তাঁকে জানাবার জন্যে লাহোরে খবর পাঠানো হল। দু-একদিনের মধ্যেই আমাদের বোটানি বিভাগের চরণ সিংও বললেন যে তিনিও যাবেন। ঠিক হল যে লাহোর থেকে অধ্যাপক কশ্যপ ও তাঁর একটি পুরাতন ভৃত্য (সে তিন-চারবার হিমালয় অঞ্চলে ওঁর সঙ্গে ঘুরে এসেছে) আর খালসা কলেজের আমরা চারজন (তিনজন শিখ প্রফেসর ও আমি) আমাদের কলেজের একটি চাকর নিয়ে এই সাতজন হিমালয় পারের মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শন করবার উদ্দেশে লাহোর স্টেশন থেকে বেরিলী যাত্রা করলাম (১৮ই জুন, ১৯২২)। কাঠগোদাম থেকে বাসে করে নৈনিতাল, সেখান থেকে বাসে করে আলমোড়া পৌছুলাম ২০শে জুন, ১৯২২।

এর পর আর বাস নয়, পদব্রজে চলা আরম্ভ হল, মালপত্র খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে তার তদারক করতে করতে। এই যাযাবর জীবন শহুরে জীবন থেকে

একেবারে আলাদা, মোটেই খারাপ লাগল না। রাত্রে কোনও ফরেস্ট বাংলো বা ডাকবাংলোয় আশ্রয় নেওয়া। দু-এক জায়গায় নিজেদের তাঁবু খাটিয়েও থাকা হয়েছিল। সরযূর ধার ধার দিয়ে হরিতকীর বনের মধ্যে দিয়ে বেশ ছাওয়ায় ছাওয়ায় একদিন যাওয়া গেল। এরই মধ্যে একদিন সকালবেলা পাহাড়ী রাস্তায় একটি বাঁক ঘুরে সামনে দেখা গেল অন্ততঃ একশো মাইল জুড়ে বরফ-ঢাকা হিমালয় (main Himalayan range)। এই আমাদের প্রথম দর্শন—সাক্ষাৎ দেবতাত্মা হিমালয়ের, দিগন্ত জুড়ে বিরাজমান, পৃথিবীর সবচেয়ে মহান দৃশ্য। চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী, অসীম সমুদ্রের অগাধ জলরাশি, তারাভরা নিশীথ আকাশ—এই তিনটি প্রকাশ, আমি ভাবি বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ রচনা—এই তিনটি রূপের দর্শন, ধ্যানধারণা, আমার বিশ্বাস তাঁর সর্বোত্তম আরাধনা।

"যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমা প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

—ঋগ্বেদ ১০, ১২১, ৪

"এই হিমবন্ত পর্বতসমূহ, নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহত্ত্ব বলিয়া কথিত হয়, এই দিকসমূহ যাঁর বাহু, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা পূজা করিব।"

ঋগ্বেদের এই সূক্তটি আমার বড় ভাল লাগে। যখনই বরফে ঢাকা পর্বতের চূড়া বা সমুদ্রের দিগন্তবিস্তার দেখি তখনই বেদের এই সূক্তটি মনে পড়ে যায়।

১লা জুলাই আবার কুয়াশা কেটে গেলে ভোরবেলা আমরা দেখলাম যেন একেবারে সামনে নন্দাদেবীর জোড়া শিখর—ত্রিশূল, পঞ্চচুলী আর অজানা অসংখ্য 'হিমবন্ত' শৈলরাজ।

সেইদিনই আমরা পিথোরাগড় ছেড়ে আসকোটের দিকে এগুচ্ছি। পিথোরা-গড় ছিল মধ্যযুগের কুমায়ুনের রাজপুত রাজাদের রাজধানী। কালী বা সারদা নদীর তীরে বড় সুন্দর ছোট শহরটি—শোর এঁর আর একটি নাম। নদীর ওপারে নেপাল রাজ্য। পূর্ব কুমায়ুন ও পশ্চিম নেপালকে বিভক্ত করেছে কালী নদী। এখন থেকে আমরা কালী নদীর ধার ধার দিয়ে সোজা উত্তর দিকে যাব—লিপুলেখ বা লিপু পাস-এর দিকে। আলমোড়া ছেড়ে আমরা পূব দিকে এগিয়েছিলাম এ কদিন। এবার আমাদের যাত্রা হবে উত্তরমুখী—তার প্রথম 'পড়াও' আসকোট। এটিও একটি ছোট পাহাড়ী রাজ্যের রাজধানী ছিল—এখনও এখানকার যিনি বড় ভূস্বামী তাঁকে 'রাজবার' বলা হয়। 'রাজবারে'রা বরাবর কৈলাস যাত্রীদের সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আমাদেরও

এখনকার যিনি 'রাজবার' তিনি চাল, ঘি, মধু ও আচার পাঠিয়েছিলেন। আল-মোড়া থেকে যে খচ্চরওয়ালারা আমাদের জিনিসপত্তর এনেছিল—তারা এখানে আমাদের ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল। 'রাজবারে'র সাহায্যে আমরা আসকোট থেকে নতুন লোক পেলাম।

আসকোটের 'বনমানুষে'র কথা অনেক শোনা গিয়েছিল। আমরা তাদের দেখা পাইনি। এই 'বনমানুষে'রা নাকি এখনও প্রস্তরযুগ থেকে এগোয়নি। তারা কোনও ধাতুর তৈরী জিনিস ব্যবহার করে না। বস্ত্রাদির এদের কোনও দরকার নেই। আর এরা পানীয় জল কেবল যেখানে পাহাড়ের গায়ে কোন উৎস থেকে বেরুচ্ছে সেই জলই খায়, নদীর জল খেতে চায় না। এরকম আদিম স্তরের আদিবাসী শুনেছিলাম আমাদের দেশে খুব কমই দেখা যায়। আরও দিনকয়েক আসকোটে থাকলে, 'রাজবারে'র সাহায্যে 'বনমানুষ' দেখা যেত।

এরপর দু-একদিন আমাদের গরম জায়গায় নামতে হল। আমার তো বেশ পেট খারাপ ও তার সঙ্গে শরীরটা বেশ খারাপ হল—আর এর জের আসল চড়ায়ের সময় রয়েই গেল।

এবার আমরা ধারচুলা পৌছুলাম—এটি হল লিপুলেখের পথে তিব্বত থেকে যে সব পশম, কম্বল, borax, ইত্যাদি আমদানি হয় তার উপর 'চুঙ্গী' নেবার প্রধান চৌকি। এইখানেই আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী পূজনীয়া সারদাদেবীর দ্বারা দীক্ষিতা রুমাদেবীর দর্শনলাভ হল। ইনি ছিলেন একটি বেশ ধনী ভোটিয়া সদাগর ঘরের মেয়ে। অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। কলকাতায় গিয়ে ৺সারদা মাতাঠাকুরাণীর কাছে মন্ত্র নিয়ে এসেছেন। তারপর নিজেকে কৈলাস ও মানস সরোবর যাত্রীদের সাহায্যকার্যে নিযুক্ত করেছেন। দশ-বারো বার হিমালয় পার হয়ে পশ্চিম তিব্বতের তীর্থস্থানগুলি ঘুরেছেন—বেশীর ভাগ ভারতের নানা প্রদেশের তীর্থযাত্রীদের নিয়ে। প্রমোদ চাটুজ্যে ও সত্যচরণ শাস্ত্রী মশায়ের ইনিই ছিলেন গাইড। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ধারচুলায় রুমাদেবীকে আমাদের গাইড হিসেবে পেয়ে গেলাম। উনি ভোটভাষা তো জানতেনই—ওটি তো ওঁর মাতৃভাষা—তিব্বতী ভাষাতেও বেশ কথাবার্তা চালাতে পারতেন। এ দুটি ভাষা জানার জন্যে ওঁকে কৈলাস, মানস সরোবরের পথে পাওয়ার মানে হল যে আমাদের অনেক সমস্যাই দূর হল।

এর কয়েকদিন পরে আমাদের নির্পানি 'পড়াও' পার হতে হল। এ সত্যি নির্পানি—আট-ন ঘণ্টা কোথাও জল নেই। পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তা—কোন কোন জায়গায় এত সরু যে দুটি পা পাশাপাশি রাখবার জো নেই। কোথাও পাহাড় কেটে পথ করবার জো নেই। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গজাল পুঁতে তার ওপর পাথরের স্লাব বসিয়ে রাস্তা করা হয়েছে। এই 'পড়াও'য়ে প্রত্যেক বার কেউ না কেউ পা ফস্কে তিন-চার হাজার ফিট নীচে কালী নদীর খরস্রোতে পড়ে—এই অপঘাত মৃত্যুগুলি হল শ্মশানেশ্বর কৈলাসনাথের উদ্দেশে বলিদান। যা হোক আমাদের কারুরই শহীদ হবার সৌভাগ্য হয়নি। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় পাহাড়ের ওপর খানিকটা সমতল জমিতে ওঠা গেল। একটা বড় ফাঁড়া সেদিন কেটে গেল। শরীরটা খারাপ থাকায় আমার কষ্টটা বেশীই হয়েছিল।

তার পরদিন ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ আমরা একটি চমৎকার জায়গায় পৌঁছুলাম। তিনদিকে কুমায়ুন ও পশ্চিম নেপালের অন্তর্গত হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে একটি সবুজ মাঠ—আর সেখানকার ঘাস প্রায় ঢেকে ফেলেছে অজস্র বনফুল। এই হল আলপাইন ফুলের সময়, ফুল না মাড়িয়ে পা ফেলবার জায়গা নেই। বর্ষাকাল শেষ হলে এরকম ফুলের মেলা দশ-বারো হাজার ফুট উঁচু জমিতেই দেখা যায়। এখানে আমাদের দুটি বোটানিস্ট দেখতে পেলেন প্রকৃতিদেবীর নিজের হাতে লাগানো, মানুষের হাতে নয়, anemone, geranium, iris—আরও কত ফুল যার নাম বিলিতি ফুলের ক্যাটালগেই দেখা যায়। এখানে সেই সব শীতপ্রধান দেশের ফুল চারিদিক আলো করে রেখেছে। হিমাবৃত পর্বতশিখর, যাকে বলে grand, sublime, বিরাট মহান—আর এই ধরাতলে পুষ্পবৃষ্টি সুন্দর মনোরম। গার্বিয়াং-এর ঠিক নীচের এই বরফে ঢাকা পাহাড়-ঘেরা প্রকৃতিদেবীর ফুলবাগানটি বিরাট ও সুন্দর, এ দুইয়েরই—বিরাট ও রমণীয়—আশ্চর্য মিলনস্থান। সেইদিনই আমরা গার্বিয়াং-এ পৌঁছুলাম। এটি রুমাদেবীর বাপের বাড়ি—এখনও এখানে ওঁর বড় বোন আছেন—তাঁর স্বামী (একজন এদিককার নামী ভোট সদাগর) আমাদের ওঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সে রাত্রে রীতিমত ভোজ হল। তাঁরা একটু দুঃখিত হলেন যে আমরা ওঁদের প্রস্তুত পাহাড়ী মদ পান করলাম না। এসব পাহাড়ী অঞ্চলে মদ্যপান মোটেই দোষের কথা নয়।

সেই রাত্রে আমি ও বাওয়া হরকিষণ সিং তো অনেকদিন পরে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বেশ আরাম করে শুলাম। অন্য তিনজন স্থানীয় রামবাও

দেখতে গেলেন। এ অনুষ্ঠানটি ভোটিয়াদের একরকম নৈশ ক্লাবের মত। এখানে সন্ধ্যাবেলা পাড়ার যুবক-যুবতী এসে জড় হয়, নাচগান হয়, এইখানেই পাত্রপাত্রীর কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। তারপর পাকাপাকি সম্বন্ধে পৌঁছুলে, বাপ-মার সম্মতি নিয়ে, তাদের বিয়ে হয়ে যায়। জানি না ভোটিয়া ছাড়াও অন্য পাহাড়ীদের মধ্যেও এ প্রথা আছে কিনা।

ভোটিয়ারা একটু আলাদা ধরনের পাহাড়ী জাত। এরা নামে, মোটামুটি ধর্মেও, হিন্দু (বেটাছেলেদের সব সিং উপাধি, মেয়েদের নামেও হিন্দুপ্রভাব দেখা যায়), তবে এদের নাক মুখ চোখ পরিচয় দেয় মঙ্গোলীয় রক্তের। এদের প্রধান ব্যবসা হল তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য—কম্বল, চামর, পশম, সোহাগা, প্রভৃতি আমদানি করা, কেরোসিন, হারিকেন লণ্ঠন, কিছু সুতী কাপড়, ছুঁচ, সুতো ইত্যাদি রপ্তানি করা। শীতের শেষে পশ্চিম তিব্বতের তকলাকোট, জ্ঞানিমা, দাবা, থোলিং ও অন্যান্য মণ্ডীতে এরা যায়। বরফে গিরিদ্বারগুলি বন্ধ হবার আগেই হিমালয়ের এদিকে চলে আসে। প্রত্যেক বড় গিরিদ্বারের কাছে এদের এক-একটি বসতি—সেখানকারই নামে এক-একটি ভোটিয়া শাখার নাম ও পরিচয় (চৌদান্স, দার্মা, জোহুর, মানা, নিতি ইত্যাদি)। পশ্চিম তিব্বত ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে লিপু, নিতি ও মানা এই তিনটিই বেশী ব্যবহার হয় বাণিজ্যের জন্য। পঞ্চাশ বছর আগে গার্বিয়াং ছিল কুমায়ুনের উত্তর-পশ্চিম সীমানার শেষ ডাকঘর। আমরা এখানে বাড়ির লোকের শেষ চিঠিপত্র পেলাম (দেড় মাস আর পাব না) ও আমরাও তাঁদের দেড় মাসের জন্যে চুপচাপ থাকব এ খবর পাঠালাম।

গার্বিয়াং-এ আমরা নতুন করে মালবাহী টাট্টু ও ঝুব্বুর বন্দোবস্ত করলাম—আমাদের ভোটিয়া বন্ধুদের সাহায্যে। ঝুব্বু বেশ বড় মোষের মত দেখতে, তিব্বতের চমরী ও আমাদের দেশের গরুর crossbreed। বরফের ওপর এদের পা পেছলায় না। বারো-তেরো হাজার ফিট এসব জায়গার উচ্চতা—এখানকার হাওয়া বেশী পাতলা। আমরা নীচে থেকে এসেছি—আমাদের কিছুদিন এ পাতলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে বলে এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াই ঠিক হল। মালপত্র ঝুব্বুদের পিঠে চলল।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি আমরা হিমালয় পার হবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সাত-আটজন ঘোড়সওয়ার, দু-তিনটি ঝুব্বু—বেশ একটি শোভাযাত্রা বেরুল লিপুলেখের দিকে। আবার কালী নদীর তীরে পৌঁছনো গেল। এখানে একটা

বড় গুহায় অনেকগুলি মৃতদেহ যেন সাজানো রাখা আছে। এগুলি শুকিয়ে গেছে, পচেনি (এখানকার শীতে পচে না, মামির মত হয়ে যায়)—এরা বোধহয় শ'দেড়েক বছর আগেকার কোন যুদ্ধে হত সৈন্য। আমাদের মধ্যে দু-তিনজনই এই দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলেন—আমি যাইনি।

সেইদিনই সূর্যাস্তের খানিকক্ষণ আগে একটি মনোরম দৃশ্য আমরা দু-তিন-জন দেখেছিলাম। আমরা তখন আরও উঁচুতে উঠেছি, বড় গাছ আর নেই, তিন-চার ফুট উঁচু গোলাপের ঝাড় পাহাড়ের গা আলো করে রেখেছে। আমরা এই গোলাপবনের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এগুচ্ছি। গোলাপফুল খুব ফুটেছে—ছোট ছোট ফুল, চার-পাঁচটির বেশী পাপড়ি নেই—তবে পাপড়িগুলি ফুলের বোঁটার ওপর এমন করে সাজানো যে হাওয়ায় প্রত্যেক পাপড়িটি ঠিক যেন এক-একটি প্রজাপতির মত নাচছে। এ জাতের গোলাপ আগে কখনও দেখিনি। হঠাৎ কোথা থেকে জানি না, দুটি ছোট ছোট বালক-বালিকা এই গোলাপকাননে দেখা দিল—মনে হল ফুলগাছের মধ্যে তারা যেন লুকোচুরি খেলছে। আমরা বেশ আশ্চর্য হয়েই ফুলের নাচ আর এই শিশুদের নাচ দেখছি, আর যেমন হঠাৎ এরা দেখা দিয়েছিল তেমনি হঠাৎ এ দুটি কোথায় চলে গেল আর দেখা গেল না। যতদূর মনে পড়ে এ দুটি ছেলেমেয়ে সাধারণ ভোটিয়া ছেলেমেয়েদের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর, ঢের বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছিল। জানি না তারা কাছেরই কোন ভোটিয়া বসতির কোন অবস্থাপন্ন পরিবারের পুত্রকন্যা, কিংবা মাঝে মাঝে যেমন ভাবি, এরা দেবতাত্মা হিমালয়ের (আমরা তখন তাঁর দিকে অনেকটা এগিয়েছি) আমাদের ওপর কৃপা করে পাঠানো একটি অলৌকিক স্বপ্ন।

যাই হোক, সে রাত্রি, ঠিক হিমালয়ের পদপ্রান্তে, আমরা তাঁবু খাটিয়ে শুলুম। গরম জামা কাপড়, জুতো মোজা কিছুই না খুলে দু-তিনখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে শোওয়া তো গেল, কিন্তু শীতের চোটে ভাল ঘুম হল না। ১৯শে জুলাই ভোর হবার আগেই উঠে পড়া গেল, আর একটু অন্ধকার থাকতে থাকতে লিপু-লেখের দিকে রীতিমত শোভাযাত্রা করে বেরিয়ে পড়া গেল। রৌদ্রের বেশী তেজ হবার আগেই লিপু পাস পার হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করতে হবে। নয়ত দুপুরবেলা বড় বড় বরফের চাঙড় ওপর থেকে লিপু-যাত্রীর মাথায় পড়বে আর তাদের চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দেবে। যাক আমরা নির্বিঘ্নে লিপুলেখ পার হয়ে আমাদের নিজের দেশ ভারতবর্ষ ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁই তিব্বতে সেঁধুলাম।

শুনেছিলাম হিমালয়ের এই গিরিদ্বারগুলিতে ঢোকবার পথে এমন সব ফুল দেখা যায় যার সুগন্ধে মানুষ আস্তে আস্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে—ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে দিলে অপারেশন টেবিলে রোগীর যেরকম অবস্থা হয় সেইরকম। আমরা সে ফুল তো পাইনি—পেয়েছিলাম পাউডার পাফের মত ফুল। দেখতে বেশ, তবে বেশীক্ষণ হাতে রাখলে গলে কাদার মত হয়ে যায়।

কিছু মুশকিলে পড়া গিয়েছিল। গিরিপথের বরফটা মানুষ, ঘোড়া ও ঝব্বুর হাঁটাহাঁটির জন্যে নরম হয়ে যাওয়াতে আমাদের ঘোড়ার পা বরফে বেশ খানিকটা করে ঢুকে যাচ্ছিল, আরেকটু জোর দিয়েই বরফ থেকে পা বের করতে হচ্ছিল। এর জন্য খানিকটা দেরী হল, আরেকটু অস্বস্তি বোধ হল। হিমালয়ের পারের দেশটি প্রথম দর্শনে মনে হল যেন এক ভিন্ন জগৎ। (১) হিমালয় যা আমাদের ভারতবর্ষের দিকে এত বিরাট, এমন গগনচুম্বী মনে হয়—তিব্বতের মালভূমি থেকে অনেক ছোট, বিরাট নয় সুন্দর, আর তিব্বতের মধ্যে আরও খানিকটা ঢুকে গেলে রূপোর খেলনার মত চমৎকার দেখায়। (২) হিমালয়ের আমাদের দিকটা উঁচু-নীচু, খুব চড়াই-উৎরাই, অনেকটা বড় বড় গাছে (দেবদারু, চীর, ওক ইত্যাদি) ঢাকা ; হিমালয়ের ওপিঠে (তিব্বতের দিকটায়) যতদূর দেখা যায় প্রায় সমতলভূমি, মধ্যে মধ্যে দু-একটি পাহাড়—আর দূরে হিমালয়ের সমান্তরাল পর্বতমালা যার দু-একটি চূড়া বরফে ঢাকা। এইটি হল কৈলাস পর্বত-শ্রেণীর প্রধান শিখর—কৈলাস পর্বত—যেখানে আমরা তীর্থযাত্রীরা এত তোড়-জোড় করে যাচ্ছি। (৩) আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা প্রথম প্রথম চোখে পড়েছিল তা হল যে দু-একটি ছোট পাহাড় যা কাছাকাছি ছিল, প্রত্যেকটি মনে হল যেন আলাদা আলাদা রঙের। সামনেরটি (যেটির দিকে আমরা এগুচ্ছিলাম) সবুজ আর হলদে দুটি বেশ সুন্দর রঙের মিশেল দেখাচ্ছিল।

একটি খরস্রোত নদী পার হয়ে আমরা ঐ জায়গাতে পৌছুলাম। একটু নীচেই একটি সমতল উপত্যকার মধ্যে দিয়ে কর্ণালী চলেছে। হিমালয় ভেদ করে ভারতের দিকে যাবার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করে। আর তারই তীরে তকলাকোট মণ্ডী, যেখানে আমাদের দেশের ভোটিয়ারা এসে তাঁবু খাটিয়েছে তাদের সদাগরী জিনিসপত্র সাজিয়ে। আর এই মণ্ডীর পাশেই খাড়া চড়াইয়ের পাশ দিয়ে উঠতে হয় তকলাকোট "লামাসেরী" বা বৌদ্ধমঠে। এটি বাইরে থেকে দেখতে ঠিক কেল্লার মত। মনে হয় দুর্যোগের সময় কেল্লার কাজেই লাগানো যায়।

তিব্বতে পৌছুবার প্রথম দিনেই আমার পেটের অসুখ একেবারে সেরে গেল।

বাস্তবিক কিছুদিন আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। লিপুলেখে পর্বত লঙ্ঘনের সময় রুগীর পথ্যই আমার আহার ছিল। তিব্বতে এসে রুমাদেবী তকলাকোট মণ্ডী থেকে বড় বড় মটর আনলেন, দানাগুলির গায়ে রোঁয়া ছিল—এরকম মটর আমি আগে দেখিনি। রুটি দিয়ে সেই মটরের ঝোল তো সেদিন খেলাম, ভীষণ খিদে পেয়েছিল, অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে আমি আর পারি না এই ভেবে। মটর খেয়েই হোক আর তিব্বতের জল-হাওয়ার গুণেই হোক আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। বেশ খাওয়াদাওয়া করতে লাগলাম, দুর্বল ভাবটা কাটতে লাগল। তার পরদিন (২০শে জুলাই) তকলাকোট মণ্ডীর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে জংপণ্ডের (আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের মত রাজকর্মচারী) দপ্তরে সবাই উপস্থিত হলাম। জংপণ্ড মশাই পুরু তিব্বতী কার্পেটের উপর পত্নী ও সহকারী কর্মচারী পরিবৃত হয়ে বসে ছিলেন। রুমাদেবী আমাদের কৈলাসযাত্রী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জংপণ্ড দুঃখ করে বললেন যে তাঁদের দেশে রেলগাড়ি তো নেই, ঘোড়া বা গরুর গাড়িও নেই আর রাস্তাঘাট বলতেও বিশেষ কিছুই নেই। আমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে তবে তীর্থযাত্রীদের তো কষ্ট সহ্য করা উচিতই। আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা! জংপণ্ডপত্নী আমাদের ছোয়ারা ও মিশ্রী হাতে দিলেন, তারপর আমরা বিদায় নিলাম।

সেইদিনই আমরা ওখানকার সেই প্রকাণ্ড কেল্লার মত বৌদ্ধমঠটি দেখে এলাম। খানিকটা বেশ চড়াই চড়তে হল, সেখানে তিন-চারটে ভিখিরী ছেলে দু'হাতের বুড়ো আঙুল উঁচু করে জিব যতটা পারে বের করে (এইটিই হল সম্মান দেখানোর প্রথা) ভিক্ষা চাইল। একদল বাচ্চা শিক্ষানবীশি লামা (পুরোপুরি লামা হতে তাদের তখন অনেক দেরী) আমাদের সেই বৃহৎ মঠের চারধার দেখাতে নিয়ে গেল। তারা খুব হাসিখুশী, গাম্ভীর্য এখনও রপ্ত করতে পারেনি। একটি বড় হল ভর্তি করে লামারা পূজো করছেন, অসংখ্য পিতল-কাঁসার প্রদীপ চারদিকে জ্বালা রয়েছে, ছোট বড় ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি হলে দেওয়াল ঘিরে সাজানো রয়েছে, ওম্ মণিপদ্মে হুং লেখা শিলা, ছোট বড় প্রার্থনা চক্র ভেতরে বাইরে সব জায়গায় নজরে পড়ছে—এই দৃশ্য আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। মঠের বড় লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। পুঁথিগুলি সযত্নে প্যাকেটে বাঁধা, দেওয়ালে নানা রঙের নানা আকৃতির scrolls (তঙ্কা বা টঙ্কা) ঝোলানো রয়েছে, বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও প্রাচীনকালের লামাদের ছবি আঁকা। Scrollsগুলির রং খুব উজ্জ্বল

আর আঁকবার ধরনও নিঃসন্দেহে ভারতেরই। তবে ভারতের কোন্‌দিক থেকে এই প্রভাব এল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে আবার এ ধরনটা হল মধ্য-এশিয়ার, খোটান প্রভৃতি জায়গার, লাদাক হয়ে পশ্চিম তিব্বতে এসেছে। আর এক মত হল যে এটি মগধ ও বাংলার পালরাজ্যের কৃষ্টির প্রভাব। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য অতীশ দীপঙ্করের পশ্চিম তিব্বতে আসবার ফলে এই প্রভাব পালরাজ্যস্থিত বিখ্যাত বিক্রমশীলা মঠ ও বিদ্যালয় থেকে আসা সম্ভব হয়েছিল।

একটু পরে এ বিষয়ে আরও বলতে ইচ্ছা আছে। তবে এই scrollগুলিতে যে তান্ত্রিক Imagery স্পষ্ট দেখা যায় তা বোধ হয় খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি নালন্দার পদ্মসম্ভবের অনুচরদের সঙ্গে এসেছিল। পদ্মসম্ভবের চেলারা ছিলেন তিব্বতের Red Lamaদের অগ্রণী আর অতীশ দীপঙ্কর হলেন Yellow Lama সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। Red Lamaরা (রক্তবস্ত্রধারী লামারা) তান্ত্রিক, আর Yellow Lamaরা (পীতবসনধারীরা মহাযানী)। তবে তিব্বতের মহাযানও তান্ত্রিক প্রভাবান্বিত। তিব্বতী শিল্পতে তাই তন্ত্রের ছাপ অক্ষুণ্ণ রয়েছে যেমন এ রয়েছে তিব্বতী জীবনের আরও অনেক বিষয়ে। যাই হোক এই হল আমাদের বৌদ্ধমঠের (ধ্বংসস্তূপের নয়, সজাগ সক্রিয় লামামঠের) প্রথম পরিচয়। এরপর আরও দূরদেশে বৌদ্ধমঠ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিব্বতী ইট চাও (Brick tea) সেদিন প্রথমবার চোখে দেখলাম। এর প্রথম পরিচয় সুবিধের নয়। ইটের গড়ন আর ইটেরই মত শক্ত চায়ের ডেলা হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে তারপর অনেকক্ষণ জলে সেদ্ধ করে মাখন (চমরীর দুধের) ও oat-এর ছাতু খুব ভাল করে গুলে খেতে হয়। বাসি মাখনের গন্ধ তো গোড়ায় গোড়ায় অসহ্য বোধ হত। তিব্বতীদের এ চা আহার ওষুধ দুই-ই। ঠাণ্ডা দেশে এরকম পানীয় ও খাদ্যের একত্র মিশ্রণ ভালই। তকলাকোট থেকেই আমরা 'খেচরনাথ' দেখে এলাম। হিন্দুসন্ন্যাসীরাই এই নাম দিয়েছেন। ওঁরা এখানকার ত্রিমূর্তিকে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বলে পূজা করেন। বস্তুতঃ এ হল বুদ্ধ, ধর্ম সঙ্ঘ। ত্রিমূর্তিটি দেখবার মত—সেখানকার লোকেদের মতে ওটি মানুষের হাতে তৈরী নয়।

ঐখানেই এক গুম্ফায় (গুহা ?) একজন লামার দর্শন পাওয়া গেল। শুনলাম যে ওঁর বয়স আশীর ওপর, দেখলে বোধ হয় চল্লিশ বছরের শক্তসমর্থ রীতিমত পালোয়ান। মুখের ভাবটিও শিশুর মত। রুমাদেবী তাঁকে বললেন যে আমরা বহুদূর থেকে তীর্থযাত্রী এসেছি—আমাদের কিছু বলবেন কি ? একটু

হেসে উনি বললেন যে এ সংসারে ভক্তির মত আর কিছুই নেই। শুনলাম যে সমস্ত শীত উনি ঐ 'গুমফা'র ভিতর আরও একটি ছোট গুমফায় ধ্যানস্থ হয়ে কাটিয়ে দেন। পশ্চিম তিব্বতে অনেক লামার দেখা পেয়েছি—এমন সৌম্য-মূর্তি লামা কিন্তু আর দেখেনি।

২৪শে জুলাই (১৯২২) আমাদের তিব্বত ভ্রমণের একটি স্মরণীয় দিন। ঘোড়া ও ঝুব্বুর পিঠে তাক্‌লাকোট মণ্ডীতে কেনা তিব্বতী 'দান' (কার্পেট) বেশ বাহার করে পেতে আমাদের দুটি বন্দুক, একটি পিস্তল ও পাঁচটি কুকৃরি সকলকে দেখিয়ে আমরা মানস সরোবর ও কৈলাস অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করলাম। অস্ত্র-শস্ত্র দেখাবার উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার। এ অঞ্চলে এই সময় ডাকাতদের উপদ্রবের বিশেষ ভয়। তীর্থযাত্রী ও লাসার দিক থেকে সদাগরেরা আসে জিনিসপত্র নিয়ে পশ্চিম তিব্বতের মণ্ডীতে বিক্রী করবার জন্যে —সুতরাং ডাকাতদের এইটিই হল মরসুম—এমন সুযোগ বছরে আর কোনও সময় হয় না। তবে এদের বন্দুক হল সপ্তদশ শতাব্দীর, পাঁচ-ছয় মিনিট লাগে বারুদ গাদ্‌বার জন্যে, তারপর ক্যামেরা স্ট্যাণ্ডের মত একটা ত্রিপয়ে চড়িয়ে সলতে সংযোগে আগুন ধরিয়ে গুলি ছুঁড়তে হয়। যাদের কাছে আজকালকার বন্দুক আছে তারা এতক্ষণে ওদের দলকে দল সাফ্ করে দিতে পারে। ওরা সেইজন্যে যাদের কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে তাদের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। আমাদের এই বন্দুক ও পিস্তল প্রদর্শনী সত্যই খুব কাজ দিয়েছিল।

এই অশ্বারোহী ও ঝুব্বু আরোহীদের দল কর্ণালী পার হয়ে একটি ছোট উপত্যকার মধ্যে ঢুকলো। এ জায়গায় কিছু ওটের (oat) চাষ হয়—পশ্চিম তিব্বতে এরকম চাষের ক্ষেত খুব কমই আছে। কর্ণালী নদীটি ছোট কিন্তু খরস্রোতা—স্রোতের এতটা শক্তি আছে যে হিমালয় ভেদ করে উত্তরপ্রদেশে সরযূ ('সরজ' —মানস সরোবরে যার জন্ম) নাম নিয়ে অযোধ্যাপুরীর পা ধুয়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

তাক্‌লাকোট থেকে মাইল তিনেক এগিয়ে আমরা টোয়া গ্রামে পৌছুলাম। এইখানে প্রসিদ্ধ ডোগরা সেনাপতি জোরাওর সিংএর সমাধি দেখা গেল। এটি একটি লাল রঙের স্তূপের মত—তিব্বতীরাও এটিকে সযত্নে রেখেছে। আর জোরাওর সিংকেও এরা ভোলেনি—তিনি পরম শত্রু হলেও অসামান্য বীর ছিলেন, সেইজন্য তাঁর মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে অনেক মঠে ও অন্য জায়গায় ভক্তিভরে তুলে রাখা হয়েছে। ১৮৪২ (খ্রীঃ) সালে এই ডোগরা রাজপুত

সেনাপতি (পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংএর মন্ত্রী রাজা গোলাব সিংএর বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষ) লদাখ পুরোপুরি জয় করে পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করেন। মানস সরোবর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানে একরাত্রি অনবরত তুষারপাতে শিখ ও ডোগরা সৈন্য শীত সহ্য করতে না পেরে বন্দুকের কুঁদো জ্বালিয়ে (ওখানে তো বড় গাছ নেই যে জ্বালানী কাঠ পাবে) প্রাণ বাঁচালো। সকাল হতে না হতে তিব্বতীরা শিখ শিবির আক্রমণ করলো। সসৈন্যে জোরাওর সিং এই মানস সরোবরের যুদ্ধে নিহত হলেন। কিন্তু তাঁর বীরত্বের কদর তিব্বতীরা নিজেদের প্রথা অনুসারে করেছে।

সেদিন আমরা যখন তাঁবু খাটাচ্ছিলাম সন্ধ্যাবেলা, একটি জংলী চেহারার তিব্বতী এসে আমাদের ঝুব্বুওয়ালাকে খুব চেঁচিয়ে কি সব জিজ্ঞেস করলে। তার উত্তর শুনে বোধ হয় টের পেলে যে এদের কাছে যা আছে তাদের ২০০ বছর আগের গাদা বন্দুক এখানে কিছুই করতে পারবে না। ও লোকটা নিশ্চয়ই ডাকাতের দলের লোক ছিল। দু-একটা ওরকম দল এরপর আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কিছু না বলে ভাল করে দেখে গেল।

২৫শে জুলাই আমরা মান্ধাতা পাস-এ (Pass) পৌঁছুলাম। সামনে পেছনে, পাশে আমরা যা দেখলাম সে অতুলনীয় দৃশ্য! পাশেই ডানদিকে মান্ধাতা পর্বত— বরফ ঢাকা যেন দৈত্যরাজের বিরাট তাঁবু—সেইজন্যে এর নাম হল 'গুর্লা' (তাঁবু) মান্ধাতা। সামনে কৈলাস পর্বতমালা, তার মাঝামাঝি কৈলাসশিখর সাদা মার্বেল পাথরের গম্বুজের মত দেখাচ্ছে। পেছনে হিমালয় তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে, মাথায় সাদা ধপধপে ফেনা, যতদূর দেখা যায় পূব থেকে পশ্চিম ঘুরে গেছে। আর প্রায় পায়ের নীচে রাবণ হ্রদ বা রাক্ষসতাল, তার গভীর নীল জলের বুকে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। আর ওদিকে হ্রদটি কৈলাসের চরণতল ছুঁয়েছে। উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে হিমালয়, চোখের সামনে একটি, মুখ ফেরালেই অন্যটি, আমার মনে হলো দুর্গা এইখান দিয়েই পূজোর সময় বাপের বাড়ি যান, আর এইখান দিয়েই আবার নিজের বাড়ি কৈলাসে ফিরে আসেন।

খানিকক্ষণ এই অপূর্ব পর্বত, হ্রদ, উপত্যকার সমাবেশ দেখে আমরা মান্ধাতা গিরিদ্বার থেকে নেমে রাক্ষসতালের তীরে এসে গেলাম। এ হ্রদের জল খাওয়া বারণ,—কারণ রাবণ কৈলাস উপড়ে লঙ্কা নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা করে ঘর্মাক্ত কলেবরে এই হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাই এর নাম রাক্ষসতাল বা রাবণ হ্রদ আর এর জল অশুদ্ধ। অনেক বারণ সত্ত্বেও আমরা চুপিচুপি রাক্ষস-

তালের জল খেয়েছিলাম, আর খেয়ে খুব তৃপ্ত হয়েছিলাম। তেষ্টা পেয়েছিল আর যদিও অনেকবার আমাদের বলা হয়েছিল যে ঘণ্টা দুয়েক পরেই তোমরা মানস সরোবরের জল খেতে পাবে, আমরা অত বিধিবিধান মানতে রাজী ছিলাম না।

সমুদ্রতল থেকে প্রায় পনের হাজার ফুট উচ্চে এ দুটি বড় হ্রদের মধ্যে একটি ছোট পাহাড় ব্যবধানস্বরূপ রয়েছে। এই পাহাড়ে উঠতে তারপর আবার ওর উল্টোপিঠে নামতে ঘণ্টা দুই লেগেছিল আর আমরা হাঁপিয়েও পড়েছিলাম। তবে কষ্ট সার্থক হল। সত্যিই আমরা সেই ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি, কবিকল্পনার বিষয়বস্তু, হিন্দু ও বৌদ্ধ দুয়েরই পূজ্য, কৈলাস ও মান্ধাতা দুটি বিরাট তুষারমণ্ডিত পর্বতের মধ্যে অবস্থিত, সুদূর বিস্তৃত এই গাঢ় নীল হ্রদের দর্শনলাভ করলাম। এ যেন একটি স্বপ্নাতীত ব্যাপার। একবার চারিদিক দেখে নিয়ে, ভক্তিভরে মাথায় জল দিয়ে, পেট ভরে সরোবরের জল খেয়ে নিলাম।

তারপর বলা বাহুল্য, পূর্বজন্মের (এ জন্মের তো নিশ্চয়ই নয়) পুণ্যফলে মানস সরোবরে স্নান করা গেল। এতটা উঁচুতে জল যত ঠাণ্ডা হবে ভয় ছিল তত ঠাণ্ডা বোধ হল না। এখানে জলের নীচে ও পাশেও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। একটি তো আমরাই দেখেছি, খুব গরম জল ফোয়ারার মত সাত-আট ফুট ওপরে উঠে গড়িয়ে পড়ছে। তাই আমাদের স্নান খুবই আরামদায়ক হয়েছিল। এই সব উষ্ণ প্রস্রবণগুলি না থাকলে মানস সরোবর বছরের বেশীর ভাগ সময় জমাট বরফ হয়ে থাকত। আজকালও মাস পাঁচেক সরোবরের জল জমে যায়।

স্নানের পর সঙ্গীরা পাশেরই একটি গুম্ফায় (ছোট তিব্বতী মঠ) গেলেন। আমি সঙ্গে করে রবিঠাকুরের চয়নিকা (বোধ হয় প্রথম সংস্করণ ১৩১৫ সালের) এনেছিলাম, এখন 'মানসভ্রমণ' কবিতাটির এই অংশ মন দিয়ে পড়লাম :

চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক নির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি ; হিমরেখা
নীল গিরিশ্রেণী 'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ

—যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।

কবির বর্ণনা ও সামনে যা দেখছি এ দুয়ের খুব মিল বোধ হল, তবে 'হিমরেখা' এখানে 'দূরে যায় দেখা' নয়—খুব কাছেই যায় দেখা। বাস্তবিক, পাশে পাশে বরফের পাহাড়—বিশেষতঃ দক্ষিণ ও উত্তরে মান্ধাতা ও কৈলাসের বিরাট শুভ্র-শিখরের ঠিক মাঝখানে—মানস সরোবর যেন প্ল্যাটিনামের আংটির মধ্যমণির মত একটি সুবৃহৎ নীল হীরক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশের রঙের সঙ্গে সরোবরের রঙ এমন সুন্দর বদলায়, কখনো সাদা,পর পর হালকা নীল, ঘোর নীল, নীলচে সবুজ। তিনদিকে হিমগিরি গায়ে যে মেঘগুলি শুয়ে থাকে তাদেরও রঙ চমৎকার বদলাতে থাকে। দূরে দূরে অসংখ্য জলচর পাখী দেখা গেল। কাছা-কাছি রাজহংস দেখতে পাইনি—তবে রাজহংসের ডিম দেখেছি ও খেয়েওছি। ঠিক বাঁদিকেই (ছয়-সাত মাইলের তফাতে) রাক্ষসতালের অতগুলি ছোট ছোট দ্বীপ তো রাজহংসের ডিমের খোলায় ভরে গিয়ে (বহু বছরের জড়ো করা) দূর থেকে যেন মার্বেল মোড়া রয়েছে দেখায়। শেরিং সাহেবের বইয়ে পড়েছি যে চীন সম্রাটকে লাসা থেকে প্রতি বৎসর মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল যাত্রী রাজ-হংসের ডিমের ডালি পাঠানো হত। (যাত্রী এইজন্যে বলা হয়েছে কারণ রাজ-হংসরা দস্তুরমত খুব দূরে দূরে যাত্রা করে।) এই হংসরা শীতের আগেই ক্যাস্পিয়ান সমুদ্রের দিকে চলে যায় আর বরফ পড়া বন্ধ হলে মানস সরোবরে ফিরে আসে। তিব্বতীরাও রাজহংসদের পবিত্র ও সুতরাং অবধ্য বলে মনে করে। রাজহংস শিকার করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

সেদিন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটি খুব ঘটা করে হলো। রুমাদেবী তো পরিশ্রমের পর বিশ্রামে বিশ্বাস করেন না, এইটুকু সময়ের মধ্যেই জ্বালানি কারাগানা (কাঠ তো নেই সবুজ কারাগানা (Caragana) ঝাড় দিয়েই আগুন জ্বালতে হয়), চমরীগরুর দুধ, রাজহংসীর ডিম, ইত্যাদি ঘুরেফিরে যোগাড় করে এনেছেন। আমি ছানার পায়েস রান্নায় সিদ্ধহস্ত এরূপ একটু অহঙ্কার ছিল—তাই আমি সঙ্গীদের ঐ উপাদেয় 'খীর' (পঞ্জাবে পায়েস ক্ষীর সবই খীর বলেই চলে) খাওয়াব স্থির করলাম। তবে চমরীর দুধ দিয়ে তো পায়েস কখনও করিনি। দুধে ছানার টুকরো ছাড়তেই সব দুধটাই কেটে গেল। এই দেখে আমার বন্ধুরা বেশ রাগ করলেন। আমি আর কি করি, অনেকক্ষণ জ্বাল দিতে দিতে ঐ তরল পদার্থটিকে খানিকটা হালুয়ার মত করলাম। নেহাৎ মন্দ হয়নি খেতে—আমি ওর নাম দিয়েছিলাম 'গুরলা' সন্দেশ। গুরলা মান্ধাতা তো পাশেই বিরাজমান।

কিন্তু আর কখনও আমার হাতে দুধের হাঁড়ির জিম্মা দেওয়া হয়নি আর আমি এ যাত্রায় আর ছানার পায়েস বন্ধুদের খাওয়াতে পারিনি।

সে রাত্রে খুব ঝড় ও বৃষ্টি হয়ে গেল। এখানে এইরকমই হয়ে থাকে, সোয়েন হেডিন (Sven Hedin) তাঁর 'ট্রান্স্ হিমালয়াজ্'-এ (Trans Himalayas) এর বেশ বর্ণনা দিয়েছেন। ঝড়ের সঙ্গে হাঁসেরা (দিনের বেলায় তো এরা অনেক দূরে ছিল, ভাল করে দেখাই যায়নি) ঝড়েরই মত উড়তে লাগলো। মনে হচ্ছিল যেন ঘন ঘন বাঁশি বাজছে। আমাদের তাঁবুর মধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা আসতে লাগলো। যাহোক ঘণ্টা দুই-তিন পরে সব থেমে গেল। সকালবেলা দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার, গুরলা মান্ধাতা রোদ্দুরে ঝক্ঝক্ করছে। ঝড়ের একমাত্র চিহ্ন হ্রদের তীরে কিছু ছোট মাছ মরে পড়ে রয়েছে। তিব্বতীরা সযত্নে এই মাছ কুড়িয়ে নিয়ে যায়। এগুলি শুকিয়ে রাখা হয়, কারুর অসুখবিসুখ হলে তার ঘরে এ মাছ পোড়ালে এদের বিশ্বাস সব রোগ সেরে যায়।

মানস সরোবর (তিব্বতী ভাষায় 'মাবাং') সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫ হাজার ফুট উঁচু, ডিম্বাকৃতি, দৈর্ঘ্যে ১৭ মাইল, প্রস্থে ১১ মাইল কি আর একটু বেশী। এখানকার উচ্চতার জন্য হাওয়া পাতলা তাই প্রায় বারো মাইল চওড়া সরোবরের ঐ দিকটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, মনে হয় যে সাত-আট মাইলের বেশী তফাৎ নয়।

২৮শে জুলাই। আমরা এবার কৈলাসের দিকে এগুলাম। মানস সরোবরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বেশ বড় উষ্ণ প্রস্রবণ দেখলাম, আর সেইখানে একটা নালা (তখন শুকনো) পার হলাম। বছরের কোনো সময়ে এই নালা দিয়ে মানস সরোবরের জল রাক্ষসতালে গিয়ে পড়ে। এই জায়গায় খুব মশা—তিব্বতে আর কোনো জায়গায় মশা দেখা যায়নি। কৈলাস ও এই দুটি হ্রদের মাঝখানে অনেকটা সমতল ভূমি আর এখান থেকে কৈলাস শিখর (২১৮০০ ফুট উঁচু থেকে) বড় চমৎকার দেখায়। নীচের ভাগ কালো পাথরের, তার ওপর যেন সাদা মার্বেলের একটি বড় বাটি উপুড় করে রাখা আছে। কালো পাথরের গায়ে তিনটি সমান্তরাল রেখা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতে ওগুলি রাবণ যে দড়ি দিয়ে পর্বত বেষ্টন করে কৈলাস ওপড়াবার চেষ্টা করেছিল এ সেই দড়ির দাগ। নিশ্চয়ই ভূতত্ত্ববিদরা ওকে পাথরের ভিন্ন ভিন্ন স্তর বলবেন। আর একটি অদ্ভুত দৃশ্য আছে। কৈলাস পর্বতের শিখর থেকে ঠিক সিঁড়ির মত নেমে এসেছে যেন বরফ কেটে ধাপে ধাপে। আর শিখরের শীর্ষদেশে একটু ছোট বরফের স্তূপের বা ঢিবির মত দেখা যায়—এইখান থেকেই এই বরফের সিঁড়ি নেমে

এসেছে কালো পাথরের স্তর পর্যন্ত। তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীরা তো এর বেশ ব্যাখ্যা করেছেন—শিখরের ওপর ঐ উঁচু জায়গাটি হল হর-পার্বতীর কুটির—আর ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওঁরা নীচে নামেন আর আবার ওপরে উঠে যান। ভূতত্ত্ববিদরা এই সিঁড়িকে বোধ হয় গ্লেসিয়ার বলে আমাদের বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক, এই তিনটি কালো পাথরের ওপর তিনটি সাদা দাগ শিখরের ঠিক ওপরের ঐ স্তূপ, আর সেখান থেকে নীচে নামবার সিঁড়ি—এসব মিলিয়ে কৈলাসের বৈশিষ্ট্য ভোলবার নয়। আবার কৈলাসের দু' পাশের পর্বতশৃঙ্গগুলি সত্যিই অদ্ভুত ধরনের—কালো রঙ (উপরে বরফের সাদা ছিট), মানুষের মাথার গড়নের—ওরকম শিখর হিমালয়ে কোথাও দেখিনি। চাঁদনী আলোতে কৈলাসের ডাইনে বাঁয়ে ঠিক ভূতের মত দেখায়। হয়তো প্রকৃতির এইসব লীলাখেলারই জন্য শিবের ভূত-প্রেত অনুচর, রাবণের লঙ্কায় কৈলাস নিয়ে যাবাব চেষ্টা, ইত্যাদি প্রাচীন ধারণা-গুলি গড়ে উঠেছে।

'বর্খা'র (এটি হল এই ছোট তিব্বতী বস্তীর নাম) সমতল ভূমি থেকে আমরা কৈলাসের এই অপরূপ দৃশ্য খুব ভাল করে দেখেছিলাম। আর একটু এগিয়ে গিয়ে আরও ভাল করে দেখতে পাব এই আশায় বর্খাতে কৈলাসের ফটো তোলা হল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুক্ষণ পরেই মেঘে ঐ দিক ঢেকে গেল, দু'দিন পরে বরফও পড়লো। আগস্ট মাসে রীতিমত তুষারপাত। কৈলাস দর্শন আরেকবার আমাদের আর হল না। আর ফটো তোলা হলো না। কৈলাসের যে সুন্দর ছবিটি অধ্যাপক কশ্যপ এর পর আমাদের দিয়েছিলেন এটি তাঁর ১৯২৬ সালের পশ্চিম তিব্বতে ভ্রমণের সময় তোলা ছবি।

৩০শে জুলাই আমরা দার্চিন থেকে কৈলাস পরিক্রমা আরম্ভ করলাম। আমাদের সব মালপত্র (বিছানা ও দু-তিনদিনের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া) একটি তিব্বতী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের জিম্মায় রেখে, তাঁরি দেওয়া এক-এক বাটি গরম দুধ খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার আগেই আর একটি গুম্ফার কাছে পৌঁছে তাঁবু খাটানো হলো। এইসময় মিনিট খানেকের জন্য আমরা কৈলাস শিখরের উত্তর দিক (পেছনের দিক) স্পষ্ট দেখতে পেলাম—সামনের (দক্ষিণের) দিকের মত একেবারেই নয়। এ দিকটি প্রায় অনেকটাই খাড়া কালো পাথর—বরফ তত বেশী নেই, দড়ির দাগ ও সিঁড়ির ধাপও তত স্পষ্ট নয়। খিদে বেশ পেয়েছিল, ভাল করেই খাওয়া হল, যদিও আগুন জ্বালতে খুব দেরী হল। রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হল, মাঝরাত্রে ঝুপঝুপ করে বরফ (snow) পড়তে শুরু হল—আর

সমস্ত রাত (৩০শে জুলাইয়ের রাত) তুষারপাত চললো।

৩১শে জুলাই (১৯২২)। বরফের চাপে তাঁবু খাটিয়ে রাখা গেল না। অন্ধকার থাকতে থাকতেই তাঁবু নামিয়ে কৈলাস পরিক্রমা শেষ করতে হলো। অন্ধকারেই টাটকা নরম বরফের উপর ২।৩ মাইল হাঁটবার পর সূর্য উঠলো। সদ্য-পড়া তুষারের উপর রোদ্দুর চোখ ঝলসে দিল। যতদূর দেখা গেল সব সাদা হয়ে গেছে। তবে ঝকমকে রোদ্দুর আর আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে আমাদের খুব ফূর্তি হলো—আমরা বরফের বল তৈরী করে এ ওর গায়ে ছুঁড়তে লাগলাম। তিব্বতী ঝুব্বুওয়ালারা বরফের ঝলসানি থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে চমরীব লোম দিয়ে ঝালরের মত করে নিয়ে ওদের নিজের ও আমাদের চাকরদের কপালে বেঁধে দিলে।

এবাব আমরা গৌরীকুণ্ডে বরফের আর একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখলাম। ছোট্ট গোলাকার হ্রদটি বরফে ঢাকা, এখানে ববফ আর গলে না, চার-পাঁচ মিনিট অন্তর ওপরের কৈলাস শৃঙ্গ থেকে বরফের বড় বড় টুকরো পড়ছে। কি তার গুরুগম্ভীর শব্দ, আর হ্রদেব ববফও সেখানটায় যেখানে ওপর থেকে বরফের চাঙ্গড় পড়ছে, সশব্দে ফেটে যাচ্ছে। এ শব্দ ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ, পশুপক্ষীর কোনও সাড়াশব্দ নেই। এমন থমথমে একটা ভাব আগে কখনও অনুভব করিনি।

এই গৌরীকুণ্ডে পার্বতী আবক্ষ নিমজ্জিত হয়ে তপস্যা করেছিলেন কৈলাস-পতি মহাদেবকে স্বামীরূপে পাবার জন্যে। এটি মহাপবিত্র তীর্থস্থান, এর তিব্বতী নাম 'সোকাওলা'। এই বরফ-জমা হ্রদে পৌঁছবার জন্যে আমাদের যে দল্‌মালা গিরিপথ থেকে নেমে আসতে হয়েছিল, সেই দল্‌মা গিরিপথের বিষয় আমাদের দলের নেতা অধ্যাপক কশ্যপ কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৯২৬ সালে কিছু লিখেছিলেন। তাই থেকে এখন কিছু বলতে চাই। কৈলাস পর্বত-মালা থেকে একটি সুউচ্চ শাখা দক্ষিণ দিকে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে—কৈলাস-শিখর এই ridge বা শাখার উপর অবস্থিত। কৈলাস পরিক্রমার সময় এই পর্বতশাখা দল্‌মা লা (La = Pass) টপকে যেতে হয়। দল্‌মা লা-র উচ্চতা ১৮,৬০০ ফুট—এইটিই হলো আমাদের এই যাত্রার সবচেয়ে উঁচু জায়গা। গৌরী-কুণ্ড থেকে যখন আবার আমরা এই পর্বতশাখায় ফিরে এলাম তারপর আর আমাদের চড়াই চড়তে হয়নি। পরিক্রমার পথ খুব আস্তে আস্তে নামতে লাগলো। পথ চলার কষ্ট যদিও কম হলো কিন্তু রাত্তিরে আবার ঝড় ও অল্প

তুষারপাত শুরু হলো। একটি গুম্ফার নীচে তাঁবু লাগিয়ে আশ্রয় নেওয়া হলো। সবাই খুব হাঁফিয়ে পড়েছিলাম—আর সে রাত্রে আমরা শিবের উদ্দেশে 'অকাল শিবরাত্রি'র উপোস করলাম। আমাদের রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিলো। গরম জলে দুধ চা ছেড়ে দিয়ে দু-তিন বাটি এই চা খেয়ে রাত কাটানো গেল। পরের দিন ভোরবেলা আবার নামতে লাগলাম। তখন আমরা কৈলাসের দক্ষিণ দিকে এসে গেছি। মাঝে মাঝে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নীচে মানস সরোবর দেখা যাচ্ছে আর দু-এক বার গুরলা মান্ধাতার great pyramidও দেখতে পেলাম। সত্যই সে অলৌকিক দৃশ্য! শীঘ্রই আমরা কৈলাসের চরণমূলে এসে পড়লাম—কৈলাস পরিক্রমা শেষ হলো। ঠিক এইসময় আমি একটা কাণ্ড করে বসেছিলাম। উৎরাই শেষ করে ঝুব্বু থেকে নেমে একটি ঝরনায় মুখ ধোওয়ার জন্যে হেঁট হয়েছি অমনি অনাহার ও পথের কষ্টের দরুন অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম দেখলাম আমার বন্ধুরা আমার সামনে গরম খাবারের থালা রেখে দিয়েছেন। বিনা বাক্য-ব্যয়ে উঠে বসে পেট ভরে খেলাম আর খাওয়া শেষ করে সুস্থ শরীরে আবার ঝুব্বুর পিঠে চড়ে সঙ্গীদের সঙ্গে দার্চিনের দিকে ফিরে চললাম।

১লা আগস্ট। দার্চিন থেকে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আমরা এবার পশ্চিম-মুখো হয়ে চললাম। ঠিক হয়ে গেছে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সে পথ দিয়ে আমরা ফিরবো না। আমরা এখন পশ্চিম তিব্বতের আরও ভিতর দিকে যাব। তারপর নিতি বা মানা বা আরও পশ্চিমে কোনও গিরিপথ দিয়ে দেশে ফিরে যাব। সন্ধ্যাবেলা আমরা ললিংতা পৌছলাম।

একটি ছোট পুকুরের মত জলাশয়ে, ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা—আর এই থেকে একটি ছোট নালা—বেশ জলভরা—বেরিয়ে পশ্চিমের দিকে এগিয়েছে। একটি লং জাম্প করলে এই নালার মত জলপ্রবাহ বেশ টপকানো যায়। এই ছোট্ট নালাটিই, এর পাশ দিয়ে দিন পনেরো যেতে যেতে, বেশ একটি নদী হয়ে উঠলো—আর পশ্চিম তিব্বত ছাড়ার আগেই একে বিশালকায় সত্‌লজ্‌ রূপে দেখা গেল। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে মানস সরোবরের জল কিছুটা সেই নালা, যা আমরা শুকনো অবস্থায় হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণে দেখেছিলাম, সেই নালা দিয়ে আর বেশীর ভাগ মাটির নীচে দিয়ে রাক্ষসতালে এসে পড়ে, তারপর রাক্ষসতাল থেকে আবার মাটির নীচে দিয়ে এই ললিংতায় এসে পৌছয়। তাই ললিংতা আকারে এত ছোট হলেও ওর জল অফুরন্ত। আর উত্তর দিক থেকে কৈলাস পর্বতমালার

বরফ গলে অনেক ছোট ছোট স্রোত এই নালার মত স্রোতে এসে পড়ায় খুব তাড়াতাড়িই এটি অত বড় নদী হতে পেরেছে। একজন ইংরাজ লেখক, ধরমশালায় তাঁর বাড়ি ছিল (আর ধরমশালার বিষয় খুব ভাল লিখেছেন), বলেন যে সত্‌লজ্‌ই হলো কুবলাই খানের Stately Pleasure Dome, যেটি Sacred River Alph-এর তীরে তৈরী হয়েছিল—যে sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless Sea. কুবলাই খাঁ তিব্বত জয় করেছিলেন, পশ্চিম তিব্বতে সত্‌লজ্‌ তীরে প্রাসাদ নির্মাণ করতে তিনি নিশ্চয় পারতেন—তবে সত্‌লজ্‌ তো কোনও অসূর্যম্পশ্য সমুদ্রে গিয়ে পড়েনি।

যাই হোক, আমরা এখন যতটা পারি এই সত্‌লজের ধার দিয়ে পশ্চিম তিব্বতের ভেতর ন্যূনাধিক ২৫০ মাইল এগিয়ে চললাম। এ অঞ্চলকে শীতল মরুভূমি বলা হয়, চড়াই ও উৎরাই কম, কিন্তু যেখানে কৈলাস পর্বতমালা থেকে স্রোত নেমে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে সেই স্রোতিগুলি পার হওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়েছিল। এই মালভূমির জমি তো তেমন শক্ত নয় সেইজন্য এই স্রোতগুলি গভীর খাদ কেটে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে। এখানে নামাও শক্ত, চড়াও শক্ত। ঘোড়া বা ঝুব্বু চড়ে ওঠা নামা সত্যই বিপজ্জনক—তাই এসব খাদে (রোজ দু-একটা পথে পড়তো) নিজেদের হাত-পাই ছিল ভরসা। সন্ধ্যাবেলা যখন তাঁবু খাটানো হত তখন বিশ্রামের খুবই দরকার হত। ঘুম ভালই হত—রাত্রে ঘুম ভাঙলে চাঁদের আলোতে হিমালয় বড় সুন্দর দেখাতো, ঠিক যেন রূপোর খেলনার লম্বা লাইন কেউ খেলবার জন্যে বিছিয়ে রেখেছে। পাঠক মনে রাখবেন যে আমরা এখন চোদ্দ-পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে আছি, হিমালয়ের একুশ-বাইশ হাজার ফুট উঁচু শিখর এখন আমাদের চোখে মোটে ছয়-সাত হাজার ফুট উঁচু। তবে রাত্তিরে আমাদের একটু সজাগ থাকতে হত, ডাকাতের ভয় তো ছিলই—আবার এখানে নেকড়ে বাঘের উপদ্রব ছিল। একদিন সকালে দেখলাম একটি ঘোড়া মেরেছে, সেই রাত্রেরই মারা। আর একদিন মাঝরাত্রে আমি দেখলাম একটা মস্ত কুকুরের মত কি ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁবুর চারিধারে। ওটা নিশ্চয়ই নেকড়ে ছিল, ঘোড়ার সন্ধানে এসেছিল। ওরা ঘোড়া পেলে মানুষকে আক্রমণ করে না। এ সব কারণে রাত্তিরে প্রত্যেককে পালা করে দু-তিন ঘণ্টা করে জেগে বিছানায় বসে থাকতে হত।

বলতে ভুলে গেছি, কৈলাস থেকে ফেরবার সময় আমাদের নাগা সন্ন্যাসী

নিজানন্দর সঙ্গে দেখা হয়। তার পর থেকে উনি আমাদের সঙ্গেই থেকে যান। সন্ধ্যাবেলা নিজানন্দ যখন তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তেন আমাদের বড়ই ভাল লাগতো। বেশ হাসিখুশী লোকটি ছিলেন, নাগাদের অনেক গল্প আমাদের শুনিয়েছিলেন। পরিধানে তাঁর একটি বাঘছাল ছাড়া প্রায় কিছুই ছিল না, বেশীর ভাগ খালি পায়েই চলাফেরা করতেন। আমরা ওঁকে কিছু কাপড় ও এক জোড়া চটিজুতো দিয়েছিলাম, ও সবের ব্যবহার খুব কমই করতেন। এখন উনিই বিশেষ করে আমাদের গাইড হলেন—কারণ রুমাদেবী এদিকটায় বেশী যাওয়া-আসা করেননি।

এইবার আমরা কিয়াংদের দেখা পেলাম। কিয়াং হলো তিব্বতের জঙ্গলী ঘোড়া, দেখতে ঘোড়া জেব্রা ও গাধার মাঝামাঝি জীব। গায়ে জেব্রার মত দাগ দু-একটি আছে—তবে অত স্পষ্ট নয় আর অত বেশীও নয়। লেজ গাধার মত কিন্তু শরীরটা ছোট টাট্টু ঘোড়ারই মত বেশ সুশ্রী। বেশী কাছে তো আসে না—দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখায়, খুব চক্কর দিয়ে দৌড়য় ছোট ছোট দলে।

এইরকম এগুতে এগুতে আমরা আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে গ্যানিমা মণ্ডী পৌঁছলাম। এটি বেশ বড় মণ্ডী। জোহরের ভোটিয়ারা বাগেশ্বর প্রভৃতি পাহাড়ী এপাশ থেকে উণ্টাধুয়া পাস্ দিয়ে এখানে আসে জুনের শেষে, আর সেপ্টেম্বরে হিমালয় পার হয়ে দেশে ফিরে যায়। তিব্বতীরা নিয়ে আসে ভেড়ার পাল এখানে, তাদের লোম কাটা হয়, আর ভোটিয়াদের বেচে দেওয়া হয়। সোহাগা আর কালো নুনও তিব্বতীরা আনে আর এ সবের বদলে ওরা সুতী কাপড় ও গম কেনে। লদাখীরা শুকনো খোমানি আনে এখানে, আর আসকার্ড থেকে আসে ছাগলের পশম। এখানে আমাদের দিন পাঁচেক থাকতে হলো নতুন করে ঝুব্বু, টাট্টুর বন্দোবস্ত করতে। আমার জন্মদিন—৭ই আগস্ট—এই গ্যানিমা মণ্ডীতেই পালন করা গেল। মনে নেই কিরকম আয়োজন করা হয়েছিল, বোধ্ হচ্ছে সেদিন আমরা সবাই হালুয়া খেয়েছিলাম। অমৃতসর থেকে টিনের মুগের ডাল ভাজা ও বিনোলার লাড্ডু (বিনোলা হলো তুলোর বিচি) আমরা এনেছিলাম। এগুলি খুব সন্তর্পণে অল্প অল্প করে আমরা খেতাম, অতিথি (কোনও লামা) কেউ এসে পড়লে তাদের মিষ্টিমুখ করানো হত। শীতের সময় এই বিনোলার লাড্ডু উপকারী ও খেতেও মন্দ নয় (বেশ করে ভাল ঘি ও কিসমিস দিয়ে তৈরী)।

৮ই আগস্ট আমরা গ্যানিমা থেকে বেরিয়ে ছিনকু নদী পার হয়ে শিবচিলম পৌঁছলাম। এটা হল নিতি পাসে ভোটিয়াদের মণ্ডী—তবে এসময় মণ্ডী খালি

হয়ে গেছে—একটিও তাঁবু আর এখানে নেই। পরের দিন রুমাদেবী কাছাকাছি তিব্বতীদের তাঁবু ঘুরেফিরে দুধ ও টাটকা মাখন নিয়ে এলেন। সেখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের পুঁতির মালা, ছোট ছোট খেলনা (এগুলি আমরা এই জন্যেই লাহোর, অমৃতসর থেকে এনেছিলাম) দেওয়া গেল, তারা ও তাদের বাপ-মায়েরা খুব খুশী হল।

এরপর আমরা দাবা হয়ে (এখানকার গুম্ফার দেওয়ালে বেশ সুন্দর স্টাইলে অপ্সরা ইত্যাদি আঁকা ছিল) মাংলাঙ ময়দানে পৌছে একটি কিয়াং-এর বড় দল দেখলাম। আমাদের দেখে তারা আরও দূরে গিয়ে চক্কর কাটতে লাগল। কিয়াংদের খেলাই হল এরকম চক্কর কাটা—ছোট চক্কর তারপর বড় চক্কর তারপর হঠাৎ চক্করে tangentএর মত লাইন টেনে দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হওয়া। ১২ই আগস্ট আমরা সত্‌লজের গভীর খাদে আস্তে আস্তে নামতে লাগলাম। এ একটা দুঃস্বপ্ন দেখার মত ব্যাপার—শত্‌লজ্ এই গভীর খাদের এত নীচে দিয়ে যাচ্ছে যে দেখাই যায় না। নদীর দুধারেরই পাড় শত শত বছরের নদীর জলের তোড়ে এমনভাবে কাটাছাঁটা হয়েছে যে মনে হয় সারি সারি বিশাল আকার (chorten তিব্বতী স্তূপ) পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। আর কোথাও ঘাস বা গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। মাইলের পর মাইল এই অদ্ভুত দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে একলা যেতে যেতে গা ছম্‌ছম্ করে, বোধ হয় পৃথিবী ছেড়ে যেন কোনও দৈত্যপুরীর মধ্যে ঢুকছি। সম্ভবতঃ চার-পাঁচ মাইল এরকম পাতাল প্রবেশের মত নেমে গিয়ে আমরা অবশেষে থোলিং-এর ময়দানে এসে পড়লাম। পশ্চিম আমেরিকার Grand Canyon-এর যা বর্ণনা পড়েছি মনে হয় সেও এই ধরনেরই ব্যাপার।

থোলিং মঠ (সোয়েন হেডিন-এর Totling Gumpha) পশ্চিম তিব্বতের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মহাযানী বৌদ্ধমঠ। এখানে তিনটি মন্দির আর একটি ভিক্ষুদের বাসস্থান—একটি খুব বড় মঠ আছে। আমাদের সঙ্গী নাগা সন্ন্যাসী নিজানন্দ বড় মন্দিরে আমাদের নিয়ে গেলেন, সদর দরজায় দু'ধারের চারটি মূর্তি দেখিয়ে বললেন যে এই চারটি চার যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। ভিতরে ঢুকেই আরও দুটি বিরাট মূর্তি—জয় ও বিজয়। দেওয়ালে অনেক ছবি, নানারকম নক্‌শা আঁকা আছে। গর্ভগৃহে বিশালকায় বুদ্ধমূর্তি প্রস্ফুটিত সহস্রদলের উপর আসীন। সৌম্য মূর্তিটির চোখমুখ দিয়ে জ্ঞান ও করুণার ছটা যেন বেরুচ্ছে। খুব উঁচুদরের শিল্পীই এরকম উঁচুদরের কল্পনা করতে পারেন।

নাগা সন্ন্যাসী নিজানন্দের মতে ইনিই আদি বদ্রী। থোলিংই আদি বদ্রীনাথ। শঙ্করাচার্য এখানে এসে দেখলেন যে হিমালয় পারের এই তীর্থস্থান ভারতের তীর্থ যাত্রীদের পক্ষে দুর্গম। তিনিই বদ্রীনাথ হিমালয়ের অন্যদিকে ভারতবর্ষে নিয়ে গেলেন। তবে আজও দু-একজন সন্ন্যাসী বহু কষ্ট সহ্য করে হিমালয়ের মানা, নিতি গিরিদ্বার দিয়ে তিব্বতে ঢুকে আদি বদ্রী দর্শন করে যান।

মন্দিরের অন্য ঘরগুলিতে আরও অনেক মূর্তি আর দেওয়ালে সুন্দর ছবি ছিল। একটি চতুর্মুখ দেবতা, একটি বীণাধারিণী দেবী, একটি খুব বড় সূর্যমুখী ফুল হাতে বোধ হয় সূর্যদেব অসংখ্য মূর্তির মাঝে বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলি আমার তো অজন্তা ধাঁচের আঁকা বলে বোধ হল। আর আমার মনে হয়েছিল যে এই সব পুরাকালের সুন্দর জিনিস দেখবার ও বোঝবার জন্য কোনও প্রাচ্যবিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতের থোলিংএ আসা বড় দরকার। কে ও কবে এসব চিত্রকলার ও ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখে গেছেন তা কি আর আমরা জানতে পারব না!

খানিকটা বছর তিন-চার পরে জানতে পেরেছিলাম। ১৯২৫-২৬ সালে যখন আমি ইউরোপে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিস্তারের বিষয় কাজ করছিলাম, তখন ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে বিখ্যাত পর্যটক শরৎচন্দ্র দাসের লেখা 'Indian Pandits in the land of snow' বইটি পেলাম। এইবার জানতে পারলাম যে ভারতের শেষ বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত পুণ্যকীর্তি অতীশ দীপঙ্কর পালরাজ্যের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার বিক্রমশীলা থেকে এই থোলিংএ এসেছিলেন ১১'শত খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। পশ্চিম তিব্বতে তখন গুগে নামের এক রাজ্য ছিল, গুগের রাজা Ye-Ses-Od (ঈ শে ওর) তাঁর রাজ্যে তান্ত্রিক প্রভাব বেশী হয়ে যাচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে পশ্চিম তিব্বতে মহাযান ধর্মের প্রচার হয়। তিনি শুনেছিলেন যে ভারতবর্ষে তখন অতীশ দীপঙ্কর শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য—তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি আর পুণ্যচরিত্র কেবল ভারতে নয় সুদূর সুমাত্রা, যবদ্বীপ পর্যন্ত প্রখ্যাত ছিল। সুতরাং রাজা বিক্রমশীলা বিহারে অতীশকে তিব্বতে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। অতীশও তাঁর সম্মতি প্রকাশ করলেন এই তিব্বত যাত্রার প্রস্তাবে। কিন্তু বঙ্গ, মগধের পাল নৃপতি মহীপাল একেবারে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। তিনি অতীশকে বিশেষ করে বোঝালেন যে তাঁর ভারতে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অতীশ ভারতবর্ষ ছাড়লে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মও লোপ পাবে। অতীশের সেবার যাওয়া হল না।

তারপর যখন তিব্বতরাজ আরও দু'বার বিশেষ অনুরোধ করে রাজদূত পাঠালেন, তখন অতীশ পালরাজকে বিদেশ যাবার অনুমতি দিতে রাজি করালেন। মহীপালকে তিনি জানালেন যে ধর্মের উন্নতির জন্য তিনবার ডাক এসেছে—এবার না গেলে বৌদ্ধভিক্ষুর যা কর্তব্য তা তাঁর পালন করা হবে না। তারপর তিনি তিব্বতী গাইডের সঙ্গে নেপাল হয়ে মানস সরোবর পৌঁছুলেন। সরোবরের পবিত্র জলে উনি তর্পণ করলেন। সেখানে পশ্চিম তিব্বত রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে তাঁকে থোলিং নিয়ে গেলেন। থোলিং ছিল রাজ্যের রাজধানী, এখানে শুভদিনে রাজা Ye-Ses-Odকে অতীশ মহাযান ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তান্ত্রিক প্রভাবটা অনেক কমে গেল। অতীশের আর দেশে ফেরা হল না। থোলিংকে তিনি ও তাঁর অনুচরেরা একটি শীর্ষস্থানীয় বিদ্যা ও ধর্মের কেন্দ্র করে তুলেছিলেন। এর নাম হয়েছিল অনুপম নিরাভোগ বিহার। এই বিহারে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ ও অনেক প্রাচীন গ্রন্থের টীকা ব্যাখ্যা লেখা হয়েছিল। সেই সময়েই বোধ হয় শিল্পী, চিত্রকররা মগধ ও বাংলা দেশ থেকে এখানে এসেছিলেন, আর আমরা থোলিং মঠে যে মূর্তি আর চিত্রসম্পদ দেখেছিলাম সেগুলি এই মগধ ও বাংলার শিল্পীদের শিষ্যপরম্পরারই হাতের কাজ। তবে ডাঃ ফেব্রি (লাহোর মিউজিয়ামের কনসার্ভেটর—১৯৪০) মনে করেন যে পশ্চিম তিব্বতের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা মধ্য-এশিয়ার খোটান প্রভৃতি বৌদ্ধশিল্পকেন্দ্র দ্বারা প্রভাবান্বিত—আর ঐ সংস্কৃতির প্রভাব লাদাখের রাস্তায় এসেছিল। লাহোরে যে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল (বোধ হয় ১৯৩৯ সালে) তাতে আমি থোলিংকে কেন্দ্র করে বাংলা ও মগধের ধর্ম ও সংস্কৃতির তিব্বতের উপর প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। তার উত্তরে লাহোর মিউজিয়ামের কনসার্ভেটর ডাঃ ফেব্রি মধ্য-এশিয়ার খোটান প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে Sino-Indian cultureএর বিকাশ ও সেখানকার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রভাব যে লাদাখের পথে পশ্চিম তিব্বতে এসেছিল তার বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলেন। আমি কিন্তু পালরাজ্যের তদন্তপুরি ও বিক্রমশীলা কেন্দ্রগুলির প্রভাবের কথাই জোর দিয়ে বলি। এর কিছুদিন পরে ইটালীর খ্যাতনামা অধ্যাপক তুচ্চির 'থোলিং' পুস্তকে আমার মতেরই সমর্থন পেলাম। তুচ্চি বলেন যে ভারতে যখন বৌদ্ধধর্ম ও কৃষ্টির অবসান হল, তখন এই বরফের দেশেই কতকগুলি অসমসাহসী বৌদ্ধপণ্ডিত থোলিংএ আশ্রয় নিয়ে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ এখানে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি লিখেছেন যে থোলিং মঠকে তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত

দেখেন, কেননা এইখানে যে ধর্মাত্মা জ্ঞানপিপাসী সাধকেরা থোলিংএ এসেছিলেন, তাঁরা সারা তিব্বতে যে ধর্ম ও জ্ঞানের আলো জ্বেলেছিলেন সে আলো এখনও নেভেনি।

অতীশের বিষয়ে আরও দু-একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। তিব্বতে আসবার আগে এই পুণ্যাত্মা সুদূর সুবর্ণদ্বীপে (সুমাত্রা) ও যবদ্বীপে (জাভা) তাঁর ধর্ম ও জ্ঞানপিপাসার পরিচয় দিয়েছিলেন। অনেক বছর এই দ্বীপগুলিতে তিনি ধর্মচর্চা করেন সেখানকার বৌদ্ধ আচার্যদের সঙ্গে। অতীশের মৃত্যুর পর তাঁরই শিষ্য ব্রনটন তিব্বতের বর্তমান লামা hierarchy অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিব্বতের ইতিহাসে অতীশের স্থান খুবই উচ্চে—আর এই থোলিংই হল তাঁর কীর্তির প্রধান কেন্দ্র।

এখানে থাকতে থাকতেই (নতুন করে ঝুব্ব্র আয়োজন করতে ছ-সাতদিন থাকতে হয়েছিল) এখানকার লামা ম্যাজিস্ট্রেট খুবংসুর সঙ্গে দেখা করলাম। আমরা কৈলাসযাত্রা শেষ করে আসছি শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমাদের তাঁর বাগানের মূলো খেতে দিলেন। তিব্বতে এই প্রথম ও শেষবার টাটকা সব্জী আমরা পেয়েছিলাম।

২০শে আগস্ট। আমরা দেশে ফেরবার জন্য থোলিং থেকে বেরোলাম। এই সময় লাসা থেকে একজন লামার সঙ্গে দেখা হল। কি চেহারা কি ব্যবহারে লাসা অধিবাসীরা পশ্চিম তিব্বতীদের চেয়ে কত ভাল এর আগেও দু-একবার আমরা দেখেছিলাম। কদিন আগে লাসার এক সদাগর দেখেছিলাম, খুব ভাল কাপড়চোপড় পরা, মাথায় বেশ ফ্যাশনের ফেল্ট টুপি আর তাঁর পিঠে অন্ততঃ ছটি দেবদেবীর প্রতিমা ফ্রেমে আঁটা বাঁধা আছে। আমাদের এই নতুন ধরনের ঠাকুরঘরটি বেশ ভাল করে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন এই লাসাবাসীটি।

২২শে আগস্ট। আমরা আর সত্লজের গভীর খাদের মধ্যে নেই। সামনে এখন মস্ত ময়দান হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের সাদা চূড়াগুলি ময়দানটি ঘিরে রয়েছে, আর ছোট ছোট পাহাড়ী নদী জায়গাটিকে অনেকটা সবুজ করে রেখেছে। এবার খুব বড় কিয়াংএর পাল (নিশ্চয়ই ১০০র কাছাকাছি হবে) আমাদের কেন্দ্র করে খুব বড় একটা বৃত্ত করে নাচ দেখাল—তারপর এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর একটু এগিয়ে আমরা আর একটি বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। সামনেই কামেত ২৬,০০০ ফুট উঁচু, গির্জের চূড়োর মত ওপরে উঠে গেছে আর তার গা থেকে একটি খুব বড় হিমপ্রবাহ নেমে এসে এই ময়দানের মধ্যে এসে

পড়েছে। এত বড় গ্লেসিয়ার যে আমরা দেখতে পাব ভাবিনি। এর পাশ দিয়ে আমরা কিছুদুর গেলাম, গ্লেসিয়ারের ওপরও খানিকটা হাঁটলাম। হাঁটা সুবিধের নয়—বরফজমা ঢেউগুলির ওপর দিয়ে হাঁটা ছুঁচলো পাথর বিছানো রাস্তার উপর হাঁটার মত কষ্টকর।

এমন সুন্দর জায়গা আর কবে দেখব তাই আমরা শিপুতে সেই সন্ধ্যায় তাঁবু খাটিয়ে রইলাম। রাত্রে কামেত আর অন্যসব হিমশৃঙ্গগুলি শেষবারের মত দেখা গেল। এরপর তো হিমালয়ের এ পিঠ (উত্তরদিকের) আর দেখা যাবে না।

তার পরদিন আমরা মানা গিরিবর্ত্মের ঠিক প্রবেশদ্বারে থেকে গেলাম। সামনেই মানা পাস বরফে ঢাকা ময়দানের মত দক্ষিণদিকে একটু একটু করে চড়ে গেছে। সে রাত্রি খুব শীত করেছিল।

২৩শে আগস্ট। ১৯২২ বেশ সকালে সকালে বেরিয়ে দুপুরবেলা মানা পাস-এ ঢোকা গেল। লিপুর চেয়ে মানা পাস অনেক বেশী উঁচু আর এখানকার দৃশ্যও চমৎকার। চারিদিকে বরফ, বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছি, মাঝে মাঝে মনে হয় যে দু'ধারে বরফের দেওয়াল আমরা দু'হাত দিয়ে ছুঁতে পারব। একটু এগিয়ে দেবতালে পৌঁছুলাম, চারিদিকে বরফের পাহাড়, তার মাঝখানে গাঢ় নীল ছোট সরোবর, জলে বড় বড় বরফের টুকরো ভাসছে, যেন খুব বড় সাইজের রাজহংসরা সাঁতার কাটছে। বাদাশা জাহাঙ্গীরের সময় এক জেসুইট মিশনারী Father Andrade এই রাস্তায় পশ্চিম তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিনি এই দেবতালকেই মানস সরোবর বলেছেন। বাস্তবিক এই দেবতাল দেবতাদেরই স্নানের জায়গা হবার উপযুক্ত। আমাদের সঙ্গের চাকরদের বরফের জলজ্বলে আলোতে চোখ ঝলসে যাবার ভয় হয়েছিল। আমরা পুরু রুমাল দিয়ে তাদের চোখ বেঁধে হাত ধরে খানিকটা পথ নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের নাগা সন্ন্যাসীকে কিছু করতে হয়নি, তিনি তাঁর বাঘছালের ওপর আমাদের দেওয়া একটা কম্বল জড়িয়ে, আমাদেরই দেওয়া পুরানো জুতো (তেমন ভারী পুরু জুতোও নয়) পরে বেশ হাসিমুখে মানা পার হলেন।

২৩শে আগস্ট বিকেলবেলা। আমরা দেশে ফিরে এসেছি। 'জাগ্রো'তে একটি গ্লেসিয়ারের পাশে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করছি। সন্ধ্যার আগেই বদ্রীনাথের কুলীরা এসে পৌঁছুল। থোলিং-এর ভোটিয়া সদাগর ধামসিং এসব বন্দোবস্ত আমাদের জন্য করে দিয়েছিল। ঝুব্বু ও ঝুব্বুওয়ালারা তিব্বতে ফিরে গেল।

২৪শে আগস্ট—অনেকটা নামতে হল, কোন রাস্তা নেই, একটা পাথর থেকে আগের আর একটা পাথরে পা দিতে হয়। মধ্যে বরফ গলা জল—মাঝে মাঝে লাফ দিয়েই এগুতে হয়। আমরা এখন সরস্বতীর তীর দিয়ে ভারতবর্ষের ভেতর এগুচ্ছি—একটু এগুতে অনেক সময় লাগছে। আর খাবারদাবার বিশেষ কিছু নেই।

২৫শে আগস্ট—সকালবেলা খুব হালকা জলখাবারের পর বেরিয়ে পড়া গেল। সন্ধ্যার আগে বদ্রীনাথ পৌছতে হবে নয়ত রাত্তিরটা অনাহারে কাটাতে হবে। এবার দৌড় আরম্ভ হল—যার যেমন শক্তি এগিয়ে চল বদ্রীর দিকে। একটি বড় তুষার সেতুর পাশ দিয়ে এলাম। ভোরবেলা এর বরফ নীল রঙের দেখাচ্ছিল।

ভাল করে দিনের আলো হলে দেখা গেল দূরে আমাদের বাঁদিকে সুন্দর নীল রঙের পাড়ের মত দিকচক্রবালের গায়ে আঁকা রয়েছে। হাওয়া জোরে চললে ঐ নীল রেখাও ভুলতে লাগল। অধ্যাপক কশ্যপ দূরবীন লাগিয়ে দেখে বললেন যে ও হল সুদূর বিস্তৃত হিমালয়ান নীল পপি (blue poppy) ফুলের ঝোপ—মাইলের পর মাইল সাজানো বাগানের মত হিমালয়ের এই অঞ্চলের রূপই বদলে দিয়েছে। বরফ গলার পর ও আবার নতুন করে বরফ পড়বার আগে পর্যন্ত হল আলপাইন ফুলের মরসুম। আমার এখন মনে হয় যে ঐটিই হল সেই জায়গা যা আজকাল 'নন্দনকানন' নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

ঘাসতৌলি পৌছুবার পর হাঁটতে আর কষ্ট পেতে হল না। তবে ভেড়া চরার পথ ও পাকদণ্ডী চার-পাঁচটি এক জায়গায় দেখা গেল আর সেইজন্য বেশ গোল বাধল। আমাদের তিন শিখ বন্ধু তো দৌড়ুতে দৌড়ুতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, অধ্যাপক কশ্যপ, রুমাদেবী ও মালপত্র নিয়ে কুলীরা পেছিয়ে পড়েছিল, আমি একলা পড়ে গেলাম। সামনে সরস্বতী নদী অনেক উঁচু থেকে পড়ে একটা গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার ঐকটি সুন্দর জলপ্রপাত হয়ে বেরিয়ে এসেছে এখানে। সত্যই অপরূপ দৃশ্য। খানিকক্ষণ তো অবাক হয়ে দেখলাম, তারপর ভাবতে হল কোন্ পথে কোন্ দিকে যাব। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক মেষপালকের দেখা পাওয়া গেল। অনেক কষ্টে ওকে বোঝালাম যে বদ্রীনাথ যাব। সে এক পাকদণ্ডী দেখিয়ে দিল। বেশ খানিকটা হেঁটে নানাগ্রামে এসে পড়লাম। বড়ই অপরিষ্কার গাঁ, তবু এটি হল বিদেশ থেকে ফিরে প্রথম দেশের বসতি। এক:রকম ভালই লাগলো। তারপর আরও ঘণ্টাখানেক বেশ জোরে পা চালিয়ে এক মোড়ের মাথায় একটি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলাম যে বদ্রীনাথ আর কতদূর।

সে বেচারা বড়ই আশ্চর্য হয়ে গেল, কথা না বলে হাত ঘুরিয়ে মোড়টা দেখিয়ে দিলে। মোড় ঘুরেই দেখলাম সামনে ভাল রাস্তা, একটু দূরেই বাজার দেখা যাচ্ছে। বাজারে ঢুকতেই দেখলাম আমার তিন বন্ধু পুরি, মিঠাই ও গরম দুধের সদ্ব্যবহার করছেন। তাঁদের সাদর নিমন্ত্রণে আমিও ভোজে যোগ দিলাম। কি ভালই না লাগল সেদিনের ভূরিভোজ। তারপর মনে পড়ল যে আমাদের পকেটে তো পয়সা নেই। আমাদের টাকাকড়ি বাক্সবন্ধ হয়ে, অনেক পিছনে কুলীদের পিঠে আসছে। হালওয়াইকে একথা বলতে সে আমাদের আশ্বাস দিলে যে কোনও ভাবনা নেই, কাল দাম দিও, তোমরা কৈলাসযাত্রী, আমার দোকানে তোমরা যে যাত্রা শেষ করে এসে খেলে এই আমার পরম সৌভাগ্য। যাহোক আমাদের ভোজনপর্ব শেষ হতে না হতে অধ্যাপক কশ্যপ, রুমাদেবী, কুলীদের নিয়ে পৌঁছে গেলেন। তাঁরাও এইখানেই খেলেন ও হালওয়াইকে তার সব পাওনা আমরা দিতে পারলাম। দু মাস পরে আমরা সে রাত্রি ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে শুলাম।

২৬শে আগস্ট সকালে 'তপ্ত কুণ্ডে' নেয়ে বদ্রীদর্শন করলাম। মন্দিরের বড় পূজারী রাওয়ালজী আশ্চর্য হলেন যে আমরা সংসারীর দল তিব্বত থেকে নেমে বদ্রীনাথ আসছি। মাঝে মাঝে দু-একজন সন্ন্যাসী আদি বদ্রীতে পূজা দিয়ে মানা পাস হয়ে বদ্রীদর্শন করেন। আমরা ভাল করে দুদিন ঠাকুরদর্শন করলাম, বদ্রীর গলার বনফুলের মালাও পেলাম। অনেকদিন সে মালার ফুল ছিল—সে ফুলের মধ্যে দু-একটি 'ব্রহ্মকমল'ও ছিল। এই বিখ্যাত ফুল আমার তো অনেকটা ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার মত দেখতে লাগল।

তীর্থযাত্রা এবার শেষ হল। আমরা হুড়হুড়িয়ে নামতে লাগলাম। তাঁবু দুটি বেচে দেওয়া হয়েছে, ঝুব্বু তো নেই-ই, লাদ্দু ঘোড়াও আর রাখা হয়নি, ঝাড়াঝাপ্টা হয়ে ঘরমুখো চললাম। চমোলিতে বন্ধুর পাঠানো টাকা পেলাম। শ্রীনগরে (গাড়োয়াল) তিনটি শিখবন্ধু অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটিতে গোলমালের খবর পেয়ে রোজ দুটি করে 'পড়াও' (আন্দাজ ১৭।১৮ মাইল) চলবেন এই মতলব করে হরিদ্বারের রাস্তা ধরে চলে গেলেন। আমরা তিনজন—অধ্যাপক কশ্যপ, রুমাদেবী, আমি ও প্রফেসর মশায়ের চাকর বরকত রাম অত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার নেই বলে ল্যান্সডাউন, পৌড়ি, কোট-দ্বারের রাস্তা ধরলুম। আমরা ৯।১০ মাইল করে রোজ হাঁটতুম, রাত্তিরটা ডাক-বাংলায় আশ্রয় নিতুম, বেশ আরামেই শেষের দিকটা কাটানো হল। পৌড়িতে

ঢুকছি এমন সময় আমার সঙ্গে একজন ইংরেজ officialএর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমার পোশাকপরিচ্ছদ ও sunburnt চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথা থেকে আসছি। যখন আমি বললাম আমরা (কশ্যপ ও রুমাদেবী কুলীদের সঙ্গে পেছিয়ে পড়েছিলেন) পশ্চিম তিব্বত থেকে আসছি, তখন তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমাদের ভ্রমণ বিবরণ শুনলেন। শুনলাম তিনি হলেন কুমায়ুন ও গাড়োয়াল ডিভিশনের কমিশনার মিঃ উইন্‌হাম। তিন বছর পরে লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ-এ এঁর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। মানুষটি খুবই ভদ্র, ওঁর কথাবার্তা খুবই ভাল লেগেছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর কোটদ্বার রেল স্টেশনে রেলগাড়িতে ওঠা গেল। ১৯শে জুন রেলগাড়ি থেকে নেমেছিলাম। ১৩ই সেপ্টেম্বর ঘরের ছেলে ঘরে (লাহোরে) ফিরে এলাম।

এই মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রায় সাংসারিক জীবনে কোনও উপকার হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু যে একটা মনের নিজের জগৎ আছে সেখানে এই পর্বতলঙ্ঘনস্মৃতি এমন একটি অনুপ্রেরণা দিয়েছিল যা বাস্তবিকই অমূল্য। এরপর মনে এক বিশ্বাস রয়ে গেল যে স্থিরসংকল্প করে কোনও কাজ হাতে নিলে সে কাজ ভাল করে শেষ করতে পারব। এ যাত্রায় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, এসব সত্ত্বেও মনে এক আত্মপ্রসাদ এসেছিল যে একটি করবার মত কাজ করতে পেরেছি। আর এরপরও ভাল কাজ ভালভাবে করতে পারব। অনেক বাধা-বিঘ্ন দেখে পেছিয়ে যাব না।

প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় বিদেশ ভ্রমণ

কিছুদিন তো খুব খাওয়াদাওয়া আর ঘুমানো চলল। রুমাদেবী দিনকতক লাহোরে থেকে হরিদ্বার হয়ে তাঁর দেশের দিকে চলে গেলেন। অধ্যাপক কশ্যপ লাহোরে এই কৈলাস যাত্রার বিষয় Lantern Slides দিয়ে বক্তৃতা দিলেন। এর কিছু-দিন পরে আমিও ঐ slides নিয়ে গিয়ে কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি শুনতে এসেছিলেন।

১৯২৩ সালে আমার ছোট মেয়ে মানসীর জন্ম হয়। আর এখানেই বলে রাখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সময় মানসীর কৈলাসনাথের সঙ্গে বিবাহ হয়। মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রার কিছু প্রভাব এতে নিশ্চয়ই ছিল। এই বছর শিখেদের মধ্যে শিখ গুরুদোয়ারা বিশেষতঃ দরবার সাহেব (গোল্ডেন টেম্পল) নিয়ে গোলমাল খুবই বেড়ে যায়। আকালিরা এবার স্থির করল যে খালসা কলেজকে ওরা সরকারের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। এই খালসা কলেজ ও স্কুল থেকে শিখ রেজিমেণ্টের জন্য অফিসার বাছাই হত। দু-তিনজন অন্ততঃ স্যাণ্ড-হার্স্ট'এ গিয়েছিল এখান থেকে। তাই কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইসপ্রিন্সিপাল ইংরেজ হতেন ও আই. সি. এস. কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার কলেজের President ও Vice-President হতেন। কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, আর একজন সিনিয়র অধ্যাপক ইংরাজ ছিলেন I. E. S. পদের। বাকী শিক্ষকেরা দেশীয় ও বেশীর ভাগই শিখ। বাস্তবিক এই কলেজের উপর ব্রিটিশ সরকারের কড়া নজর ছিল আর এ সময় একদিকে আকালি আন্দোলন ও অন্যদিকে দেশজোড়া অসহযোগ বিক্ষোভ খালসা সমাজের আগেকার গতানুগতিক মনোভাব বদলে দিয়েছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ধনী পরিবার ছাড়া প্রায় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও যুব শিখসমাজ একটি সত্যিকার জাতীয়তা ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। আমাদের কলেজেও এর ঢেউ ভালরকমই ঢুকেছিল।

তবে এর জন্যে যে পড়াশুনা শিকেয় উঠেছিল তা নয়। বাবার খুব ইচ্ছে

ছিল আর আমারও মনে হয়েছিল যে এবার কিছু রিসার্চ কাজ করে একটি ডক্টরেটের থিসিস লিখি। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম যে গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যাণ্ডার্ড বিষয়টি সময়োচিত হবে আর আমাকেও এ বিষয়ে ওর কাজ করবার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতে হবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের টাকাকে ইংলণ্ডের শিলিংএর সঙ্গে আগেকার হারে (1Re = 1s 4d) টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। নতুন হার কি হবে, 1Re = 1s 6d বা 2s, ব্রিটিশ সরকার ঠিক করতে পারছিল না। একটি উপায় ছিল যে দেশের মধ্যে রূপো বা কাগজের মুদ্রা চলুক, বাইরের দেশের সঙ্গে আদানপ্রদানের বেলায় 1Re = 1s 4d এই হার ঠিক করা থাক। অর্থাৎ দেশের মধ্যে যে মুদ্রা (রূপার টাকা বা নোট) চলবে তার সঙ্গে বিলেতের শিলিংয়ের (তার মানে সোনার সঙ্গে) কোনও সম্বন্ধ থাকবে না। কেবল বিদেশের সঙ্গে যে মুদ্রা বিনিময়ের দরকার হবে সেই বিনিময়ের হার ঠিক 1s 4d করে রাখা হবে। সে সময় এই গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যাণ্ডার্ড এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় অধিকারভুক্ত অনেক-গুলি দেশে চলতি ছিল, কিন্তু এই ইউরোপীয়ান দেশগুলির নিজেদের ব্যবহারের জন্যে (দেশের ভেতর ও বাইরের দুরকম ব্যবহারের জন্যেই) যে মুদ্রার চলন ছিল তার সোনার সঙ্গে একটা নিশ্চিত হার ছিল (fixed rate)। আর ওখানকার রূপোর মুদ্রা ও নোটও ইচ্ছামত স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করা যেত। একে গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড বা স্বর্ণমান বলা হত। আমাদের দেশের অনেকেরই মতে তখন গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যাণ্ডার্ড দাসত্বের প্রতীক নিম্নশ্রেণীর মুদ্রা প্রচলন বলে গণ্য হত আর স্বর্ণমানই (Gold Standard) বাঞ্ছনীয় মনে করা হত। এখানে এইটুকু বলে রাখি যে এখন (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে) কোন দেশেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নেই, আর দেশবিদেশের মধ্যে লেনদেনের জন্য প্রত্যেক দেশের মুদ্রার দাম সোনার সঙ্গে একটা বিশেষ হারে বাঁধবার চেষ্টা চলছে। বলা যেতে পারে যে গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডের জায়গায় আজকাল গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যাণ্ডার্ডই সর্বত্র চলছে। কিন্তু ৪৫ বছর আগে এ কথা বললে আমাদের অর্থনীতিবিদরা মারতে আসতেন।

আমি কাজটা তো আরম্ভ করলাম, কিন্তু এই বিষয়টা ভাল করে বোঝবার জন্যে যা মালমসলা দরকার দেখা গেল তা এ দেশে পাওয়া মুশকিল। কাছাকাছির মধ্যে শ্যামদেশ, ফরাসী ইন্দোচীন, ফেডারেল মালয় রাজ্য (এখনকার মালয়) ডাচ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়া) ফিলিপীনস—এরা সে সময়েও গোল্ড

এক্সচেঞ্জ স্ট্যাণ্ডার্ডের দলভুক্ত। এদের মধ্যে দু-একটি দেশ ঘুরে আসা দরকার মনে হয়েছিল, আর তাছাড়া তিব্বত দেখবার পর আরও দু-একটি বৌদ্ধ দেশ দেখবার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল।

১৯২৩ সালে গরমের ছুটিতে আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবার একলা, কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে সেই পুরাতন যুগের দক্ষিণসমুদ্রযাত্রীদের পদানুসরণ করে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিলাম। এঁরাই দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ায় (কম্বুজ, চম্পা, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, বঙ্গীদ্বীপে) ভারতের ধর্ম (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ) ও সংস্কৃতি নিয়ে গিয়ে সেখানে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। আমরা তাঁদের কীর্তি-কলাপ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, তবে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের পুরাতত্ত্ববিদরা তা কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করেছিলেন। যেহেতু তাঁদের ভাষা আমবা শিখিনি, তাই বিষয়ে লেখা বইগুলি আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গিয়েছিলো। যখন মাঝ-সাগরসঙ্গমে পৌঁছে সমুদ্রপাড়া হয়ে খুব বমি করছি, তখন কি জানি যে স্বতঃ খানিকটা এ কাজ করতে পারব—তারপর প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় (যা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম) ফরাসী পণ্ডিতদের সাহায্যে দেশের লোককে আবার জানাতে পারব! আমি তো তখন অর্থনীতির মুদ্রা বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে যাচ্ছি বিদেশে, ওরকম করে যে সমস্ত লক্ষ্যটাই বদলে যাবে তা ভাবিনি।

তার পরদিন সমুদ্রপীড়া আর বেশী কষ্ট দেয়নি, কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম, 'কালাপানীর' কালরূপ (অত কালো জল আর কোথাও দেখিনি) দর্শন হল। ডেকে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কেবিনে ঢুকে দেখলাম সহযাত্রীটি কেবিনের "পোর্ট হোল" (Port hole) খুলে বেশ হাওয়া খেতে খেতে বার্থে শুয়ে আছেন। হাওয়াটা সত্যিই খুব ভাল লাগছিল, আমিও বেশ আরামে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ পোর্ট হোল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা ঢেউ ঢুকে আমাদের কেবিন যেন ভাসিয়ে দিলে। আমার সঙ্গীটির তখনকার মুখের ভাব, কি করে ভদ্রলোক চমকে উঠেছিল, এখনও আমার মনে আছে। এক ঝুড়ি পটল কলকাতা থেকে রেঙ্গুন নিয়ে যাচ্ছিল, দেখতে দেখতে সব হেজে গেল। তার কেবিন বয় এসে আমাদের খুব বকল, আমাদের ডেকে পাঠিয়ে দিয়ে বিছানাপত্র সব বদলালো আর "পোর্ট হোল" কষে বন্ধ করে দিয়ে গেল আমরা যেন আর খুলতে না পারি।

অভ্যেস নেই বলে, আর নিরামিষাশী ছিলাম বলে জাহাজের খাওয়াদাওয়া ভাল লাগত না। নীচের ডেকে তৃতীয় শ্রেণীর ডেক যাত্রীরা যখন রুটি, শাকভাজা

রেঁধে খেত আমার তখন খুব লোভ হত। তার পাশাপাশি মাঝেমাঝে ঘুরতাম, ঘ্রাণেই অর্ধেক ভোজন হত।

কেবিনে আর হাওয়া খাওয়া যেত না, এখন ডেকেই থাকতে হত। অনেক নতুন জিনিস চোখে পড়ল—উড়ন্ত মাছ, শুশুক, রাত্রে জাহাজের কাছে ঢেউয়ের ওপর চিকচিক করছে আলো। এক প্রবীণ সারেঙের কাছে সাইক্লোন, টাইফুনের লোমহর্ষণ গল্প শোনা গেল। সাইক্লোন হল আমাদের দেশের টাইফুন চীন সমুদ্রের। একই ব্যাপার। দু-তিনদিন পরে ডাঙা দেখা গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে সী গাল পাখি জাহাজের চারধারে ঘুরতে লাগল। আমরা বর্মায় পৌছুলাম।

(ব্রহ্মদেশের চেয়ে মর্মার দেশ বলাই উচিত। হাজার দেড়েক বছর আগে এখানে মর্মী নামে জাতি বাস করত। তাদেরই নামে দেশের নাম।)

বর্মায় তো পৌছুলাম। সব প্রথম তো রেঙ্গুন—যাত্রীরা নেবে গেল। আমরা প্রাতর্ভোজন খেয়ে ধীরেসুস্থে ডাঙায় নামলাম। আমি আর জাহাজের ডাক্তার (তিনিও বাঙালী) আমার কেবিনের সঙ্গীর বাসার খোঁজে গেলাম। ভদ্রলোক বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা তাঁর ঘর দেখলাম। শরৎ চাটুজ্যের 'শ্রীকান্ত' ও 'পথের দাবী'তে যেমন পড়া গিয়েছিল সেইরকম জরাজীর্ণ কাঠের মেঝে, দোতলায় তক্তার ফাঁকে ফাঁকে নীচের ঘর দেখা যায়, মোটের ওপর ভাল লাগবার মত কিছুই নেই। জাহাজে ফেরবার আগে রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির শোওয়ে দাগন দেখে এলাম। হ্যাঁ, এ মন্দির মনে রাখবার মত, মস্ত ব্যাপার আর খুবই সুন্দর, ঝক্‌ঝক্ করছে যেন সোনা দিয়ে মোড়া। কতকগুলি মেয়ে থালায় করে পদ্মফুল নিয়ে পূজো করতে যাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় রাশি রাশি ফুল বিক্রি হচ্ছে, অনেক ভক্ত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে—সব মিলিয়ে দেখে মনে খুব তৃপ্তি হল। বন্দরের কাছাকাছি এসে এক জায়গায়, আমাদের দেশের যাত্রার মত নাচগান হচ্ছিল—তাও দেখা গেল। তার পরদিন জাহাজ পিনাংএর দিকে চলল।

সমুদ্র এখন শান্ত স্থির, ডেকে বেড়াতে খুব ভাল লাগছিল, প্রায়ই ছোট ছোট দ্বীপ কাছেই দেখা যাচ্ছিল, ডাঙাও দূর ছিল না। সমুদ্রের জল এদিকে কালো নয়, হালকা সবুজ। কালাপানীর সেই বিকট রূপ আর নেই। পিনাং পৌছুনো গেল। সুন্দর জায়গা, রেঙ্গুন বন্দর বাস্তবিক বিশ্রীই ছিল। ডাক্তার আর দু-চারজনের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এলাম। বাজারে একটি গুজরাটি জহুরীর দোকানে (সেখানে ঘড়িও বিক্রি হত) আমার ঘড়ির স্ট্র্যাপটা ঠিক করিয়ে নিলাম। ফেরবার পথে এই গুজরাটি ভদ্রলোকের বাড়ি দুদিন ছিলাম, খুব যত্নে আমাকে রেখে-

ছিলেন। ৩৪ বছর পরে আবার পিনাং-এ এসেছিলাম, সপ্তাহখানেক ছিলাম এক কনফারেন্স উপলক্ষ্যে। পিনাং আমার খুবই ভাল লেগেছিল, ইচ্ছে করে আরেকবার সেখানে যাই। পিনাং মানে 'সুপুরি' মালে ভাষায়। বাংলায় পুলি-পুলম বলে যে জায়গার নাম পাওয়া যায় পুরনো বইয়ে (যেমন "আলালের ঘরের দুলাল") সে জায়গা এই পিনাং। তখন যারা যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হত সেই সব অপরাধীদের 'পুলিপুলমে' পাঠানো হত। 'পুলম' মালে ভাষায় দ্বীপ। মালায়া যখন আর ভারত সরকারের নীচে রইল না, তখন আন্দামান দ্বীপ এই কাজে লাগানো হল।

এখন পিনাংএ অনেক মধ্যবিত্ত ভারতবাসী থাকেন, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি। তবে এখানকার ধনী সম্প্রদায় হয় চীনা বা ইংরাজ। মালেরা বেশীর ভাগ তখন ছোট কাজ (পুলিস কনস্টেবল, চাকর, মজুর) নিয়েই থাকত শহর অঞ্চলে, গাঁয়ে চাষবাস অবশ্য ওদের হাতেই ছিল। লেখাপড়ার দিক দিয়েও মালেরা খুব পেছিয়ে পড়েছিল। তবে অভিজাত সম্প্রদায় খাঁটি মালে (Malay) ছিল। ছোট ছোট স্টেটগুলি এক-একটি সুলতানের নীচে তাঁর মালে পাত্রমিত্র নিয়ে এক-একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, ব্রিটিশ প্রেসিডেন্টের প্রায় সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন। আজ অবশ্য এসব বদলে গেছে।

সেবার পিনাং-এ কম সময়ই ছিলাম, ওখান থেকে বেরিয়ে Port Swettenham-এ জাহাজ থামল। ঐ পোর্টকে পোর্ট বলাই বড় বেশীরকম বাড়িয়ে বলা। জাহাজ যেখানে নোঙর ফেলল তার চারিদিকে জলাভূমি ও ছোট ছোট গাছের জঙ্গল, একটি ছোট নদী কুয়ালালামপুরের দিক দিয়ে এসে এখানে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে। কুয়ালালামপুর হল ব্রিটিশ মালয়ার রাজধানী, আর Port Swettenham হল রাজধানীর বন্দর, এই নদীটি রাজধানীর বাণিজ্যের সামগ্রী Port Swettenham-এ পৌছে দেয়, আর এখান থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ সে সব মাল দেশবিদেশে দিয়ে যায়।

এবার সিঙ্গাপুর যাত্রা, ওখান থেকে এ জাহাজ আবার কলকাতায় ফিরবে। Strait of Malacca—মালাক্কা প্রণালীর মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। একদিকে মালায়ার মালাক্কা প্রদেশ অন্যদিকে সুমাত্রা—দুদিকই মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই সমুদ্রের খাড়ীর মধ্যে দিয়ে হল পশ্চিম জগৎ ও পূর্ব জগতের সব রকম আদান-প্রদানের পথ। এই পথের উপর যে রাজ্যের প্রভুত্ব গড়ে ওঠে সেই রাজ্যের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে খুবই বেড়ে ওঠে। মধ্যযুগের শ্রীবিজয়রাজ্যের

উত্থান এর উদাহরণ।

কলকাতা থেকে বেরিয়ে বারদিন পরে সিঙ্গাপুরে জাহাজ পৌছুল। সিঙ্গাপুর প্রাচীন সিংহপুর; এখন পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর, আমেরিকার জাহাজ এখানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, ব্রিটিশ মানওয়রি ক্রুজার প্রভৃতি বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। সিঙ্গাপুর ফ্রী পোর্ট—আমদানী জিনিসের ওপর শুল্ক লাগে না, আর এখান থেকে রবার ও টিন পৃথিবীর সব দেশে রপ্তানি হয়। রবার ও টিন এ দুয়ের উৎপাদনে মালায়া অদ্বিতীয়—যদিও এতে মালেদের অংশ কমই। চীনা ও ইংরাজ এরাই এ কাজ একচেটিয়া করে নিয়েছে। ৫০ বছর আগে মালায়ার মালেদের (অভিজাতবর্গ ছাড়া) অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, দেশের সম্পদ বিদেশীর হাতে ছিল। স্বাধীন মালায়ায় এখন এর প্রতিক্রিয়া চলছে। চীনা ব্যবসায়ীদের ওপর মালায়া এখন খড়্গহস্ত। তবে সিঙ্গাপুরে চীনারা নিজেদের আগেকার প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছে, মালায়াতে অবশ্য ওদের কিছু হঠতে হয়েছে। ১৯৫৭ সালে মালায়া ও সিঙ্গাপুর স্বাধীন তো হল কিন্তু দুইয়ে মিলে একটি রাষ্ট্র হতে পারল না, আলাদা আলাদাই রয়ে গেল। খাস মালায়ার মধ্যেও মালে, চীনা ও ভারতীয় নিয়ে বহু সমস্যা উপস্থিত, এরকম পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র চালানো দুরূহ ব্যাপার। ১৯২৬ সালে ব্যাপার অন্যরকম ছিল, মালেরা নিজের দেশে কেবল ইংরেজের নয় চীনা ও কিছুটা ভারতীয়দেরও প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য ছিল। ১৯৬৯-৭০-এ এই বহুজাতি সমস্যা মালায়াকে বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ করেছিল।

সিঙ্গাপুরের একটি শিখ ভদ্রলোকের ঠিকানা আমি অমৃতসরেই পেয়েছিলাম। জাহাজ থেকে নেমে ডাক্তারের কাছে বিদায় নিয়ে সোজা সেইখানে চলে গেলাম। এঁর খেলবার জিনিসের কারবার ছিল। জাভা, ভারত প্রভৃতি দেশে খেলার জিনিস পাঠাতেন, একটি জাপানী মিস্ত্রী ওঁর কাছেই থাকত, ব্যবসা চলছিল ভালই। আমাকে কর্তা গিন্নী সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁদেরই বাড়ির একটি ঘরে রাখলেন। ২৫ বছর পরে একদিন দেখলাম মীরাট কলেজের খেলবার মাঠের কাছে একটি পাঞ্জাবি রেফুজি কলোনি হয়েছে, সেখানে তাঁরাও এসেছেন। মালায়ায় ও সিঙ্গাপুরে জাপানী আক্রমণের সময় তাঁরা দেশে ফিরে এসেছেন। তবে তখনও তাঁদের আগেকার ব্যবসা চলছে।

এক সপ্তাহ আন্দাজ সিঙ্গাপুরে ছিলাম। ওখানকার সরকারী দপ্তরে মুদ্রা-বিষয়ে কথাবার্তা হল, একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী বেশ ভাল করেই ওখানকার সমস্যা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর চেহারা অদ্ভুত, সম্ভবতঃ ইউরো-আফ্রিকান। তিনি

অফিস থেকে চলে যাবার পর একটি ইংরেজ অফিসার আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কওয়ার মধ্যে বললেন যে আপনি যেন ভুল না বোঝেন ওঁর চেহারা দেখে, উনি অতি বিচক্ষণ অফিসার, অফিসের বড়সাহেব। একদিন ওখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের একটি ক্লাবে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁদের অভ্যর্থনার উত্তরে আমি ইংরাজিতে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তাতে তাঁরা দুঃখপ্রকাশ করলেন। তারপর আমাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলতে হল। হিন্দীতে বক্তৃতা দেবার অভ্যাস তো মোটেই ছিল না। সভার সভাপতি ছিলেন গুজরাটি, তিনি আমার চাইতেও হিন্দী বলতে অপারগ, সুতরাং আমার হিন্দীর আর সমালোচনা করলেন না। এখানে আমি 'মুদ্রা বিনিময়' বিষয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করিনি কারণ ভাষায় কুলোত না। এসব দেশের সঙ্গে ভারতের কতদিন থেকে নিকট সম্বন্ধ (তখন আমি এ বিষয়ে কিছু জানতাম না), তাঁরা এই নিয়ে কিছু খোঁজ করেছেন কিনা, এইসব কথা দিয়ে দশ-বারো মিনিট কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ওখানকার এক মেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে চীনা মহিলাদের সেই সেকালকার মত খুব ঢিলে রেশমী পোশাক দেখা গেল। ৩১ বছর পরে চীনে পুরাতন নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানে থিয়েটারের স্টেজে এরকম পোশাক আবার দেখেছিলাম। একদিন বেতের কারখানা দেখতে (মালাক্কা বেত) গিয়েছিলাম আর সেখানে দুটি মালাক্কা বেত কিনলাম। আর যে ক'দিন ওখানে ছিলাম পেট ভরে আনারস খেয়েছিলাম। বরফের বড় বড় ব্লক ও আনারস ঠেলায় করে চীনে ফেরিওয়ালারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, র‍্যাদা করা গুঁড়ো বরফ দিয়ে আনারসের টুকরো বিক্রী করতো। সিঙ্গাপুরে খুব ধনী লোকও চীনে আর খুব গরীবরাও চীনে।

এখানকার কাজ শেষ করে এবার শ্যাম দেশ (সিয়ান বা থাইল্যাণ্ড) চললাম। বন্ধুরা F. M. S. R.-র গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে গেলেন। সিঙ্গাপুর তো ছোট দ্বীপ। খানিকক্ষণের মধ্যেই সেই সেতু (causeway) পার হয়ে গেলাম যেটি এই দ্বীপকে মালায়ার সঙ্গে যোগ করে রেখেছে। জাপানী আক্রমণের সময় এই সেতু ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও জাপানীদের থামাতে পারা যায়নি।

তার পরদিন কুয়ালালামপুর পৌঁছুলাম। এটি হল মালায়ার রাজধানী ও এখনও এটিই স্বাধীন মালায়ার রাজধানী। এখানে ট্রেন অনেকক্ষণ থামে বলে গাড়ি থেকে নেমে একটু বেড়িয়ে এলাম। স্টেশনের শিখ পুলিসের কি সুন্দর ইউনিফর্ম আর কি জমকালো চেহারা! আমি অমৃতসর থেকে আসছি শুনে

আমাকে একজন শিখ কনস্টেবল রাস্তা দেখিয়ে বলে দিল যে আপনি ঘণ্টা দুয়েক বেড়িয়ে আসতে পারেন, আপনার জিনিসপত্রের জন্যে কোন ভাবনা নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখলুম সবপ্রথম পান্থপাদপ (travellers palm), বড়ই সুন্দর গাছ, পেখমধরা কলাগাছের মত। এতগুলি আর এত চমৎকার পান্থপাদপ আর কখনও দেখিনি। এই শহরের বাড়িগুলি গম্বুজওয়ালা মুসলমানী ধরনের, সিঙ্গাপুরের মত হালফ্যাসানের বিলাতী ধরনের নয়। আবার স্টেশনে ফিরে গেলাম। ট্রেন চলল অফুরন্ত রবার গাছের বাগানের মধ্য দিয়ে, অনেক গাছেই চীনামাটির ভাঁড় লাগানো, গাছের গুঁড়িতে ফুটো করে ঐ ভাঁড়ে তরল রবার জমা করা হচ্ছে।

সন্ধ্যার সময় পিনাঙে পৌঁছুনো গেল। এখানে এবার Thomas Cook-এর টিকিটে একটি সাহেবী হোটেলে আমার রাত্রে থাকার কথা ছিল। এখান থেকে শ্যামদেশ যাবার গাড়ি পরের দিন সকালে ছাড়বে। সে গাড়ি F. M. S. এর (Federated Malay States) নয়, শ্যাম রাজ্যের। দু হাতে দুটি লম্বা মালাক্কা বেত (ওখানেও দুটি ছাঁটা হয়নি) হাতে করে চব্বিশ ঘণ্টা ট্রেন যাত্রার চটকানো কাপড়চোপড়ে এই শৌখীন ফ্যাশানের হোটেলে পৌঁছুলাম। মনে হল এই মূর্তি দেখে চীনে দরওয়ান প্রায় হেসে ফেলেছিল, কিন্তু টমাস কুক-এর টিকিট দেখে সামলে নিলে আর খুব ভদ্রভাবে আমার জিনিসপত্র ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে লোক ডেকে দিলে। আমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে উঠলাম, যাবার সময় দেখলাম খুব সুসজ্জিত ডাইনিং ঘর। অনেক সাহেব-মেম ডিনার খাচ্ছে ফিটফাট পোশাক পরে। আমি বড়ই হাঁফিয়ে পড়েছিলাম। আবার কাপড়চোপড় ছেড়ে ভদ্র হয়ে ডাইনিং রুমে যাবার ইচ্ছে হল না। বেয়ারাকে বললাম যে আমি নিজের ঘরেই খাব দুধ, ফল, আর রুটি মাখন। মিনিট দশেকের মধ্যেই বড় ট্রে করে সুন্দর জগে দুধ, বরফ দেওয়া আনারস, রাম্পাস্টান (লিচুর মত ফল), আইসক্রীম, পাঁউরুটি স্লাইস, মাখন ইত্যাদি আমার সামনে একটি ছোট টেবিলে রাখলে। আমি খুব তৃপ্তি করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সমস্ত রাত মনে হল যেন জাহাজে আছি, খুব বড় বড় ঢেউ জাহাজ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ভোরবেলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম যে সামনেই খোলা সমুদ্র, বড় বড় ঢেউ এসে জানলার নীচে সমুদ্রতীরে এসে পড়ছে। এরকম সুন্দর সমুদ্রতীর আগে দেখিনি। বন্দরগুলির কাছে তো কেবল জেটি, ডক আর ময়লা জলই দেখা যায়।

হোটেলের হিসেব চুকিয়ে বেয়ারাকে বকশিশ দিয়ে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ফিরে

শ্যাম-মালয় গাড়িতে নিজের বার্থে বসলাম। শ্যামদেশীয় ড্রাইভার, গার্ড, টিকিট চেকার এ গাড়ির চার্জে। এখানে বলে রাখি সে সময় (১৯২৩ সালে) থাই (Thai) শব্দ ব্যবহার হ্ত না, তখন Siam (শ্যাম নয় সাইয়াম), Siamese, এই কথাগুলি সরকারী, বেসরকারী সব কাজেই বলা চলত। থাই ও সাই এ দুয়েরই মানে স্বাধীন, এ দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তি যতদূর জানি একই। বোধ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দু-তিন বছর আগে থেকে সাইয়াম বা সাইয়ামই বলা বন্ধ হল, তার জায়গায় থাইল্যাণ্ড ও থাই সরকারী নাম ঘোষণা করা হল। এ পরিবর্তন হল রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল, দেশের রাজার হাত থেকে ক্ষমতা দেশের সেনাপতির হাতে এল।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন প্রায় সব উচ্চপদ সামরিক ও অসামরিক রাজপরিবারের রাজকুমারদের হাতে ছিল। বছর ত্রিশেক দেশে উচ্চশিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর রাজপুত্রদের এরকম একচেটে প্রভুত্ব আর চলল না। সাইয়াম-এর রাজা চূড়ালঙ্কারণ নিজের দেশকে সব বিষয়ে আধুনিক যুগের উপযুক্ত করবার জন্য বিশেষ করে স্কুল কলেজের ভাল ছাত্রদের ইয়োরোপে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই ছাত্ররা যখন ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী থেকে শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে এল, তখন চূড়ালঙ্কারণ আর এ জগতে নেই, তাঁর বড় ছেলেও মারা গেছেন, সেজ ছেলে রাজত্ব করছেন। এই বিলাতফের্তারা মোটেই রাজার ও রাজকুমারদের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব মানতে রাজী হল না। প্রথমে তো উচ্চশিক্ষিত অসামরিক ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা এল, কিন্তু এ ব্যবস্থা টিকলো না, সমরবিভাগ এবার এগোল, অসামরিক শাসক সম্প্রদায়কে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের সেনাপতির হাতে সমস্ত শাসনভার ও শাসন করবার জন্য অব্যাহত ক্ষমতা সমর্পণ করল। সেই সময়েই (১৯৩৬) দেশের নাম সাইয়াম থেকে থাই দেশ হল। সাইয়ামী-রাও থাই বলে দেশবিদেশে পরিচিত হলেন।

আমাদের ট্রেন এবার গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, এ জায়গায় নাকি কিছুদিন আগে বুনো হাতী ট্রেন দেখে খেপে গিয়ে ইঞ্জিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। যা হোক, এবার বুনো হাতী দেখা দেয়নি।

তবে আর এক সমস্যা উপস্থিত হল—এই ট্রেনে রাত্রে বিছানা ও মশারি দেওয়া হয়। আমার টমাস কুক-এর টিকিটে এই বিছানার ও মশারির ব্যবস্থা ছিল না। মহামুস্কিল হল—এর জন্য অতিরিক্ত মূল্য কেমন করে নেওয়া যায়? সাইয়ামী টিকল (tical) ও ব্রিটিশ পাউণ্ড স্টারলিঙের কি বিনিময়

হয় হবে—এইসব প্রশ্ন নিয়ে ট্রেনের গার্ডের মাথা ঘুলিয়ে গেল। সহযাত্রীরা ভয় পেলেন, আমাকে মাঝরাস্তায় নামিয়ে না দেয়। যা হোক, কিছু ব্রিটিশ মুদ্রা দিয়ে (আর দরকার হলে ব্যাঙ্কক পৌঁছে আবার হিসেব করা যাবে এই বলে) আপাততঃ মিটমাট হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে বার্থের ওপর ভাল বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে বেশ ঘুমুনো গেল।

সকাল হলে দেখি যে বাইরের দৃশ্য বদলেছে। যেখানে একটু উঁচু জায়গা দেখা যায় সেখানেই এক একটি বৌদ্ধ মন্দির—কোনটি বড় কোনটি ছোট। সূর্যোদয়ের সময় আমাদের গাড়ি ভারি স্বন্দর একটি ময়দানের মধ্যে এসে পড়ল। চারিদিকে সবুজ লন, ঢালু হয়ে সমুদ্রতীরে এসে নেমেছে। শুনলাম এটি রাজার খুব শখের গল্‌ফ লিঙ্কস্‌—হুয়াহিন এর নাম। পর্যটকেরা বা যারা পৃথিবী পর্যটন করতে করতে এদেশে আসেন তাঁরা এখানে দু-একদিন থেকে তারপর রাজধানী ব্যাঙ্ককে যান। ট্রেনের জানলা থেকেও সমুদ্রতীর ও গল্‌ফ লিঙ্কস্‌ চমৎকার দেখাচ্ছিল। আর একটি দেখবার মত জায়গার নাম শোনা গেল—নকন পটন (নগর প্রথম)। এখানে এ দেশের সব চেয়ে পুরনো, বৌদ্ধমন্দির থাইদের বড় তীর্থস্থান। বলা বাহুল্য, এসব বৌদ্ধমন্দির ও মঠ থেরাবাদ বৌদ্ধধর্মের—প্রায়ই যাকে আমরা হীনযান বলে থাকি। দক্ষিণ এশিয়ার বৌদ্ধেরা থেরাবাদী বা হীনযানী। তবে সাত-আট শত বছর আগে, যখন কম্বুজ বা খমের সাম্রাজ্য শ্যাম, কম্বুজ (Cambodia), দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস ও উত্তর মালায়া এসব জুড়ে আধিপত্য করত তখন হীনযান এ অঞ্চলে আসেনি। কম্বুজ সম্রাটরা শৈব কিংবা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন।

বিকালবেলা ব্যাঙ্কক স্টেশনে গাড়ি এসে থামল। প্লাটফর্মে থাই-ইউরোপীয় ফ্যাশানে স্বসজ্জিত অনেক ভদ্রলোক ও মহিলা দেখলাম। এ নতুন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ ভালই লাগল। বেটাছেলেদের পরনে রেশমী ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, কালো ফুলমোজা, পাম্পশু, গায়ে বুকখোলা কোট, ভেতরে সাদা রেশমী কামিজ দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের পায়ে মোজা, চটি, রেশমী সারং (লুঙ্গি), গায়ে রেশমী ব্লাউজ। অনেকেরই চুল ছোট করে ছাঁটা। প্রাচীনদের ওরকম সৌখীন ব্লাউজ নেই, গায়ে উড়ুনি, স্বতীর সারং, দাঁত মিশি দিয়ে কুচকুচে কালো করা, খালি পা। তাদের চুল একেবারে খুব ছোট করে কাটা। পরে শুনেছিলাম যে মেয়েদের ওরকম বিশ্রী করে রাখবার কারণ ছিল যে বর্মীরা প্রায়ই এদেশে লুটতরাজ করত আর এখানকার মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসী

করে রাখত। যা হোক, এখন তো সে ভয়ও নেই আর সে রেওয়াজও উঠে গেছে। ওরকম বুড়ি বোধ হয় ব্যাঙ্ককে আজ আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ভাড়াটে ফীটন করে একটি হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ীর ঠিকানায় চললাম। এখন মনে নেই এই ঠিকানা সিঙ্গাপুরে আমার শিখ হোস্টের কাছে পেয়েছিলাম বা তাঁর কোন জানাশোনা লোকের কাছ থেকে। ঠিকানায় পৌঁছে দেখা গেল যে এঁরা গোরখপুর থেকে এসেছেন, এখানে ডাল, আটা ও আমাদের দেশের বেসন, গুড়, ছাতু, মশলা ইত্যাদি, নানান রকম খাদ্যদ্রব্য তাঁর দোকানে রাখেন ও এসব দিয়ে এখানকার ভারতবাসীদের (এঁদের সংখ্যা ব্যাঙ্ককে কম নয়) একটি বিশেষ অভাব ভাল করে মেটাতে পারেন। আমাকে এঁর ক ভাই খুব ভাল করে রেখেছিলেন। আমি এঁদের নিজের হাতে রান্না পরটা, অড়হর ডাল, আলু-চচ্চড়ি খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেতাম। রাত্রে দোকানের ওপরে একটি ছোট ঘরে পাশাপাশি দড়ির খাটিয়াতে তিন-চারজন গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

তার পরদিন তাঁদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে ওখানকার অর্থদপ্তরের অফিসে গেলাম। সাইয়ামের রাজকুমার বিত্তা বছরখানেক আগে অমৃতসরে এসেছিলেন। তখন লাহোর, অমৃতসরে ডার্লিং প্রমুখ নামকরা সমবায় আন্দোলনের কর্মীরা ঐ কাজ পাঞ্জাবে আরম্ভ করেছেন আর খানিকটা সুফলও পেয়েছেন। আমাদের খালসা কলেজের প্রিন্সিপাল ওয়াদেন সাহেবের সঙ্গে মিঃ ডার্লিং-এর খুব ভাব ছিল —তাই ডার্লিং এখানে প্রায়ই আসতেন। তাঁরই উৎসাহে কলেজে সমবায় ডেয়ারী ও সমবায় স্টেশনারী দোকান খোলা হয়েছিল। আমি ইকনমিক্স পড়াই বলে আমাকে কলেজের সমবায় সমিতির সেক্রেটারি করা হয়েছিল। ডার্লিং আর আরেকজন ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মিঃ কলভার্টের খ্যাতি তখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং রাজকুমার বিত্তা যখন শ্যামদেশে সমবায় আন্দোলন চালু করবার উদ্দেশে ভারতে আসেন, ঐ বিষয়ের খোঁজখবর নিতে তখন তাঁকে অমৃতসরেও আসতে হয়েছিল। আমাদের কলেজেই ডার্লিং ও কলভার্ট সাহেবদের সঙ্গে তাঁর পাঞ্জাবে সমবায় সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়েছিল। আমাকেও ডার্লিং সেই সময় রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আর আমিও তখন সাইয়াম-এর মুদ্রাবিনিময় সংক্রান্ত নিয়মকানুন জানবার জন্য রাজকুমারের সাহায্য চাইলাম আর বিত্তাও তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন।

এখন আমি তাঁকে সেই কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা

করলাম। আমি তাঁদের দেশে এসে পৌঁছেছি দেখে তিনি খুব খুশী হলেন আর আমাকে মুদ্রাবিভাগে পাঠিয়ে দিলেন।

সাইয়ামে রাজকীয় দপ্তরে এক নতুন ব্যাপার দেখলাম। প্রত্যেক অফিসারের টেবিলের কাছে বড় বড় পিকদান রাখা আছে। আর চাপরাশী ঘন ঘন পান-সুপারির ট্রে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সুপারিগুলি কাঁচা, ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হয়। সব অফিসার, ক্লার্ক, নিজেরাই সুপারি কাটছেন আর পান সেজে খাচ্ছেন। সেই সঙ্গে চাও চলছে কাপের পর কাপ, সবুজ চা, চিনি-দুধের কোনও ল্যাটা নেই, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু কাপ খেয়ে নিলাম। মুদ্রাবিভাগ থেকে একখানি বই তখনই আমাকে দেওয়া হল আর তিন-চারদিন পরে আবার আমাকে আসতে বলা হল। আমার কাজ বেশ এগুচ্ছে দেখে আমিও খুশী হয়ে সেই ডাল আটার দোকানে ফিরলাম।

ব্যাঙ্ককের ইলেকট্রিক ট্রামগুলি ভালই, আর ওগুলিতে একটি বেশ মজার নিয়ম আছে। মহিলাদের জন্যে আলাদা সীট নেই। কিন্তু কোনও মহিলা যদি ট্রামে চড়েন সব পুরুষযাত্রীদেরই দাঁড়িয়ে পড়া প্রথা, মহিলাটি যাতে যেখানে ইচ্ছা বসতে পারেন। পুরুষযাত্রীরা তাই বসতেই চান না, কোনও মহিলা থাকুন না-থাকুন পুরুষরা ট্রামে দাঁড়িয়েই থাকেন। দেশের রাজা মহাবজ্রায়ুধ ফ্রান্স হয়ে এসেছেন, ফরাসী কৃষ্টি ও সাহিত্য ভাল করেই জানেন, তাঁরই আদেশে এই ব্যবস্থা চলছে।

এ দেশের বৌদ্ধমন্দির (vat বা বাট) সংখ্যায় অগণ্য, দেখতেও সুন্দর। কতকগুলি প্যাগোডার মত, চূড়া বেশ উঁচু, ধাপে ধাপে উঠেছে। ছাত চীনা-মাটির টালি দিয়ে ঢাকা, রঙবেরঙের টালির ওপর যখন রোদ্দুর পড়ে সব ঝকঝক করে ওঠে, বড় সুন্দর দেখায়। রাজধানীর মন্দিরের মধ্যে পান্নার বুদ্ধমূর্তির মন্দির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। শোনা গেল একটি বড় পান্না খোদাই করা এই মূর্তি, এটি যেন রাজ্যের ইষ্টদেব। মন্দিরের দরজাগুলিতে রূপোর কাজ করা রামায়ণের চিত্র। রাম ও রামায়ণের শ্যামদেশের ওপর খুব প্রভাব। রাজাদের সব রাম উপাধি, সে সময়ের রাজা মহাবজ্রায়ুধ হলেন পঞ্চম রাম। দেশের পুরনো রাজধানী ছিল আয়ুথিয়া (অযোধ্যা)। বর্মীরা আয়ুথিয়া ধ্বংস করলে ব্যাঙ্কক হল নতুন রাজধানী। মীনাম নদীর ওপর এই শহর, নদীতে সুগ্রীব, বালী নামের ছোট ছোট যুদ্ধজাহাজ রাজধানীর রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এই জাহাজগুলি দেখে ও তাদের নাম শুনে বড়ই ভাল লাগল। মনে দুঃখও হল যে আমাদের এত বড়

দেশ, তবুও আমরা পরাধীন, আমাদের তো নিজেদের নাম-করা যুদ্ধ-জাহাজ নেই। আমাদের দেশে রাজা তো অনেক আছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই ব্রিটিশ সরকারের গোলাম, নিজেদের রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করতে হয়। আর আমাদের সাধারণ লোকের রাজনৈতিক কোন কিছুতে যোগদান সরকারের দৃষ্টিতে বড়ই খারাপ কথা। "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে, পরদাসখতে সমুদয় দিলে"—কবির একথা ভাল করেই বোঝা যায় যখন দেশের বাইরে গিয়ে খুব ছোট স্বাধীন দেশও দেখা যায়।

এত ছোট শ্যামরাজ্য কি করে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো? দু-চার কথায় এর উত্তর দিচ্ছি। শ্যামের একদিকে বর্মা ও মালায়া ইংরেজের কুক্ষিগত হল, অন্যদিকে কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম ফ্রান্সের কবলে গেল, এ দুয়ের মাঝখানে শ্যাম ইংরেজ ও ফরাসীদের পরস্পরবিরোধী-ভাবের জন্যই টিকে রইল। ভয় ছিল কাম্বোডিয়া ও লাওস-এর পরেই ফ্রান্স শ্যামদেশে ঢুকে পড়বে। ব্রিটেনের এতে এত জোর আপত্তি ছিল যে ফ্রান্স আর এগুল না। ইংলণ্ডের এ রাজ্যটি গ্রাস করে বর্মার ও মালায়ার সঙ্গে এক করে খাসা একটি দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাখা তৈরী হতে পারতো, কেবল ফ্রান্সের হিংসের জ্বালায় হল না। শ্যামের থাই রাজারা বুদ্ধি খাটিয়ে দুটি ইয়োরোপীয় মহাশক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে নিজের দেশটি বাঁচিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এশিয়ার আধুনিক যুগের ইতিহাসে থাই রাজাদের এই কীর্তি ভুললে চলবে না।

এবার আমার এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আসবার ফলে আমার পড়াশুনার কাজ যে এক নতুন দিকে চললো সেই কথা বলি। তার আগে এখন এদেশে আমাদের দেশের লোক কেমন যান, আসেন ও থাকেন সে বিষয়ে কিছু বলা উচিত। আমার হোস্টের দোকানে অনেক ভারতবাসী আসতেন সন্ধ্যাবেলা নিজেদের কাজকর্ম সেরে। আমার জন্মস্থান বহরমপুরের একটি মুসলমান ভদ্রলোক আমার মামার বাড়ির পরিচয় পেয়ে খুব আহ্লাদের সঙ্গে আমার দাদামশাই ও মামাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, দেখলুম তাঁর ছেলেরা একেবারে শ্যামদেশীয় চেহারার, বুঝলাম ভদ্রলোক এই দেশে এখানকারই মেয়ে বিয়ে করেছেন। এখানকার নৌবিভাগে ইনি কাজ করেন। দেশের ওপর এখনও এঁর বিলক্ষণ টান আছে। আর একটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর এখানে তেজারতী কাজ চলছে। আমাকে একদিন তাঁর

বাসায় নিয়ে গিয়ে খেজুরগুড়ের পায়েস খাইয়েছিলেন। তবে দেখলাম যে অন্ততঃ ব্যাঙ্ককে গোরখপুর জেলার লোকই বেশী এসেছে। এখানে শিখ গুরুদোয়ারা আছে। আমাকে এখানে থাকতেও তখনকার শিখ ভদ্রলোকেরা (তাঁরা অনেকেই রেশম ব্যবসায়ী) অনুরোধ করেছিলেন। সনাতনীদের একটি বিষ্ণুমন্দিরও আছে।

আর একদিন একটি দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এলেন, সংস্কৃত খুব ভাল জানেন, বললেন যে এখানকার সরকারী বড় লাইব্রেরীতে তিনি কাজ করছেন, এখন একজন ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদের সঙ্গে কিছু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি প্রভৃতি নিয়ে দুজনে এই অঞ্চলের একটি পুরাকালের বৃত্তান্ত রচনা করবার প্রয়াস করছেন। তিনি আমার সঙ্গে সেই পুরাকালের অনেক কথা বললেন, সে সময়ে (১৫০০ বছর আগে) এই দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার কত হিন্দুরাজ্য ছিল, কি রকম সিংহবিক্রমে তাঁরা চীন সম্রাটদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। আর তাঁর বিশ্বাস তাঁরা নিশ্চয়ই তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হয়ে এরকম অলৌকিক শক্তি ধারণ করতে পেরেছিলেন, তবে দুঃখের বিষয় যে এইসব অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ভারতবাসীরা কিছুই জানে না। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি নিজে তাঁর দেশবাসীদের এই সাগরপারের মহাবীর হিন্দুরাজাদের গল্প শোনাবেন। আমার খুবই ভাল লেগেছিল তাঁর এসব কথা। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম যে সেই ফরাসী পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা যেন তিনি করিয়ে দেন। তিনি তার পরের দিনই সেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন বললেন। আমার তো অনেক আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে এদিককার যোগাযোগ (বিশেষ করে পুরাকালের) জানবার খুব ইচ্ছা ছিল। ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলাম।

সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে রাজার বজ্রানন লাইব্রেরীতে দুজনে উপস্থিত হলাম। আমার কার্ড পাঠিয়ে অধ্যাপক জর্জ কীডিস্-এর সঙ্গে দেখা করলাম। সৌম্য-দর্শন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে ভারতবর্ষের প্রভাব এই অঞ্চলের উপর খুব ফলপ্রদ হয়েছিল ও এখনও এর অনেকটা থেকে গেছে। এইসব দেশে—শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম (ভিয়েৎনাম) প্রভৃতি রাজ্যে—৬০০-৭০০ বছর আগেও প্রবলপ্রতাপ শৈব, বৈষ্ণব, মহাযান বৌদ্ধ সম্রাটেরা বিশাল সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করতেন। মাঝে মাঝে শ্যাম, লাও (লব ?), উত্তর মালায়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম (চম্পা)—এইসব দেশগুলি এক বৃহৎ

কম্বুজ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন সপ্তম জয়বর্মণের মত কম্বুজাধিপতিরা বলতে পারতেন যে পশ্চিম সাগর (বঙ্গোপসাগর) থেকে পূর্ব সমুদ্র (প্রশান্ত মহাসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁদের শাসনাধীন ছিল।

আর কেবল বড় বড় রাজ্যের কথা নয়, এই সম্রাটদের স্থাপিত মন্দির [আঙ্কোর, বাইয়ন (বৈজয়ন্ত?) প্রভৃতি] আজও জগতে অতুলনীয়। আঙ্কোর বাট আসলে বিষ্ণুমন্দির—অত বড়, অত সুন্দর মন্দির জগতে নেই। কম্বুজ নৃপতিদেরই নামধারী দেবমূর্তি (এখানকার রাজারাণীরা পরলোকে যাবার পর কোন না কোন দেবলোকে যেতেন বলে, সেই সেই দেবদেবীর নামে মৃত্যুর পরে পরিচিত হতেন) গুপ্ত, পাল, পল্লভ ভাস্কর্যের রীতি অনুযায়ী পরিকল্পিত, এই অঞ্চলের সর্বত্র পাওয়া যায়। কম্বুজ সম্রাটদের কীর্তিকলাপ শত শত শিলালিপিতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। ৬০০-৭০০ বৎসরের ইতিহাস এইসব লিপি থেকে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও এরকম শিলালিপির অবিচ্ছিন্ন অনুবর্তন দেখা যায় না। আর ফরাসী ও ডাচ্ পুরাতত্ত্ববিদের এইসব লিপির অনেকগুলিরই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন।

অধ্যাপক কীডিস্ দুঃখপ্রকাশ করলেন যে ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের জানা নেই। এই যুগটি এই অঞ্চলের (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়) ভারতের ধর্মের ও সংস্কৃতির অব্যাহত প্রভাবের যুগ ছিল। আর একটি বিশেষ করে লক্ষ্যের বিষয় হল যে এই প্রভাব ভারতের কোনও সামরিক জয়যাত্রার ফল নয়, ভারতের ধর্মের (শিব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধধর্মের) ও কৃষ্টির (সাহিত্য, স্থাপত্য শিল্পকলার) প্রচার করতে যাঁরা পর্বত লঙ্ঘন করেছিলেন, সুদূর সমুদ্রপারের দেশে অনেক কষ্ট ভোগ করে পৌঁছেছিলেন, এ গভীর প্রভাব তাঁদেরই অধ্যবসায়ের ফল। যুদ্ধে রক্তপাত করে এ সম্ভব হয়নি, শান্তির আবহাওয়াতেই এই ধার্মিক ও জ্ঞানীদের শান্তিময় অভিযান সফল হয়েছিল। তারপর পাঁচ-ছশো বছর হয়ে গেল, বাইরের শত্রুর আক্রমণ, নানা দেশের নানারূপের ঘাতপ্রতিঘাত এখনও ঐ ভারতীয় প্রভাব উন্মূলিত করতে পারেনি।

অধ্যাপক কীডিস্-এর কথা আমি তো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি এ বিষয়ে কাজ করতে চাই, কি করে এ কাজ আরম্ভ করব? তিনি বললেন যে প্রথমে আমাকে ফরাসী পড়তে শিখতে হবে আর একটু ডাচ্ও শিখতে হবে, তারপর অনেক ফরাসী ও ডাচ মালমশলা এ বিষয়ের ওপর পাব। বিশেষতঃ সংস্কৃত শিলালিপির যে পাঠোদ্ধার হয়েছে বার্থ ও বের্গে

প্রভৃতি ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের পুস্তকে সেগুলি পড়তে হবে। আমি ভারতবাসী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রভাবের অনেক তথ্য বের করতে পারব যা বিদেশীরা বুঝতে পারেনি। ভারতের অনুসন্ধিৎসুদেরই এই কাজ করা উচিত।

তাঁর একটি ফরাসী মহিলা সহকর্মী এসে পড়লেন, তাঁর ও আমার পরিচিত দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতের সঙ্গে তখন কীডিস্ তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ করলেন। আমিও বিদায় নিলাম। তখন থেকেই মনস্থির করলাম যে মুদ্রা বিনিময় কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ভারতের বাইরে ভারতের কৃষ্টির জয়যাত্রার সম্বন্ধে উপকরণ সন্ধান করব।

এবারকার দেশভ্রমণ প্রায় শেষ হল। একদিন আমার দোকানদার বন্ধু আমাকে এক উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধশ্রমণের কাছে নিয়ে গিছলেন। তাঁকে দেখে আমার খুব ভক্তি হয়েছিল, মুখ দেখলেই মনে হয় যেন যথার্থ শান্তি পেয়েছেন। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশটি। আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, ব্যবসায়ী নয় বিদ্যার্থী একথা আমার বন্ধুর মুখে শুনে খুশী হলেন। তাঁকে বললাম এদেশের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ শুনতে চাই। এর উত্তরে তিনি বললেন যে ভারতের সম্রাট অশোক সোনক ও উত্তর নামের দুটি বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠিয়েছিলেন 'সুবর্ণভূমিতে'—শ্যাম দেশও ঐ সুবর্ণভূমির অন্তর্গত। এখানে রাজা, প্রজা সকলেরই এক ধর্ম—থেরাবাদ বৌদ্ধধর্ম। সকলকেই—সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজকুমার থেকে গাঁয়ের চাষী পর্যন্ত সাংসারিক বা গার্হস্থ্য জীবনে ঢোকবার আগে কিছুদিন বৌদ্ধমঠে ভিক্ষুর জীবন পালন করতে হয়। আরও বললেন যে ধর্ম নিয়ে এদেশে কোনও বিক্ষোভ নেই—আর হবার কোনও ভয়ও নেই।, তাঁর কথাগুলি আমার বড় ভাল লেগেছিল।

রাজকুমার বিদ্যার কাছে বিদায় নিতে গিছলাম। তিনি শ্যামের মুদ্রা 'টিকল' সম্বন্ধে আরও কাগজপত্র দিলেন। তাঁর নির্দেশানুসারে ব্যাঙ্ককের ফরাসী কনসালের কাছেও গিছলাম ইন্দোচীনের মুদ্রাবিনিময় সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতে। কনসালের দেখা পেয়েছিলাম আর তাঁর কাছ থেকে ফরাসী ইন্দোচীনের টাকাকড়ির বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্টও পেয়েছিলাম।

চলে যাবার আগের দিন ব্যাঙ্ককের বিষ্ণুমন্দিরে ওখানকার প্রবাসী হিন্দু, শিখ ও দু-একজন মুসলমানও আমাকে বিদায় দিলেন। আমি তাঁদের স্কুলের জন্যে কিছু বই কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিলাম।

কাজ কতদূর হয়েছিল বলতে পারি না—কিন্তু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। একটি স্বাধীন বৌদ্ধ রাজ্য দেখলাম, আর দেখে মন প্রফুল্ল হল। রাজদর্শন হয়নি, রাজা তখন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উত্তরদিকের পাহাড়ী অঞ্চলে গেছেন, রাজার শ্বেত হস্তীও তখন সেখানে গেছেন, তাঁরও গরম সয় না। রাজা মহাবজ্রায়ুধ অবিবাহিত, নাটক লেখেন, তার অভিনয়ও করান, বড় বেশী মেলামেশা করেন না। শুনলাম এই কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর ওপর তত সন্তুষ্ট নন। তবে রাষ্ট্রবিপ্লবের তখন দেরী আছে আরও বারো বছর।

ফেরবার পথে পিনাং-এ দুদিন থাকতে হল জাহাজের অপেক্ষায়। সেই গুজরাটি অলঙ্কার-ব্যবসায়ী যাঁর দোকানে কলকাতা থেকে আসবার সময় ঘড়ি মিলিয়েছিলাম, এবার তিনিই আমার 'হোস্ট', আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়। দোকানের ওপর তাঁর ফ্ল্যাট বড় সুন্দর, দুদিন আমাকে সযত্নে রেখেছিলেন। পিনাং-এর প্রসিদ্ধ 'সাপের মন্দির' দেখালেন, সমুদ্রতীরের 'রামপাস্‌টান' (আমাদের লিচুর মত ফল—ফলের গায়ে লম্বা রোঁয়া) বাগান ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন, আর দেশের খবর শোনালেন। সাপের মন্দিরটি অদ্ভুত জায়গা—কত রকমের কত রঙের সাপ খোলা উঠানে ঘুরছে, তাদের দেখে কেউ ভয় পাচ্ছে না, তারাও কাউকে কামড়াতে যাচ্ছে না। মন্দিরটির মেঝে মার্বেলের, খুব পরিষ্কার সবুজ, হলদে, লাল সাপ কিলবিল করছে। ছোট ছোট কচ্ছপও অগুনতি। নতুন ধরনের সবই, তবে এখান থেকে বেরিয়ে এলেই মনটা আশ্বস্ত হয়।

পিনাং-এর সমুদ্রতীর, বাগান বড়ই সুন্দর, ওরকম সুন্দর জায়গা (ওখানে আবার গিছলাম ৩৫ বছর পরে) কমই দেখেছি। যা হোক, কলিকাতাগামী জাহাজ এল, বড় জাহাজ, ডেকে হালওয়াইয়ের দোকান, সুতরাং জাহাজের খাবার এবার খেতে হল না। পুরি কাচৌরী, বর্ফি ইত্যাদি ভালই পাওয়া গেল। নির্বিঘ্নে কলকাতা পৌছুলাম। ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল। কয়েকদিন পরেই অমৃতসরে ফিরতে হল।

খাল্‌সা কলেজে আন্দোলন ও বিদেশ যাত্রা

সেখানে তখন আর নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করবার জো নেই। আকালি আন্দোলন পুরোদমে চলছে। খালসা কলেজটিকে স্বদেশীকবণ কববার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলছিল। আবার প্রিন্স অব ওয়েলস তখন ভারতবর্ষে আসছিলেন, তাঁর খালসা কলেজেও আসবার কথা ছিল। এতেও আকালিদের বিশেষ আপত্তি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বেসরকারী করবার আন্দোলন তখনও দেশ জুড়ে চলছিল, আর প্রিন্স অব ওয়েলস (যিনি অষ্টম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন) যেখানে যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে সেখানে 'হরতাল' হচ্ছিল। দেশের এই পরিস্থিতিতে খালসা কলেজের স্টাফ খালসা কলেজকে জাতীয় কলেজ করা ও প্রিন্স অব ওয়েলসএর কলেজে না আসার এই দুই মতেরই পক্ষে ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রফেসারদের ওপর খুব চটে ছিলেন। তাঁদের তরফ থেকে হুকুমজারী হল যে স্টাফ এসব বিষয়ে একেবারেই না হস্তক্ষেপ করে।

আমরা শিখ রাজাদের অনুরোধ করলাম যে তাঁদেরই দেওয়া টাকায় যখন এ কলেজ গড়ে উঠেছে, তারাই যেন এ সঙ্কটে কলেজটি বাঁচান। খানিকটা পরিবর্তন হল। শিখ সম্প্রদায়ের নরমপন্থীরা কলেজের ভার নিলেন, আকালিদের (গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক পার্টিকে) এদিকে ঘেঁষতে দেওয়া হ'ল না। এই নরম-পন্থীদের বলা হ'ত চীফ খাল্‌সা দেওয়ান পার্টি। আকালীরা এঁদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন, তাঁদের মতে চীফ খালসা দেওয়ান একেবারে ব্রিটিশ সরকারের ধামাধরা, আর এই পরিবর্তনের ফলে ব্রিটিশ সরকারেরই জয় হ'ল।

কলেজের প্রফেসারদের সমস্যা সেই রইল। কলেজের নতুন কর্তারা সেই পুরোনো আদেশই বহাল রাখলেন, আর শিক্ষকেরাও তাঁদের আগেকার মত বদলালেন না। এ দু'য়ের মাঝে সংঘর্ষটি এড়ানো গেল না। আমাদের প্রিন্সিপাল মিঃ ওয়াদেনএর সহানুভূতি আমাদের সঙ্গে ছিল, তিনি অন্য জায়গায় বদলী হলেন, বা তাঁকে বদলী করানো হ'ল। চীফ খালসা দেওয়ান পার্টির কলেজ ম্যানেজিং কমিটি আমাকে স্টাফ থেকে বরখাস্ত করলেন আর শিখ প্রফেসারদের কোনও রকম আন্দোলন করতে কড়া নিষেধ করলেন। বারোজন শিখ প্রফেসার

তৎক্ষণাৎ তাঁদের পদত্যাগের কথা কমিটিকে জানিয়ে দিলেন। সুতরাং আমি আর বারোজন শিখ প্রফেসার একই দিনে খালসা কলেজ থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাকে তো আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পুরো দেওয়া হ'ল, অন্য বারোজন ঐ ফাণ্ডের কেবল নিজের দেওয়া টাকা পেলেন, কলেজ যে টাকা সাধারণতঃ তাঁদের ঐ অ্যাকাউণ্টে দিত তা আর দিল না। এঁদের প্রত্যেকের দু হাজার বা আরও বেশী লোকসান হ'ল। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম যে তখুনি তখুনি পদত্যাগ না করে এক মাসের নোটিশ দিয়ে কাজ ছাড়ুন। সে কথা কেউ শুনলেন না, তাঁরা বললেন যে ওরকম করলে আমার প্রতি অবিচার করা হয়।

আমি তাঁদের হয়ে লড়েছি, তাঁরা আমাকে এ লড়ায়ে ওরকম করে ছেড়ে যেতে পারেন না। আমার পুরাতন প্রফেসার সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মশাই সেই সময় আমাকে বলেছিলেন যে তোমার জন্যে তোমার শিখ বন্ধুরা যা করেছে অন্য জায়গায় এরকম কেউ করতো না। তিনি ঠিকই বলেছিলেন—গেরস্ত ঘরের লোকের প্রত্যেকের হাজার দুয়েক টাকার লোকসান বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার—অনেকেই এরকম করাতে পারবে না। অনেকদিন পরে আমার বারোজন সহকর্মীদের এই স্বার্থত্যাগের উল্লেখ করে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেছিলেন যে এটা ছিল খালসা কলেজের হিরোয়িক যুগ। শিখসম্প্রদায়ে তো এতগুলি লোকের একসঙ্গে কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। অধ্যাপক গুরমুখ নেহাল সিং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে অমৃতসরে একটি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করলেন। বছর ত্রিশেক পরে ইনি রাজস্থানের গভর্ণর হয়েছিলেন। আমাকেও সেই সভায় কিছু বলতে হয়েছিল। মস্ত হলভরা শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই আগ্নেয় পরিস্থিতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু গরম গরম বলে ফেলেছিলাম। দিন কতক আগেই বাবা আমার ইয়োরোপ যাবার জন্যে পাসপোর্ট যোগাড় করেছিলেন, খবরের কাগজে আমার ঐ কথাগুলির রিপোর্ট পড়ে বাবা বিরক্ত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন যে পাসপোর্ট হয়ত ভেস্তে যাবে। যাহোক ব্যাপারটা আর অতদূর গড়ায়নি।

সে সময়টাতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য খালসা কলেজের এই তেরোজন বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলাম। প্রায় রোজই খবরের কাগজে আমাদের বিষয়ে কিছু না কিছু থাকতো—পরে দেখা যাবে বিলেত পর্যন্ত আমাদের কথা উঠেছিল।

এই গোলমালের মধ্যে আমার থিসিস শেষ করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল আর ওটি ফিরেও এসেছিল। রিপোর্টে ছিল যে আরও

বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে আবার যেন থিসিসটি পাঠাই। এদিক দিয়ে আমার বিলেত যাওয়াতে সুবিধা হয়েছিল। ওখানে আরও নতুন উপকরণ পাব—আরও ভাল করে লিখতে পারব। আর পরীক্ষকরা দুজনেই ইংল্যাণ্ডের। হয়তো তাঁরা আরও মালমশলা সংগ্রহ বিষয়ে কিছু নির্দেশ দেবেন।

আগেই বলেছি যে আমাদের দেশে স্বর্ণ বিনিময় মান বা গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যাণ্ডার্ড বস্তুটি একেবারেই অপাংক্তেয়। ১৯২৪ সালের গোড়ায় বোম্বাইয়ে ইকনমিক্স কনফারেন্সে আমি এইরকম মুদ্রাবিনিময় পদ্ধতির ওপর একটি বক্তৃতা পড়েছিলাম। একটি ইংরেজ অধ্যাপক ছাড়া কেউই আমার মতামত মানেননি। এই ইংরেজ অধ্যাপকটি কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ইকনমিক্সের মিণ্টো অধ্যাপক। বোম্বাইয়ের নামী অর্থবিদেরা তো আমাকে স্বদেশবিদ্রোহী বলে ঠাউরে ছিলেন।

বিদেশ যাবার আগে মাস দুয়েক ধরমশালায় সবাইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। বাবা সেখানে ছিলেন আর আমার স্ত্রী ; বড় ছেলেটি ও দুটি খুব ছোট মেয়ে। সে দুটি মাস বেশ কেটেছিল। একদিন ওপরকার 'এলাকায়' বরফও দেখে এসেছিলাম। তারপর একদিন ভোরবেলা লাহোর চলে গেলাম, সেখান থেকে করাচী মেলে করাচী গিয়ে ওখান থেকে জাহাজ ধরতে হবে। লাহোর রেলস্টেশনে বাবা, সেজদা, (স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের তো ধরমশালায় দেখে এসেছি) আর কয়েকটি বন্ধু আমাকে লাহোর-করাচী কম্পার্টমেণ্টে চড়িয়ে বিদায় দিলেন। তারপর পশ্চিম পঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে সিন্ধুপ্রদেশের দিকে দীর্ঘযাত্রা শুরু হল। দিনের বেলাটা মন্দ কাটলো না, রাত্রে গাড়ি যখন মরুভূমি পার হ'ল আমারও তখন জ্বর এল। বোধহয় খানিকটা হীট-স্ট্রোকের মত হয়েছিল। বাথরুমে জলের ঘড়া ছিল কিন্তু জল দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। সকালবেলা সিন্ধুনদ ও পঞ্চনদের সঙ্গম দেখে মনটা অনেকটা ভাল হ'ল। করাচী স্টেশনে লাহোরের ট্রিবিউনের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর সুধীর মুখুজ্যে মহাশয়ের একটি বন্ধু আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী অনেকরকম রান্না করেছিলেন আমার জন্যে, আমার কিন্তু খেতে বসতে বসতেই আবার জ্বর এল। করাচীর কিছুই দেখা হল না। পরের দিন সকালে আমার 'হোস্ট' আমার সঙ্গে মাস্রা হারবারে গেলেন। তাঁর ভয় ছিল ডাক্তার যদি পরীক্ষার সময় আমার জ্বর দেখে জাহাজে ওঠবার অনুমতি না দেন তাহলে আমাকে আবার তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। যাহোক একটি বুড়ো ইউরেশিয়ান ভদ্রলোককে নিয়ে (তাঁর শরীর খুব খারাপ ছিল)

ডাক্তার এত ব্যস্ত ছিলেন যে আমাকে আর ভাল করে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলেন না। তখন আমার 'হোস্ট' ফিরে গেলেন।

জাহাজ ছাড়বার খানিকক্ষণ আগে ডেক থেকে দেখলাম যে অমৃতসরের কয়েকজন শিখ ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আর আমাকে যেন ডাকছেন। তখনও কিছু সময় ছিল, জাহাজের একটি অফিসারকে বলে জেটিতে নেবে তাঁদের সঙ্গে কথা কইলাম। দু'একজনকে তাঁদের মধ্যে চিনতাম। তাঁরা বললেন যে আপনি তো অনেকদিনের জন্যে দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন, খালসা কলেজ যাতে ঝগড়া-ঝাঁটিতে একেবারে নষ্ট না হয়ে যায় সেই উদ্দেশে কিছু ঘরোয়া বিবাদ মেটাবার কথা বলে যান। আমারও তাঁদের কথা শুনে মনে হ'ল যে কেন এরকম অশান্তিতে একটি ভাল কলেজ উচ্ছন্ন যাবে। তাই আমি এই শিখ ভদ্রলোকদের বললাম যে বাদবিবাদ যথেষ্ট হয়েছে—কলেজটিকে বাঁচাতে হবে। লণ্ডনে পৌঁছে আমার শিখ বন্ধুরা, যাঁরা আমার সঙ্গে কলেজ ছেড়ে ছিলেন, খুব রাগ করে আমায় চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের মতে আমার ওরকম কথা বলা অন্যায় হয়েছিল—আমি তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেলাম—যারা সেখানে রয়ে গেল তাদের "parting kick" দিয়ে গেলাম। মনে নেই এর জবাব কি দিয়েছিলাম।

সমুদ্রের হাওয়ায় আমি তো বেশ সুস্থ হয়ে উঠলাম, কিন্তু সেই বুড়ো ইউরেশিয়ান ভদ্রলোকটি আরব সাগর পার হ'তে না হ'তেই মারা গেলেন। একদিন সকালে জাহাজের সবাইকে ডাকা হল সমুদ্র-সমাধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে। মৃতদেহটি ইউনিয়ন জ্যাকে ঢাকা, ডেকএর খানিকটা রেলিং সরিয়ে, একটা তক্তার উপর রাখা হল। জাহাজের ক্যাপ্টেন বাইবেল থেকে কিছু পড়লেন, আমরা সবাই স্যালুট করলাম, তক্তাটা নীচের দিকে কাত করা হ'ল—দেহটি সমুদ্রে পড়লো। দু-একটি ডলফিন (purpoise ?) জলে পড়ার শব্দে জলের ওপর দেখা দিল। সমুদ্র-সমাধি হয়ে গেল।

বেশ গরম। তারপর সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় ও আর গরম লাগলো। জাহাজের ক্যাবিনে আমরা তিনজন ছিলাম—আমি, একটি সিন্ধী ছাত্র, আর একটি পঞ্জাবী মুসলমান যুবক। পাশের ক্যাবিনে দুজন ডাক্তার ছিলেন, তাঁরা উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করবার আশায় বিলেত যাচ্ছিলেন—একজন ক্ষত্রী পঞ্জাবের আর একজন লাহোরের সরকারী হাসপাতালের মুসলমান অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন। শেষোক্তটি বড়ই আমুদে ভদ্রলোক, খুব গল্পগুজব করে

আসর জমিয়ে রাখতে পারতেন। আমরা পাঁচজনে বেশ হাসিখুশীতে দিনগুলি কাটিয়েছিলাম।

এডেনে জাহাজ থামেনি, **Al kantara**তে থামলো। মরুভূমির মধ্যে ফুলবাগানের শোভার জন্য এ জায়গাটি বড় ভাল লেগেছিল। খালটি তো বেশি চওড়া নয়। ওদিক থেকে জাহাজ আসবার সময় তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে মাঝেমাঝে কিছু অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা আছে, সেখানে এদিকের জাহাজদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমাদের বাঁদিকে Egypt-এর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে রেলগাড়ি রাত্রিবেলা যখন যায় সে একটা মনে রাখবার মত দৃশ্য হয়।

পোর্ট সৈয়দে আমরা করাচী ছাড়বার পর প্রথমবার ডাঙায় নাবলাম। বেশীর ভাগ দোকানেই ফরাসী ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড, ফরাসীরা কবে ঈজিপ্‌ট্‌ ছেড়েছে তবুও এখন ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাব বেশ রয়েছে। বাজারে খুব আঙ্গুর পাওয়া গেল—বেশ বড় বড় গোছা কিনে জাহাজে ফেরা গেল। বন্দরের মিশরী পুলিসের ব্যবহার মোটেই ভাল বোধ হল না। যাত্রীদের উপর যা ব্যবহার করছিল তাতে মিশরের সুনাম হয় না।

লেসেপ্সের বিরাট স্ট্যাচু দেখা গেল ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার সন্ধিস্থলে। তারপরই আমরা ভূমধ্যসাগরে ঢুকলাম। লোহিতসাগর ও সুয়েজ-খালের গরম আর নেই। সমুদ্রের জল এখন নীল আর সমুদ্রের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। তার পরদিন গ্রীসের উপকূলের দ্বীপগুলি দূর থেকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

গ্রীস ও সিসিলির মধ্যে মেসিনা প্রণালী উল্লেখযোগ্য জায়গা। এইখানেই গ্রীক পুরনো কাহিনীর **Scylla and Charybdis** ছিল, সেকালের নাবিকরা এর এক জায়গায় জাহাজ বাঁচিয়ে নিলে অন্য জায়গাটাতে আর জাহাজডুবি থেকে নিষ্কৃতি পেত না। এই প্রণালীর দু'দিকের দৃশ্যও সুন্দর। তবে মেসিনার বাড়িগুলি ভূমিকম্পে সম্প্রতি ভেঙে গিছলো, তখনও সেই ভাঙা অবস্থাতেই ছিল। তবে এই ধ্বংসের চারিপাশের সবুজ ঘাস ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়গুলি গ্রীক ও ল্যাটিন কবি বর্ণিত **bucolic scenes** (প্রাচীন গ্রীসের গোষ্ঠলীলা) এর পটভূমি মনে করিয়ে দেয়। এবার মার্সেই বন্দরের কাছে আমাদের জাহাজ পৌছুল।

কিছুক্ষণ পরে ডুমার প্রসিদ্ধ উপন্যাস কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রীস্টোর প্রথম

পর্বের সেই কুখ্যাত জেলখানা Chateau d 'if দেখা গেল। এখান থেকে অনেক বছরের বন্দী দান্তে অভাবনীয় উপায়ে পালিয়ে মণ্টেক্রীস্টো দ্বীপে পৌঁছে কিছু-দিনের মধ্যেই কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রীস্টো নামে সংসারে পুনঃপ্রবেশ করে।

ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আমরা ইউরোপের মাটিতে পদার্পণ করলুম। প্রথম যেটা চোখে লাগলো সেটি হ'ল আমাদের দেশের গরুর গাড়ির মত মালবোঝাই গাড়ি টানবার বিশালকায় ঘোড়া। এই জাতের ঘোড়া আকারে যত বৃহৎ তেমনি মোটাসোটা লোমওয়ালা পা—ওয়েলর ঘোড়ার মত দেখতে সুশ্রী একেবারে নয়।

আমাদের তখন ফ্রেঞ্চ পড়া কতদূর এগিয়েছিল তা বোঝা গেল যখন তিন-চার জায়গায় লেখা 'defence-de fumer'এর মানে কি তার কতরকম ব্যাখ্যা করা হ'ল, তার পরে বোঝা গেল যে সবগুলিই ভুল হয়েছে। ঐ কথাটির মানে ওখানে ধূমপান নিষেধ। খানিকটা মার্সেই-এর রাস্তাঘাটে বেড়ানো হ'ল। ফরাসী মহিলাদের একটি ফ্যাশন চোখে পড়লো—কালো ওভারকোটের buttom holeএ বড় লাল (কৃত্রিম) ফুল। প্যারিসেও এই প্রথা দেখা গেল কিন্তু লণ্ডনে দেখা যায়নি।

সন্ধ্যাবেলা প্যারিস থ্রু ট্রেনে আমরা চারজন (আমি, দুটি ডাক্তার ও সিন্ধী ছাত্রটি) প্যারিস (পারী) যাত্রা করলাম। Wagonlit-এর (শোবার গাড়ির) টিকিট তো ছিল না—এক-একটি বেঞ্চে দুজন করে অর্ধশায়িত অবস্থায় রাত কাটানো গেল।

ভোরবেলা Paris—The Grand Monarch, Danton, Robespierre নেপোলিয়নের প্যারিস পৌঁছুলাম। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে তো স্টেশনের (Garde da hyonsএ) buffetতে Fernch breakfast—শোকোলা (chocolat) ও croissant (শিং-এর আকারের ছোট পাঁউরুটি)—খাওয়া গেল। তারপর ট্যাক্সি করে (প্যারিসের ট্যাক্সি বড় জোরে যায়) লুভর (পুরনো রাজবাড়ি—এখন জগতের সবচেয়ে সুন্দর আর্ট মিউজিয়ম) ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ঘুরে (ভাল করে দেখতে অনেকদিন লাগে) স্টেশনে ফিরে এসে জিরিয়ে Gare de Nord (প্যারিসের আর একটি বড় স্টেশন) গেলাম আর বিকেলবেলা ক্যালে যাবার থ্রু ট্রেন ধরা গেল। সন্ধ্যাবেলা ক্যানেল ক্রস করে ডোভার পৌঁছে লণ্ডনের গাড়িতে ওঠা গেল রাত সাড়ে-নটা আন্দাজ। লণ্ডন পৌঁছে আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল।

দু-এক জায়গা (আমাদের ডাক্তারদের নির্দেশমত) ঢুঁ মেরে রাত এগারটা আন্দাজ ১১২ গাউয়ার স্ট্রীটে সবাই পৌঁছুলাম। সে রাতের মত পাশাপাশি দু-একটা বোর্ডিং হাউসে আশ্রয় নিয়ে তার পরের দিন গাউয়ার স্ট্রীটে সকালে চলে এলাম। এটি হ'ল ওয়াই. এম. সি. এ'র ভারতীয় ছাত্রদের লণ্ডনে এসে অন্ততঃ দিন কতকের জন্য আশ্রয়স্থল। থাকবার ও ভারতীয় স্টাইলে খাবারদাবারেরও ব্যবস্থা আছে। কেউ কেউ এইখানেই থেকে যান, বিলেতের কাজকর্ম সেরে বছর দুয়েক পরে এইখান থেকেই দেশে ফিরে যান।

বোধহয় তার পরদিনই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রেজিস্টারের কাছে একটি পুরো বছরের ফী জমা দিলাম। তাঁর কাছে শুনলাম যে আমার টিউটর হবেন Prof Dodwell আর আমাকে School of Oriental & African Studiesএ ভর্তি হতে হবে। কালবিলম্ব না করে Prof. Dodwellএর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর কথা শুনে দমে যেতে হ'ল। তিনি সাফ্ জবাব দিলেন যে আমার প্রস্তাবিত বিষয়টি—Indian Cultural Influence in Cambodia & Gara—এখানে অচল।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ইংলণ্ডে আর কোথাও এ বিষয়ে কেউ আমাকে গাইড করতে পারবেন না। আমি যদি ঐ বিষয় ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ ভারতের Early Dutch Records-এর উপর কাজ করি—তাহলে উনি নিজে আমাকে guide করবেন আর কাজটাও সহজ হবে। আমি তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করলাম যে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাকে অনুমতি দিন দেখে নিতে আমার বিষয়টির উপর কাজ করতে পারি কিনা। প্যারিসে আমার একজন বন্ধু আছেন সেখানে Prof. Sylvain Leviর সঙ্গে কাজ করছেন—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এ বন্ধুটি হলো শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের এক বড় সাহেব। বছর নয়েক আগে আমরা একসঙ্গে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের All India Competitive Examinationএর পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তাতে উনি প্রথম স্থান পেয়ে ঐ ডিপার্টমেণ্টে ঢোকেন। তখন থেকেই পরিচয় ও পত্র বিনিময় চলেছিল। বিলেতে আসবার আগেই প্যারিস থেকে তাঁর চিঠি পেয়েছিলাম।

এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখে Prof. Dodwell আমাকে প্যারিস যাবার অনুমতি দিলেন। আমিও আর বেশী দেরী না করে সুবোধবাবুর 17 Rue de Sommerard, Paris 17, Arrond ঠিকানায় তাঁর কাছে পৌঁছুলাম। সুবোধ

মুখুজ্যে তো খুব খুশী হলেন, আর সেই ১৭নং বাড়িতেই ছিলেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী. তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রবোধ বাগ্‌চী তখন Prof. Sylvain Levir কাছে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে রিসার্চ করছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই ইনি ভারতের শ্রেষ্ঠ Sinologist (চীন ভাষাবিদ্) বলে গণ্য হয়েছিলেন।

Prof. Levir এই প্রিয় ছাত্রটিই আমার সমস্যা পূরণ করলেন। প্রবোধবাবু খবর দিলেন যে Prof. Coedes এখন প্যারিসেই আছেন আর অন্ততঃ তু-তিন মাস এইখানেই থাকবেন। সুতরাং আমার নিজের বেছে নেওয়া বিষয় নিয়ে কাজ আরম্ভ করা ভাল করেই সম্ভব হতে পারে। সুবোধ ও প্রবোধবাবুরা তুঃখ করলেন যে আমি পুরো বছরেরই fee লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়ে এসেছি, তা নইলে আমি প্যারিসেই পড়তে পারতাম। আমার মনে হ'ল যে আমি ভুল করিনি, ফ্রান্সে ভর্তি হ'লে ফরাসী ভাষায় thesis লিখতে হ'ত, খুব ভাল রকম করেই ঐ ভাষা শিখতে হ'ত। লণ্ডনের ছাত্র হয়ে ইংরাজিতেই লিখতে পারবো, ফরাসী ভাষা পড়তে পারলেই চলবে, ঐ ভাষাতে লিখতে তো হবে না। নতুন একটি ভাষা পড়তে পারা সেই ভাষাতে লেখার চেয়ে অনেক সহজ। তাহ'লে আমার প্রোগ্রাম হ'ল প্যারিসে তাড়াতাড়ি ফরাসী ভাষায় লেখা বই পড়তে শেখা, Prof. Coedes প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের কাছে আমার বিষয়ের বইয়ের সন্ধান নেওয়া, আর লণ্ডনে Prof Dodwell-এর তত্ত্বাবধানে থিসিস লেখা। আমাকে তুই জায়গাতেই—প্যারিস-লণ্ডনে কাজ করতে হবে, আর তার জন্যে আমার কোন তুঃখ নেই।

বাগ্‌চী আমার ফরাসী ভাষা পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি প্রৌঢ়া গরীব রাশিয়ান মহিলা সেকালের থিয়োসফিস্ট, ভারতেও বছর পঁচিশ আগে কিছুদিন ছিলেন, আমাকে তাঁরই লেখা ফরাসী ভাষায় বুদ্ধচরিত পড়াতে আরম্ভ করলেন। বইটিতে যথেষ্ট ভুল ছিল ইতিহাসের দিক থেকে—তাহলেও সহজ ছিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসী কবিতা (স্কুলপাঠ্য বই থেকে) পড়তে পারলাম। ফ্রেঞ্চ বই পড়তে আমার খুবই ভাল লাগতো। একটু আধটু সংস্কৃত পড়াও (বহুদিন যা এক প্রকার বন্ধই ছিল) আরম্ভ করা গেল। আগের বছরেই (১৯২৩) শ্যামদেশে অধ্যাপক কৌডিস্ বলেছিলেন যে কম্বুজে ছয় সাত শো বছর ধরে অনেক সংস্কৃত ভাষায় লেখা শিলালিপি কম্বুজ নৃপতিরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রেখে গেছেন। আর এই শিলালিপিগুলিই হ'ল আমার কাজের জন্য সবচেয়ে দরকারি মালমশলা (primary source)। আমিও প্যারিসে আসবার

আগেই Probsthein-এর দোকানে (ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ঠিক সামনে) চল্লিশ বছর আগে ছাপানো Barth & Bergaineএর Inscriptions Sansrites du Cambodge et Champa পেয়ে গিছলাম। পড়তেও চেষ্টা করছিলাম যদিও তখন আমার পক্ষে ও বই প্রায় দুর্বোধ্য ছিল। প্যারিসে এসে কীডিস্ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে বুঝলাম যে Barth & Bergaigneএর বইয়ের পর আরও অনেক শিলালিপি খুঁজে পাওয়া গেছে—আর তার অনেকগুলিই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে Bulletin de Ecole Francaise d' Extreme Orient নামক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ের পত্রিকাতে। এই বুলেটিন হ্যানয় থেকে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ছাপাতেন—সংস্কৃত শ্লোকগুলি রোমান অক্ষরে ছাপা হ'ত আর তারপর ফরাসী অনুবাদও থাকতো। অধ্যাপক কীডিস্এর বিশেষ অনুগ্রহে এই পত্রিকার যে সংখ্যাগুলি আমার কাজে লাগতে পারে সে সবগুলিই আমি Ecole Francaise d' Extreme Orient-এর কাছ থেকে উপহারস্বরূপ পেয়েছিলাম। এ উপকার ভোলবার নয়। বার বার বলবার দরকার নেই—অধ্যাপক জর্জ কীডিস্এর সাহায্য না পেলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার সম্বন্ধে কোনও কাজই করতে পারতাম না।

আমার বন্ধু সুবোধ মুখুজ্যে আমাকে তাঁর গাইড জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। লেভি সাহেব তখন the greatest living Orientalist বলে গণ্য। প্রাচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচীন, আধুনিক বোধহয় কোনো ভাষা ও তার সাহিত্য তাঁর অজানা ছিল না। তিনি তখন মধ্য এশিয়ার গোবি মহামরুভূমির বালুরাশির মধ্যে বিলুপ্ত একটি ইতিহাসের পাতা থেকেও অবলুপ্ত প্রাচীন এক ভাষার পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। এই ভাষার নাম সেই প্রাচীন রাজ্যের নামে Kuchean দেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল যে এই ভাষার ভারতের সংস্কৃত বা প্রাচীন ইরাণের পহল্বীর চেয়ে সুদূর পশ্চিম ইউরোপের দু-একটি ভাষার সঙ্গে বেশী মিল দেখা গেল। এরকম ভাষার অস্তিত্বের কথা কেউ আগে ভাবেই নি। লেভি সাহেব ভারতের ছাত্রদের বড় ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে তাঁর ফ্ল্যাটে প্যারিসের ভারতীয় বিদ্যার্থীদের ডাকতেন আর ফ্রান্সের বড় বড় অধ্যাপক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তাঁর এই সান্ধ্যপার্টিগুলিতে যোগদান করা আমরা বিশেষ সৌভাগ্য বলে মনে করতাম। এই রকম একটি পার্টিতে বিখ্যাত পর্যটক ও চীন ভাষাবিৎ Prof. Paul Pelliotএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। Pelliot সাহেব চীন ও

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া এ দুইয়ের মধ্যে প্রাচীন কালে যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ছিল তার উপর বিশেষ মূল্যবান কাজ করেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর লেখা যেগুলি ছাপাহয়েছিল—আমি Bulletin de i' Ecole Francaise d'Extreme Orient, Tong Pad প্রভৃতি Journalএ পড়তে পেয়েছিলাম। এই সময় আর একজন বাঙালী তরুণ অধ্যাপকের দেখা পেলাম। শ্রীনিরঞ্জন-প্রসাদ চক্রবর্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনাকরতেন। তিনি তখন প্যারিসে লেভি ও পেলিও সাহেবদের তত্ত্বাবধানে মধ্য এসিয়ার প্রাচীন খোটান রাজ্যে (এখন মরুভূমির মধ্যে বিলুপ্ত) প্রাপ্ত ধর্মপদের কয়েকটি তাল-পত্রে হস্তলিখিত পুঁথির ভাষা (বিশেষ typeএর প্রাকৃত) ও পালী গ্রন্থের পাঠভেদ নিয়ে কাজ করছিলেন। পরে এই চক্রবর্তী মশাই দেশে ফিরে গিয়ে উটকামণ্ডে Epigraphist (Govt. of India), Dy. Director, Archaeological Deptt of India. এবং তারপর Director general of the Archaeoloical Deptt হয়েছিলেন। আমার সঙ্গেও পরে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য হয়েছিল।

সত্যিই খুব ভাল লেগেছিল—কাজের সুবিধার জন্যে ও এমন সব বন্ধু পাওয়ার জন্যে। লণ্ডনে ফিরে আমার অধ্যাপক Prof. Dodwellকে সব কথা বললাম। Prof Coedes ও Prof. Sylvain Leviর কাছে এরকম সাহায্য পাব শুনে তিনি আমার নিজের পছন্দের বিষয়টি (Indian Cultural Influence in Combodia & Java) গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিলেন। আমার জন্যে লেখা-পড়ার প্রোগ্রাম ঠিক করে দিলেন। তিন মাস করে আমি প্যারিসে থাকব—Prof. Coedesএর তত্ত্বাবধানে তথ্যানুসন্ধানের কাজে, তারপর লণ্ডনে ফিরে এসে তাঁর (Prof. Dodwellএর) কাছে যতদূর material যোগাড় করেছি সেটুকু লিখে ফেলতে হবে। তিন মাস পরে আবার প্যারিসে ফিরে ফ্রেঞ্চ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে, তারপর আবার লণ্ডনে গিয়ে Prof. Dodwellকে কি লিখেছি তা দেখাতেও হবে। এই রকম করে দুটি Academic year পুরো হলে (দু বছরের কিছু কম) থিসিস submit করতে পারব। এই প্রোগ্রাম অনুসারে আমি বারো বার ব্রিটিশ চ্যানেল পার হয়েছি—প্যারিসে তিন তিন মাস করে চার বার কাজ করেছি আর লণ্ডনে তিন মাস করে চারবার Dodwell সাহেবের কাছে কাজ দেখিয়েছি। আমার জীবনে এরকম Tale of two cities কয়েকবার হয়েছে—লাহোর-অমৃতসর, প্যারিস-লণ্ডন, আর পরে মীরাট-

দিল্লী আর এখন ৮০ বছর বয়সে বোধ হচ্ছে মীরাট-কলকাতা।

একটা লেখাপড়ার বিষয় তো ঠিক হলো—আর একটারও ব্যবস্থার ভার ঘাড়ে চাপল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া Gold Exchange Standard Thesis ভাল করে revise করে—বাড়িয়ে, সংশোধিত করে—আবার লাহোরে পাঠাতে হবে খবর পেলাম। আমার একজন পরীক্ষক শুনলাম Mr. T. E. Gregory পরে Financial adviser to the Government of India হয়েছিলেন। তখন তিনি London School of Economics d'Political Scienceএ পড়াতেন। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে তিনি কেবল বললেন যে ঐ স্কুলের লাইব্রেরীতে সেই সব দেশের যেখানে Gold Exchange Standard আছে সেখানকার খবরের কাগজ থেকে দেখে নাও তোমার বিষয় সম্বন্ধে কিছু পাও কিনা। এর বেশী তিনি আর কিছু বলতে চাইলেন না। সুতরাং লণ্ডনে যে কয়েকমাস থাকতাম তখন Prof. Dodwellএর নির্দেশ মত প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের অধ্যায়গুলি লিখতাম আর London School of Economics ও ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরীতে মুদ্রাবিনিময় সম্পর্কীয় তথ্য খুঁজে বের করতাম। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আমাকে লণ্ডনে করতে হয়েছিল। আর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ প্যারিসে করেছিলাম। এই রকম প্রায় দু নৌকোয় পা দিয়ে আমাকে বছর দুয়েক চালাতে হয়েছিল। পরিশ্রম বেশী হয়েছিল, কিন্তু তখন বিশেষ Strain বুঝতে পারিনি, পরে কিছুদিন ভুগতে হয়েছিল।

এ সব তো হ'ল লেখাপড়ার কথা—এবার এই দুই শহরের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে জীবন যাপনের কথা কিছু বলি। লণ্ডনে তখন বহু সংখ্যক ভারতবাসীদের আনাগোনা—বিদ্যার্থী, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা, ইত্যাদি। সেদিনও এখানে নিজেদের বসতবাড়িতে বেশ কয়েক ঘর ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ী, ধনী পরিবার বসবাস করতেন। ছাত্ররা, বিশেষতঃ যারা Scholarship holder, Cromwell Roadএ (বোধহয় ঐ রাস্তার ২১ নংএর বাড়ি) আধাসরকারি hostelএ থাকতো। অন্যরা ১১২, গাউয়ার স্ট্রীটে Y. M. C. A. Hostelএ উঠে পরে শহরের উপকণ্ঠে নিজেদের পছন্দ মত বাসা খুঁজে নিত। বড় শহরের ভিতরে থাকা কিছুদিনের মধ্যেই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আমি তো কিছুদিনের মধ্যেই Hampsteadএ খোলা জায়গায় একটি ছোট পরিবারের বাড়িতে একটি ভাল ঘর পেয়েছিলাম। পাঁচ

ছয় মিনিট হাঁটলেই পৌঁছুনো যেত Hampstead Heathএ—খানিকটা কলকাতা ময়দানের মত মাঠ, পুকুর (অবশ্য ছোট পুকুর) খানিকটা বাগান ও দুয়েকটি ঝোপঝাড়। অতবড় শহরের অত কাছে এতটা খোলা জায়গা সত্যিই অভাবনীয় ব্যাপার। সন্ধ্যেবেলা Heathএর দু-একটি জায়গায় বেশ ভিড় হত। এ রকম চারিদিকের শহরতলিতে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও শনিবার সন্ধ্যায় ও রবিবারে ১১২, গাউয়ার স্ট্রীটে অনেক ভারতবাসী ডিনার খেতে আসতেন। পরটা, ভেজিটেব্‌ল্ (বাংলা ভাষায় চচ্চড়ি), ভাত, মাছের ঝোল, দই ইত্যাদি। দেশের খাবারের লোভ অনেককেই এখানে টেনে আনতো। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে লণ্ডনে এ দেশের খাবারদাবার দু-একটি জায়গা ছাড়া পাওয়া যেত না। আবদুল্লার রেস্তোরাঁর তখন খুব নাম ছিল আমাদের দেশের রকমারি খাবারের জন্যে, তবে আমি সেখানে কখনও খাইনি। আমি নিরামিষাশী বলে Stern's Vegetarian Restaurant পছন্দ করতাম, সেখানে দুধের জিনিসও দিত না—সম্পূর্ণরূপে জান্তব পদার্থহীন শাকসব্জী ও ফলমূল দিয়ে লাঞ্চ ও ডিনারের ব্যবস্থা ছিল। কেবল ফল দিয়েও খাওয়াবার আয়োজন ছিল।

প্রথম দিকে যখন লণ্ডনে আসি ১৯২৪ সেপ্টেম্বর মাসে তখন সিনেমায় প্রথম talkieর expriment হচ্ছিল। ততদিন পর্যন্ত movieরই প্রচলন ছিল। আমরা একটা বড় Picture Houseএ এই talkie দেখতে যাই। সেখানেও experiment ভাল হয়নি। Sound movement তখনও Synchronise ভাল করে হয়নি। তখন থিয়েটারের জোর প্রভাব। ১৯২৫ সালে Sibyl Thorndikeএর St. Joan (Jeanne d' Arc) এর ভূমিকায় Bernard Shawএর ঐ নাটকে অভিনয় বাস্তবিকই খুব উঁচুদরের হয়েছিল। ঐ মাঝবয়সী মহিলা ষোল সতেরো বছরের মেষপালিকা Jeanne সেজে এলেন স্টেজে, তারপর কয়েকটা সিনে কয়েক বছরের মধ্যেই পরাজিত ফরাসী জাতিকে আবার ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পদে পদে বিজয়ী করলেন, আর সবশেষে তাঁর কি রকম শোচনীয় পরিণাম হ'ল—এই দৃশ্যগুলি ৪৫ বছর পরেও ভুলিনি।

সেই সময় Chelsea Theatreএ Bernard Shawএর অনেকগুলি নাটক অভিনয় হচ্ছিল। তার মধ্যে দু-একটা দেখেছিলাম—আর আমার ওঁর বই পড়ার চেয়ে স্টেজে ওঁর নাটকের অভিনয় দেখতে বেশী ভাল লাগত। একদিন Canton Hallএ Bernard Shawএর বক্তৃতাও শুনেছিলাম। তখন তো উনি বেশ বুড়ো, তবু কি রকম করে ঐ বিরাট হল-ভরা শ্রোতৃমণ্ডলীকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ

করে রেখেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের আবশ্যকতা।

একটি সন্ধ্যায় Chelsea Theatreএ বাঙলায় ডি. এল. রায়ের "চন্দ্রগুপ্তে"র দু-একটা দৃশ্য দেখানো হয়। Chemistryর তৈল সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ ডাঃ নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর খুব শখের পার্ট চাণক্য ধুতি চাদর পরে ঐ বিখ্যাত স্টেজে তাঁর দেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুদের দেখিয়েছিলেন। আমার তো খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু দু-একজনের মতে এই রকম খালি গায়ে খালি পায়ে বিলেতী দর্শকের সামনে বেরোনো ঠিক হয়নি। এঁদের মধ্যে একজনের কথায় কিছু নতুনত্ব ছিল। তিনি বলেছিলেন যে এ দেশের লোক বোধহয় আমাদের মুখটাই কালো বলে জানত—এখন তারা দেখল যে আমাদের হাত পা সব কালো। ঠাট্টাই করেছিলেন কিন্তু এতে Inferiority ও Colour Complex দুয়েরই আভাস ছিল।

সেই সময় Bernard Shawএর নাটকের সঙ্গে সঙ্গে James Barrieরও নাটকের খুব কদর ছিল। Peter Pan, Rose Marie, Admirable Chrighton প্রভৃতি Barieর নাটক বড় বড় থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল। এই দুটি নাট্যকারের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ ছিল। শ' ছিলেন বাস্তবপন্থী ও ব্যারী ভাববাদী, বরং তাঁকে স্বপ্নলোকে বিচরণকারী বলা যেতে পারে। Maeterlinkএর Blue Birdও তখন থিয়েটার ও সিনেমাতে অনেকদিন ধরে চলেছিল, Barrierএর Rose Marieর মত স্বপ্নলোকের ব্যাপার। Old Vic নামের লণ্ডনের প্রসিদ্ধ থিয়েটারে Shakespeareএর নাটক প্রতি সপ্তাহে মঞ্চস্থ করা হ'ত। দু-তিনটি—Macbeth, Richard III, Midsummer Night's Dream দেখতে গিয়েছিলাম। শেষোক্ত নাটকটি বড় ভাল লেগেছিল, অন্য দুটি অভিনেতাদের বড্ড তাড়াতাড়ি কথা বলার জন্যে ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। আধুনিক নাটক অভিনয়ের বেলায় এ অসুবিধা কখনও হয়নি।

লণ্ডনের কথা বলতে গেলে ব্রিটিশ মিউজিয়মের উল্লেখ বিশেষ করে করতে হয়। এটি হ'ল পৃথিবীর অন্যতম বিরাট লাইব্রেরি ও জগতের নানা দেশের প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সংগ্রহ স্থান। এই পুস্তকাগারের বিশাল domeএর নীচে ১ হাজারের বেশী পাঠক একসঙ্গে পড়াশুনা করতে পারে। এই-খানেই কার্লাইল তাঁর বিখ্যাত French Revolution আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পাশের একটি সীটে একজন সজোরে হাঁচলে উনি রেগেমেগে ব্রিটিশ

মিউজিয়ম থেকে চলে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। বই শেষ করতে হ'ল তাঁকে অনেকগুলি বিভিন্ন জায়গা থেকে মালমশলা জোগাড় করে। তাঁর বই এই কারণে পড়তে খুব চমৎকার বটে কিন্তু একে ইতিহাস বলা যায় না। এই ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতেই কার্লমার্ক্‌স তাঁর প্রলয়ঙ্করী Das Kapital লিখেছিলেন। এইখানেই লেনিনও বলশেভিক বিপ্লব বিস্ফোরণের আগে ভাবী বিপ্লবের রীতিনীতির পর্যালোচনা করেছিলেন। বাস্তবিক domeএর নীচে এই গোলাকার হলটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। প্রায় ছাদ পর্যন্ত বই ঠাসা—আবার এই বইয়ের দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মধ্যে জায়গায় জায়গায় বোতাম টিপে ছোট ছোট ঘরে ঢোকা যায়, সেখানে আরো বই রাখা আছে। আমার ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাজ ছিল নানা দেশের Currency ও Exchange reports নিয়ে—সেগুলি পাওয়া যেত ঐ রকম বইয়ের দেওয়ালের পিছনে ছোট ঘরে। আমার Currency and Exchangeএর কাজ—পঞ্জাবের কাজ—বেশীর ভাগ ঐখানেই পাওয়া খবরের কাগজ ইত্যাদির সাহায্যে শেষ করতে পেরেছিলাম। বাস্তবিক এই লাইব্রেরিতে কাজ করা বড় সৌভাগ্যের বিষয়, পাশাপাশি বসে কত লোকে কত বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করছেন। এখানকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই বিরাট পুস্তকাগারে ঢোকবার সময় বা এখান থেকে বেরুবার সময় কি নিয়ে ঢুকছি বা কি নিয়ে বেরুচ্ছি কেউ দেখে না। প্রথমে যখন শুনেছিলাম যে ব্রিটিশ মিউজিয়মে তুমি বড় সুটকেশ নিয়ে ঢুকতে পারো আর ওখান থেকে ঐ সুটকেশ নিয়ে বেরুবার সময়ও কেউ দেখতে চাইবে না যে ওর মধ্যে কি আছে একথা বিশ্বাস করিনি। আর কোনো জায়গায় reading publicএর ওপর এতটা বিশ্বাস দেখিনি। তবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে প্রবেশাধিকার নিতে গেলে এমন একজনের সুপারিশ নিতে হয় যার Englandএ ভূসম্পত্তি আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে লাইব্রেরী ছাড়া আরও অনেক ব্যাপার আছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে একদিন দেখলাম একটি বৌদ্ধ দেবীমূর্তির পায়ের কাছে যেন পরিষ্কার বাঙলা অক্ষরে লেখা দেবতার নাম। শৈলেন্দ্র রাজাদের সময় ঐ রকম একটি উত্তর-ভারতীয় লিপির শ্রী বিজয় রাজ্যে প্রচলন ছিল। সেই সময় কাম্বোডিয়াতেও কম্বুজনৃপতি যশোবর্মণের digraphic (দুই ভিন্ন লিপিতে লেখা) শিলা-লেখেও এই উত্তর-ভারতের (বাঙলা অক্ষরের মত) script দেখা যায়। খুব সম্ভবতঃ সমকালীন নালান্দার বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্রই এই লিপির উৎপত্তিস্থল।

British Museumএর আরেকটি ঘরে Oriental Literature Depttএ কিছু ভাল বাঙলা বইও পেয়েছিলাম। দীনেশ সেনের একটি বইতে একটি পুরনো উপকথার (শীত বসন্তের গল্প) উল্লেখ পেলাম কম্বুজে, সেই গল্পটি ঐ দেশের বহু শতাব্দীর জনপ্রিয় fairy tale। এই ঘরেই দীপঙ্কর অতীশের থোলিঙ মঠে পশ্চিম তিব্বতের নরপতিকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করবার বিবরণ শরৎচন্দ্র দাসের Indian Pandits in the land of snowতে পেলাম। ১৯২২ সালে আমরা থোলিঙ মঠে পৌঁছে সেখানকার ভারতীয় শিল্পধারার নিদর্শন দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম—এখন ঐ শিল্পসম্ভার কি রকম করে ঐ দুর্গমস্থলে পৌঁছেছিল বুঝতে পারলাম।

বিলেতের আরও দু-একটি কথা বলে এবার ফ্রান্সে আমার প্রবেশের দিনগুলির কথা আরম্ভ করবো। ১৯২৪ সালে যখন প্রথম এখানে আসি তখন আমার খালসা কলেজের ইংরেজ Colleague Prof. Herveyও ছুটিতে Englandএ ফিরেছিলেন। তাঁর একটি ছোট গাড়িও ছিল। একদিন তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে অক্সফোর্ড নিয়ে গেলেন। বড়ই ভাল লাগলো অক্সফোর্ডে 'front'গুলি (কলেজগুলির সামনের দিকের লন ও বাগান)। কেম্ব্রিজের কিন্তু backগুলি দেখবার জিনিস। তাই ঠাট্টা করে cantobদের back দেখাবার (to show their backs) কথা বলা হয়। অক্সফোর্ডের Addisons Walkটি কবিদের কল্পনালোকের মতো—ছোট্ট নদী Isis বাঁকে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে সবুজ মাঠে, দু-একটি কলেজের সুন্দর চুঁড়ো কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে। আর এক জায়গায় দেখা গেল কতকগুলি আমাদের দেশীয় ছাত্র (Hervey সাহেব একটু উত্তেজিত স্বরে ঐ দেখ Indian students বলে আমাকে দেখিয়ে দিলেন) রাস্তায় খেলা করছে। এই প্রথম Oxford bags দেখলাম। খুবই ঢিলে প্যাণ্ট—আজকাল gutter pipe আঁটা trousersএর ঠিক উল্টো। দু-একটি কলেজের ভেতরেও ঢুকলাম—প্রায় গির্জের (cathedral-এর) মতই দেখতে ও সেইরকমই শান্তির জায়গা।

লণ্ডনে ফেরবার আগে Hervey আমাকে Stratford on Avonএও নিয়ে গেলেন। Avon নদীতে Swans (সত্যিকারের রাজহংস) অনেকগুলি দেখা গেল। নদী, রাজহংস, নদীর ধারে সেকালকার পুরনো বাড়ি সব মিলিয়ে ৩০০ বছর আগেকার একটি চমৎকার ছবি দেখলাম। শেক্সপীয়ারের নিজের বাড়িটিও একটি দেখবার জিনিস। লণ্ডনে ফেরবার সময় Stoke Poggis-

এর ছোট গির্জেটি, যেখানে Grey তাঁর জগৎবিখ্যাত Elegy written in a country churchyard লিখেছিলেন সেটি দেখা গেল—কবির কবর সেখানেই আছে। ওখানে যে পৌঁছব কখনও ভাবিনি—দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। ওরই কাছাকাছি Burnam Beehes—Englandএর মত জনাকীর্ণ জায়গায় যে এখনও মধ্যযুগের নামকরা দস্যু Robinhoodএর সেই Green Forestএর কিছু রয়ে গেছে—তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। খুব বড় বড় গাছ—আর গাছতলায় যেন পরিষ্কার Lawn। লণ্ডনে ফিরতে বেশ দেরী হ'ল—আর ঠাণ্ডায় কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তখন বোধহয় অক্টোবর মাস শুরু হয়েছে। Mr. Hervey অতগুলি জায়গা দেখিয়ে সত্যিই Bamboo Groveএর Sageএর উপযুক্ত কাজ করেছিলেন। 'বাঁশ বাগানের গোষ্ঠীর' আর একটি আড্ডাধারী তাঁর কাছে এর জন্য কৃতজ্ঞ।

এবার Channel পারে প্যারিসে যাওয়া যাক। বার দুয়েক এখানে আসাতে এখানকার ভাষাটি কিছু আয়ত্ত হয়েছে। বন্ধুদের উপদেশ মত French খবরের কাগজ (অবশ্য Le Tempsএর মত দুরূহ দৈনিক নয়) পড়ছি rapid reading (ডিকসনরি না দেখে তাড়াতাড়ি) প্রথাতে। আর একটি নতুন উপায়ও বার করা গেছে। মলিয়েরের নাটক প্রায়ই Odeon বা Theatre Francaiseএ অভিনীত হত। সে সপ্তাহে যে বইটি মঞ্চস্থ হবে, সেটি বাড়িতে ভাল করে পড়ে, বইটি সঙ্গে নিয়ে theatre দেখতে যাওয়া—এই হল ফরাসী উচ্চারণ স্বকর্ণে শুনে ঐ কঠিন ব্যাপারটি সহজ করে নেবার চেষ্টা। আর এতে ভাল ফলও পেয়েছিলাম। তখন Franceএর Franc রোজই exchange বাজারে বেশ দ্রুতবেগে পড়ছিল—আমাদের কাছে francএর দাম আট আনা বা আরো কম দাঁড়িয়েছিল। তাই ভাল থিয়েটার বেশ ভাল Seat আমাদের পক্ষে দুর্মূল্য ছিল না। মাঝে মাঝে সঙ্গে করে ছোট Electric torch নিয়ে যেতাম, যখন থিয়েটারের আলো নিবে যেত তখন Torchএর আলোতে বই পড়া চলতো। মলিয়েরের অনেকগুলি ভাল বই এই রকম করে পড়া ও দেখা দুই হয়েছিল। খুবই ভাল লেগেছিল। আমার French পড়াও আর সেই বুড়ী Russian theosophistএর কাছে হ'ত না। Quotidien দৈনিক কাগজের একটি নিয়মিত লেখিকা ছিলেন আমার নতুন tutor Mlle Simone Karpelez। এঁর দুই দিদিও ছিলেন বিদুষী মহিলা। এঁর বড় দিদিকে Mlle Andree Karpelez দেখেছিলাম Bangkokএর রাজপুস্তকাগারে,

Coedie সাহেবের research assistant হয়ে তাঁর কাজে সাহায্য করছিলেন। অনেকদিন পরে ইনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন, দিল্লী ও কলকাতার Alliance Francaiseএ একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। আমার ভ্রাতৃজায়া তুহিনিকা দেবীর সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়েছিল। দিল্লীতে একটি ফরাসী পুস্তকের প্রদর্শনীতে তিনি আমাকে Prof. Coedesএর একটি নতুন বই উপহার দিয়েছিলেন। এই বইটি আমার Indonesia (India & Javaর নূতন সংস্করণ) লেখবার সময় খুব কাজে লেগেছিল। এঁদের মেজ বোন Mlle Suzanne Thiery রীতিমত journalist, ছোটগল্প লেখিকা ও Social Worker ছিলেন। আর এঁদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন Miss Madeline Slade, ভারতের British Admiral Sladeএর মেয়ে, পরে যিনি ভারতে এসে গান্ধিজীর শিষ্যা হয়ে মীরা বেন (Behn) নাম নেন। Miss Sladeএর সঙ্গে প্যারিসে Karpelez ভগ্নীদের মধ্যবর্তিয়ার পরিচয় হয়েছিল। উনি ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে খুব ইচ্ছুক ছিলেন। ওঁর গান্ধিজীর প্রতি ভক্তি মা তো একেবারে পছন্দ করতেন না। আর উনি যে গান্ধিজীর আশ্রমে যাবেন ও সেইখানে থাকবেন এই সঙ্কল্প তো ওঁর মার অসহ্য ছিল। খানিকটা সেই কারণেই বোধহয় উনি প্যারিসে কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন, বাড়ির ঐ বিরুদ্ধ মনোভাবের আবহাওয়া থেকে দূরে থাকতে। তবে ভারতে যাওয়ার আগে উনি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে, তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও মার আশীর্বাদ পেয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করবেন এসব এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন। ভারতবর্ষ ওঁর কাছে একেবারে নতুন দেশ নয়, ওঁর বাবা Admiral Slade যখন বোম্বাই ছিলেন তখন উনি যদিও ছেলেমানুষ ছিলেন তবুও নিজে চৌখুড়ি চালিয়েছেন কয়েকবার এ গল্প তাঁর কাছে শুনেছি। বিদেশী এই মহিলার এরকম দৃঢ় সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগ সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন নেওয়া আমাদের চমৎকার লেগেছিল। তাঁর একটি কথা বেশ মনে আছে—উনি ওঁর মাকে বলেছিলেন যে Jesus Christ বা Peterএর সময় কোন Roman Matron যেমন করে তাঁর মেয়েকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে অনুমতি দিতে পেরেছিলেন তেমনি করে তুমিও আমাকে গান্ধিজীর আশ্রমে যেতে দাও। এর উত্তর কি পেয়েছিলেন জানি না। তাঁর দৃষ্টান্তের একটি ফল ফলেছিল। আমিও স্থির করেছিলাম যে দেশে ফিরে গিয়ে সরকারী চাকরি নেব না।

প্যারিসে তখন কয়েকজন ভারতবাসী ছিলেন যাঁদের দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব

ছিল না। রাজনৈতিক কারণে তাঁদের এই নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। শহীদ সুরাবর্দি (Sahid Subrawardi) এই উদ্বাস্তুদের একটি উঁচুদরের উদাহরণ। এঁর বাবা কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, ওঁকে অল্পবয়সেই বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। Oxford University থেকে খুব ভাল করে ইংরেজি সাহিত্যে পাস করে উনি St. Petersburgএর (এখনকার Leningradএর Universityতে lceturer in Englishএর পদে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তারপর ১৯১৭ সালের Bolshevik বিপ্লব St. Petersburgয়েই আরম্ভ হয়। সুরাবর্দিকে শহর ছেড়ে পালাতে হয়। ও ভদ্রলোক তো Bolshevikদের হাত থেকে পালিয়ে এলেন, কিন্তু British Govt. সন্দেহ করলেন যে ১৯১৭ সালের Revolutionএর সময় St. Petersburg ও Leningradএ ছিল, সুতরাং নিশ্চয় ঐ বিক্ষোভে জড়িত ছিল। সুরাবর্দি অতএব ভারতে বা Great Britainএ ফেরবার অনুমতি পেলেন না। কয়েক বছর থেকে ভদ্রলোক France, Germany, Switzerland প্রভৃতি দেশে যাযাবরের জীবন যাপন করেছিলেন। এই রকম দেশবিদেশে ঘোরবার ফলে কতকগুলি ইউরোপীয় ভাষা ওঁর খুব সড়গড় হয়েছিল। French, German, Russian এই তিনটিতে সুরাবর্দি লেখাপড়া কথোপকথন কোনটাতেই পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ওঁর স্বভাবের একটা দিক বেশ মজার লাগত। উনি কোনরকম গোঁড়ামি সহ্য করতে পারতেন না। আর ওঁর সবচেয়ে রাগ ছিল গোঁড়া মুসলমানদের উপর। পাণ্ডিত্যাভিমান ওঁর ছিল না, আমাদের দলে (সুবোধ মুখুজ্যে, প্রবোধ বাগচী, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রভৃতি) আগ্রহের সহিত যোগদান করেছিলেন। উনি নিজেও journalist ছিলেন তাই Karpelez ও Thiery ভগ্নীদের সঙ্গেও পরিচয় ছিল।

১৯২৫এর শেষের দিকে জার্মানী থেকে প্রফেসর সত্যেন বোস এলেন প্যারিসে। জার্মানীতে সত্যেন বোস আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। আর সেই সময়েই ওঁদের দুজনের নামেই বোস-আইনস্টাইন থিওরি বের হয় ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এর খুব কদর হয়। প্যারিসে এসে তো বোসমশাই খুব ফরাসীসাহিত্য চর্চা করেছিলেন, গণিত শাস্ত্রের কাজ অবশ্যই করে থাকবেন, সেটা আমরা জানতে পারিনি। অদ্ভুত লোক বোসমশাই, যখন নিজের বিষয় গবেষণা করতেন, ঘরের দরজা বন্ধ থাকত, পেয়ালার পর পেয়ালা কফি আনাতেন রিং করে, (Door Bell) সমস্ত ঘরময় পেয়ালা, সিগারেটের ছাই ছড়ানো থাকত। কাজ শেষ হলে দরজা খোলা হত, ঘরটি পরিষ্কার করানো হত, আর

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প, হাসি ঠাট্টা জোর চলত। বলা বাহুল্য ইনি ছিলেন দেশের National Professorদের মধ্যে একজন—ভারতের Leading Physicist of the day।

Physicist কথাটি যখন বললাম তখন অন্ধ্রদেশের 'রামাইয়ার' (পুরো নামটি মনে নেই—V. Ramaiya বোধ হয়) বাস্তবিক অসাধারণ ব্যাপারটির উল্লেখ এখানেই করা উচিত। উনি ছেলেবেলা থেকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে science পড়তেন ও artsএর দিকে একেবারে টান ছিল না। সেই কারণে ম্যাট্রিক পরীক্ষাও পাস করেননি। কিন্তু ভিজিয়ানগ্রাম (Viziangram) রাজ-পরিবারের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুন রামাইয়া ভিজিয়ানগ্রাম কলেজের ল্যাবরেটরীতে ফিজিক্স বিষয়ের গবেষণা চালাতে পেরেছিলেন। এই রকম কাজ করতে করতে ওঁর বিশ্বাস হয় যে তিনি স্থবিধে পেলে একটি নূতন আবিষ্কার করতে পারেন। ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেটের জন্যে রিসার্চ করবার অনুমতি দিলেন না। ইংলণ্ডেও চেষ্টা করে বিফলমনোরথ হলেন। তখন তিনি ফ্রান্সে তাঁর গবেষণা কাজটি যথাযথভাবে সমাপন করতে চাইলেন। প্যারিস ইউনিভার্সিটি তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন, তিনি যদি ঠিক ঠিক রেজাল্ট দেখাতে পারেন তাহলে (যদিও তিনি ম্যাট্রিকও পাস নন), তিনি ডি-এসসি ডিগ্রী পাবেন। রামাইয়া পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন, তাঁর নিজের উদ্ভাবিত কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে যা তিনি করে দেখাতে চাইছিলেন তা তাঁর অধ্যাপকদের মনের মত করে দেখালেন। আমরা সবাই ওঁর ডক্টরেট পাওয়ার সময়ে ইউনিভার্সিটির একটি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। ফ্রান্সে ডক্টরেট পরীক্ষার viva voice stage একটি ছোটখাটো সভা করে হয়—যাঁরা সে বিষয়ে চর্চা করেন তাঁরা ঐ সভায় যোগদান করেন। ছাত্র আসেন, অধ্যাপকেরাও আসেন, পরীক্ষার বন্ধুরা আসতে পারেন। এই stageটিকে বলা হয় defence of the thesis। সেদিনকার সম্মিলনীতে রামাইয়ার কাজের খুব প্রশংসা করা হয়েছিল আর রামাইয়া তার উত্তরে বলেছিলেন যে তাঁর দুটি মাতৃভূমি—একটি হ'ল ভারতবর্ষ, দ্বিতীয়টি ফ্রান্স। এরপর উনি তো দেশে ফিরে গেলেন। শুনেছি যে হায়দ্রাবাদে দু-তিন বছর কাজ করার পর উনি মারা গিয়েছিলেন। একটি প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক অকালে চলে গেলেন।

শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছাত্র—খুবই অল্পবয়সী—এখানে technical line-এ কাজ শিখতে এসেছিল। একটি মারাঠী ছেলে গণিত বিষয়ের ফরাসী বই

পড়ছিল আর একটি কলকাতার ছেলে ভাল football player—Iron & Steel Industryর technique বোঝবার জন্তে ফ্রান্সের নানা স্থানে ঘুরছিল। এর মধ্যে দু-একটি তো যে কাজের জন্য এসেছে তা খুব মনোযোগ দিয়েই করছিল —তবে দুঃখের বিষয় সবার ক্ষেত্রে এরকম বলতে পারি না। আমার বিশ্বাস নেহাত অল্পবয়সে ছেলেদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্তে পাঠানো উচিত নয়। লণ্ডনেও কয়েকটি শিক্ষার্থীর বিপথে যাওয়া দেখেছি, প্যারিসেও দেখলাম। একেবারে নতুন রকমের জীবনযাত্রা ও সামাজিক প্রথার মধ্যে পড়ে ছেলেমানুষের মন অনেক সময় টাল সামলাতে পারে না। এরকম দু-একটি ছেলেকে প্রায় জোর করে বাড়ি ফেরানো হয়েছিল। একটি বেশ Promising ছাত্র (অঙ্কের) নিজের পড়া ছেড়ে সাহিত্যচর্চায় লাগল, তাতেও বেশী উদ্বিগ্ন হবার কথা ছিল না। ভাবা গিয়েছিল নিজের কাজ ও কিছুদিনের মধ্যেই আবার করবে। এক সন্ধ্যায় একটু বোধহয় তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি, Door Bell বাজল। অব্যাহতি নাই দেখে "Entrez" বললাম, দেখলুম সেই ছাত্রটি ঘরে ঢুকলেন—আমার খাটের (পালঙের) পাশের চেয়ারে বসে কেন যে তাঁর কাজ এগুচ্ছে না তা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমি দশ বছর কলেজে অধ্যাপনা করে এসেছি এ খবরটা অনেকেরই জানা ছিল। তাই কমবয়সী ছাত্ররা আমাকে একটু সমীহ করে চলত—আর কখনও কখনও আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসত। এই যুবকটি খানিকক্ষণ পরে Mistanguetএর (এটি গায়িকার Stage name) নাম উল্লেখ করলেন। সে সময় প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে Mistanguet-এর খুব নাম। তিনি খুব উঁচুদরের গায়িকা, প্রায়ই খবরের কাগজে তাঁর আগের সন্ধ্যায় গাওয়া গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরোত। এই মারাঠী ছেলেটি দু-তিনদিন তাঁর গান শুনে মোহিত হয়ে এখন তাঁর কোনো গীতানুষ্ঠানই বাদ দেন না। •

পড়াশুনার দিকে আর মন যায় না। Mistanguetএর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় কি করে হয় এখন তাই হয়েছে তাঁর প্রায় একমাত্র চিন্তা। হাসিও পেল দুঃখও হ'ল এরকম আত্মকাহিনী শুনে। কি আর বলবো তাই বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে Mistanguetএর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। খবরের কাগজে দেখা যায় অনেক ধনকুবের (বেশীর ভাগ বিদেশী) Mistanguetএর admirer। ছাত্রটির উচিত গণিত শাস্ত্রে ভাল করে মন দেওয়া—অনেকের মতে গণিতের চর্চা একরকম যোগসাধন—মন একাগ্র করবার শ্রেষ্ঠ উপায়। পরামর্শটি নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি—কারণ

গণিতের ঐ ছাত্রটি আর কখনো আমার ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করেননি।

একটি caseএ কিন্তু romance আর কাজ দুই একসঙ্গে মোটের উপর ভাল ভাবেই চলতে পেরেছিল। এ কাহিনীর নায়ক হলেন 'ঈষৎ বিকৃত মনোবস্থা'র বিষয় তত্ত্বানুসন্ধানকারী একটি ছাত্র। এঁর পিতা একটি বড় শহরের বস্ত্রবিক্রেতা, পয়সার কোনো অভাব নেই। প্রায়ই আমাদের সকালবেলা নিকটস্থ Kiosk থেকে ভাল ফুল কিনে এনে উপহার দিতেন। তাঁরই কাছ থেকে কতকগুলি নামী ফুলের—paeony, lily of the valley, forget-me-not, hyacinth প্রভৃতির পরিচয় পেয়েছিলাম। লণ্ডনে তো ওরকম ফুল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে কেনা সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল। একদিন তিনি একটু আড়ালে আমাকে; সত্যেন বোস ও সুবোধ মুখুজ্যেকে বললেন (কথাটা খুব বেশী confidential করেন নি) যে একটি ইতালীয় সিনিওরিনাকে (কুমারীকে) বিয়ে করতে চান। তাঁরই জন্যে রোজ অনেক ফুল কেনেন—আমরা তারই কিছু প্রসাদ-স্বরূপ পাই। মেয়েটি গরিবের মেয়ে, তাঁর মা আছেন, মার বিয়েতে মত আছে। ছেলেটি পাগ্‌লাটে গোছের হলেও বাস্তবিকই খুব সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও মিশুক প্রকৃতির। সবায়ের সঙ্গে ভাব—রাস্তা-চলতি ছেলে-মেয়েদের, বুড়ো-বুড়িদের সঙ্গে হাসিখুশি কথাবার্তা। ও যেমন ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলতো আমাদের মধ্যে কেউ সেরকম পারতো না। বাপের কাছ থেকে পয়সা পেত বেশ আর খরচ করতোও মুক্তহস্তে। নিরামিষ খেতো—প্যারিসের পানীয় যার লোভে কত globe trotter এখানে আড্ডা গাড়তো, সে তা ছুঁতোও না, খরুচে হলেও নিজের ওপর কিছু বেশী খরচ করতো না। এক কথায় সবায়ের প্রিয় পাত্র ছিল তবে সুরওয়র্দি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন যে এ ঐশ্বর্যের মূল হ'ল কাপড় মাপবার গজ। ছেলেটির বাবা ছিলেন দিল্লীর চাঁদনী চৌকের বড় বস্ত্র-ব্যবসায়ী। এইখানেই বলে রাখি যে যুবকটির থিসিস খুব ভাল করেই approve হয়েছিল। কিন্তু এর বাবা ঐ বিদেশিনীর সঙ্গে ছেলের বিয়ের কথা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছিলেন ও পুত্রটিকে পত্রপাট দেশে ফিরতে লিখেছিলেন। এই তরুণ মনস্তত্ত্ববিদ্‌টির উপর পিতার এই আজ্ঞার ফল একটু নতুন ধরনের হয়েছিল। চিরকাল যে লোকটি নিরামিষাশী সে আমাদের সামনে সব রকম আমিষ ডিশ আনিয়ে একসঙ্গে মেখে ওষুধ গেলার মতো গিলে ফেললো। তারপর জীবনে নিশ্চয়ই প্রথম বার vin rouge ও vin blanc (যে দুটি পানীয় প্রত্যেক টেবিলে অবশ্য অবশ্য রাখা থাকে)

একটা গ্লাসে মিশিয়ে কুইনিন মিক্সচার খাওয়ার মতো মুখ বিকৃত করে খেয়ে ফেললো। ঐ দৃশ্যটি দেখবার মতো হয়েছিল। এরপর কিন্তু নিজের পুরোনো রীতি অনুসারেই খাওয়াদাওয়া চলেছিল। তার আর ব্যতিক্রম করা হয়নি। আমার প্যারিস এসে ঘর পছন্দ করে নেওয়ার সম্বন্ধেও এই abnormal psychologyর গবেষক একটি মন্তব্য করেছিল। 17 Rue de Sommerard-এ জায়গা না পেলে আমি এমন একটি Maison Meuble খুঁজতাম যেখান থেকে হয় Sorbonne বা Notre Dameএর ভাল view পাওয়া যেত। আমি কেন এরকম ঘর চাইতাম এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল, এ মনস্তত্ত্ববিদের মতো আমারও বেশ খানিকটা Megalomaniaর মতো মনোবিকার আছে। মনের ঐ দিকটার যেন বেশী বাড়াবাড়ি না করি—তাহ'লে ফল খারাপ হতে পারে।

আমি একটি বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড় ছেলের (ধীরেন চাটুজ্যে) কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তখন ফ্রান্সে ফুটবলের ততটা চলন হয়নি—আমাদের খেলোয়াড়টি ঐ খেলায় বেশ সুনাম কিনেছিল। একদিন ওর কলেজের দলের একটা ম্যাচে ও অপরপক্ষকে দুটি গোল দেয়। ঐ কলেজের মেয়ে ছাত্রীরা ওদের বিজয়ী প্লেয়ারকে congratulatory kiss দেয়। ফ্রান্সে আর বোধহয় ইয়োরোপের আরও অনেক দেশে kissing হ'ল আনন্দ জানাবার অন্যতম প্রথা —পিতা-পুত্রের, প্রিয় বন্ধুবান্ধবের, গুরু-ছাত্রের মিলন বা বিদায়োপলক্ষে। আমরা এ সব স্থলে এরূপ রীতি দেখতে অভ্যস্ত নই। এই teenager খেলোয়াড়ের সৌভাগ্যের কথা শুনে আমার এক প্রবীণ বন্ধু বলেছিলেন যে তিনিও ফ্রান্সের কোনো একটা ফুটবল ক্লাবে ভর্তি হবেন।

প্যারিসে অনেকবার এসেছি। বসন্তকালে boulvardeগুলির বড় বাহার। রাস্তার ধারের সারিবদ্ধ চেস্টনাট্ গাছগুলিতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। কাংড়ার পাহাড়ে জঙলী গুঁ গাছের মতই এই চেস্টনাট্ গাছ—ফুল এর আরো ভাল হয় আর ফল রোস্ট করে খেলে বেশ মুখরোচক হয়। শীতকালে সন্ধ্যাবেলা রাস্তার ধারে বড় বড় কড়ায় চেস্টনাট্ গাছতলায় তারই নাট্ বোধহয় গরম বালিতে ভাজা হয় আর পথ-চল্‌তি লোক কিনে খেতে খেতে চলে যায়।

শীতকালে লণ্ডন থেকে প্যারিসে আসার আর একটি বড় সুবিধে—এখানে লণ্ডনের মতো হলদে বা কালো ফগ্ নেই। কখনো যদি কুয়াশা (ফগ্) হয় সেটা হাল্কা সাদা ফগ্। লণ্ডনের কালো ফগ্—সৌভাগ্যবশতঃ কমই হয়—সত্যিই ভয়াবহ ব্যাপার, দিনের বেলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তায় বেরুলে কোন্ দিকে

যাচ্ছি বোঝা যায় না। হলদে ফগ্ অতটা খারাপ নয়, যদিও একটু দূরের জিনিস ঝাপসা দেখায় আর গলা কুট্‌কুট্ করে। আজকাল বোধহয় কয়লার ব্যবহার কম করাতে ফগের জন্য অতটা কষ্ট হয় না। অতবড় শহরও নয় আর পোর্ট টাউনও নয় তাছাড়া কলকারখানাও অনেক কম, এসব কারণে প্যারিস (পারী) অনেকটা পরিষ্কার। আর এটাও বলতে হয় যে এখানকার পথঘাটের দৃশ্য (বিশেষতঃ Quartier Latinএ) বেশী প্রাণবন্ত—হাসিখুশী, খানিকটা হট্টগোলও আছে কিন্তু খুব বেশী হৈ হৈ ব্যাপার নয়।

শরতের গোড়ার দিকেও ফ্রান্স ভোজনবিলাসীদের পক্ষে ভাল জায়গা। তখন আঙ্গুর ফ্রেঞ্চ আপেল ও পেয়ারের (আপেল একটু টক কিন্তু সুস্বাদু নাসপাতি খুব নরম, রসালো আর মিষ্টি) মরসুম। প্যারিসেই Muscatel grapes খেয়েছি—এ আঙ্গুর কেবল সুস্বাদু নয়, খুব সুগন্ধ—এক প্লেট ঘরে রাখলে মনে হয় ঘরে কেউ ভাল এসেন্স মেখে ঢুকেছে। এ সময়টা আমি সন্ধ্যা বেলা আর ডিনার খেতুম না। ফলের দোকানে গিয়ে এক কিলো মিস্‌কাটেল আঙ্গুর কিনে আনতাম, সন্ধ্যাবেলা ঘরের বেসিনে ভাল করে ধুয়ে এ আঙ্গুরের গুচ্ছগুলি শেষ করে ডিনারের পাট চুকিয়ে দিতাম। ঐ রকম ফলাহার করে ভালই ছিলাম। শুনেছি Quettaয় এই আঙ্গুর (মিস্‌কাটেল) পাওয়া যায়, কিন্তু তা বাইরে যায় না। এই ফ্রেঞ্চ আপেল আর ফ্রেঞ্চ পেয়ার কুলুতে খুব ভাল হয় আর শ্রীনগরে (কাশ্মীরে) যে রকম ফ্রেঞ্চ পেয়ার পেয়েছিলাম, সে রকম ফ্রান্সেও পাইনি। একবার প্যারিসের একটি শৌখীন দোকান থেকে একটি নাসপাতি কিনেছিলাম, সেই ফলটির গায়ে একটি সুন্দর হরিণের ছবি ছিল। ছবিটি আঁকা নয়, ফলের খোসা কেটে বা খোসার ওপর দাগ দিয়েও করা হয়নি। আমার বন্ধুরা সাবানজল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করেও ছবির কিছু করতে পারলেন না। তারপর শোনা গেল যে ফল যখন ঠিক পাকেনি তখন হরিণের গড়নের ছোট কাগজ কেটে ফলের গায়ে আটা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তারপর বেশ কিছুদিন পরে ঐ কাটা কাগজ তুলে ফেলা হয়। কাগজ তুলে ফেললেও ওর হরিণাকৃতি ছাপ ফলের গায়ে থেকে যায়।

প্যারিসের যে জায়গাটি আমার সব চেয়ে ভাল লাগতো সেটি হ'ল লুভার —পৃথিবীর সেরা Art Collection, নেপোলিয়ান তাঁর দিগ্বিজয়সূত্রে যেটিকে গড়ে তুলেছিলেন। অন্তত বার কুড়ি আমি এই পুরোনো রাজবাড়ি, যা এখন আর্ট মিউজিয়াম হয়েছে, তন্ন তন্ন করে দেখেছি। নিজের দেখার তো

শখ ছিলই আবার অন্য দেখবার লোক বা লণ্ডন থেকে কেউ পরিচিত লোক এলে Louvre দেখাবার ভার আমারই ওপর ছিল—আর এ কাজটি আমার খুবই ভাল লাগত। কোন্ ঘরে কোন্ বিখ্যাত ছবিটি দেখা যাবে (Mona Lisa বা Greuzeএর Broken Pitcher) তা আমাকে আর গাইডকে জিজ্ঞেস করতে হ'ত না। সোজা সেই ঘরে আগন্তুককে নিয়ে ঢুকতাম। সে সব ঘরের দারওয়ানরা তো আমার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে তুলেছিল। বাস্তবিক লুভারের ঘরে ঘরে বেড়ানো—Venus de Milo, Victoire de Samothrace দেখবার জন্যে নীচের ঘরে যাওয়া, Italian Renaissanceএর ঘরে গ্রেট মাস্টারদের জগদ্বিখ্যাত পেইন্টিং দেখা, উনিশ শতকের ফ্রান্সের Ingresএর La Source, Corotএর Landscape প্রভৃতি ছবি বার কুড়ি দেখেও আশা মিটতো না। যে ছবিগুলি ভাল লেগেছিল তার পিক্‌চার পোস্টকার্ড কিনেছিলাম আর সেগুলি সযত্নে অ্যালব্রামে রেখেছি। এখনও কোনো কোনো দিন অ্যালবাম খুলে Louvre পরিক্রমা করি।

বর্তমান শতাব্দীর Impressionist প্রভৃতি আর্টের ছবি Musee de Luxembourgএর galleryতে আছে। এখানে নতুন যুগের নতুন ধারা Cezanne, Lenoir প্রমুখ চিত্রকরের, দিনকতক আগে অবহেলিত এখন বিশ্ববিখ্যাত, চিত্রশিল্প দেখবার সুন্দর আয়োজন আছে। জানি না আরো আধুনিক আর আরও তুমুল আন্দোলনের বিষয় Picasso ও Van Goghএর আঁকা ছবি এখানে বা প্যারিসের অন্য কোনো আর্ট গ্যালারিতে দেখেছিলাম কিনা।

প্যারিস তো চিত্রশিল্পীর মহাতীর্থস্থান—দেশবিদেশের চিত্রকরেরা এখানে আসেন, জগতের সেরা শিল্পসম্ভার দেখেন, Ecole des Beaux Arts etc. আর্ট শিক্ষা-নিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও অনেকেই খ্যাতনামা আর্টিস্ট হয়ে ওঠেন। আমরা এখানে থাকতে থাকতে কলকাতার সার্ আশুতোষ চৌধুরীর একটি ছেলে আর্যকুমার চৌধুরী ওখানকার কোনো আর্ট ইন্‌স্টিটিউটে কাজ করছিলেন। তাঁর আঁকা একটি ছবি প্যারিসের একটি আর্ট এগ্‌জিবিশনে দেখেছিলাম।

প্যারিসে আর্ট এগ্‌জিবিশনের খুব ধুমধাম। একটি এগ্‌জিবিশন খুব অদ্ভুত লেগেছিল। এটি হ'ল Salon des Indepents—স্বাধীনচেতা চিত্রকরদের চিত্রপ্রদর্শনী—এটির কোনো ছবিরই কিছু বোঝা যায় না। ছবির নীচে যে নাম লেখা আছে তাতে কিছুই বোঝবার সাহায্য হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—একটিতে দুটি তিনটি সরু ও মোটা লোহার নল—নীচে লেখা Don Quixote।

আজকালকার অ্যাবস্ট্রাক্ট্ পেইন্টিং হ'ল অন্য রকমের। এই Independent Artistরা 'আর এক গোয়ালের'।

ইউরোপের আর্ট ছাড়া এসিয়ার আর্টের নমুনা প্যারিসের অন্য মিউজিয়ামে আছে। এফেল টাওয়ারের কাছে Musee de Trocaderoতে কম্বুজের প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও দেবদেবীর ফোটো ও প্লাস্টার অফ্ প্যারিস দিয়ে তৈরী Small-scale reproduction অনেকদিন আগের একটি World Exhibitionএর সময় থেকে এখানে সংগ্রহ করা আছে। এ এগ্জিবিশনের সময়েই এফেল টাওয়ার তৈরী হয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত এই স্টীল টাওয়ারটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ টাওয়ার ছিল। এ ছাড়া Musee Guimetতে Cambodia, Annam (Vietnam) Siam (Thailand), Laos—তার মানে সমস্ত ইন্দোচায়নার অনেক প্রাচীন মূর্তি, কিছু শিলালিপি ও আরও অনেক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ের মূল্যবান সামগ্রীর রীতিমত সুসজ্জিত ভাণ্ডার আছে। আমার ক্যাম্বোডিয়া সম্বন্ধে কাজের জন্য এই Musee Guimetএর সংগ্রহ ভাল রকম সাহায্য করেছিল।

এ ছাড়া Musee Cerunuschi হ'ল চীন, মঙ্গোলিয়ার প্রাচীন শিল্পের প্রদর্শনশালা—এটি প্যারিসের বেশ একটি নিরালা জায়গায় Parc Moncef-এর মধ্যে ছিল—শহরের কোলাহল থেকে দূরে শান্তিময় স্থান। লণ্ডনের হাইড্ পার্কের মতো প্যারিস শহরের মধ্যে অত বড় পার্ক নেই বটে তবে Tuileries, Luxembourg প্রভৃতি পুরোনো রাজবাড়ির বাগানগুলি যদিও অত বড় নয় কিন্তু বড় সুন্দর। আর Versaillesএ—প্যারিস থেকে মাইল দশ এগারো দূরে ইতিহাসবিশ্রুত রাজভবনের উদ্যান মোগল বাগানের মতো terraced garden, মধ্যে সুন্দর একটি খাল আর তার মধ্যে কত রকমের ফোয়ারা। সপ্তাহে একদিন এই ফোয়ারাগুলি সব খোলা হ'ত আর সন্ধ্যাবেলায় আলোয় আলোয় ঝল্মল্ করতো আর সেই পটভূমিকায় Moliere বা Racineএর কোনো একটি নাটক অভিনীত হ'ত। সত্যিই সে এক অপরূপ দৃশ্য—আমাদের মাইকেল মধুসূদন তাঁর একটি চতুর্দশপদী কবিতাতে এর বর্ণনা করেছেন। এই রাজপ্রাসাদে তিন শতাব্দী ধরে কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে আর এখনও ঘটছে। ১৭৮৯, ১৮৭০, ১৯১৯এর ক'টি তারিখ তো সব আগে মনে পড়ে।

প্যারিসের অন্যদিকে আর বেশ খানিকটা দূরে আর একটি ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। এটি হ'ল নেপোলিয়নের প্রিয় বাসভবন Fontainbleu।

এর কয়েকটি ঘর এখনও নেপোলিয়ানের ব্যবহৃত আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত। আর এর Grand Staircaseটি ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের রাজ্যভার ত্যাগের tragic দৃশ্যের অবিস্মরণীয় পটভূমি।

ফ্রান্সে রাজদ্রোহ অপরাধে দণ্ডিত নিজ দেশ থেকে নির্বাসিত লোকের অভাব নেই। এঁদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে আমরা আমাদের 17 Rue de Sommerardএর Association de Etudiants Hindousএ নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ছোটখাটো মানুষটি, সাদাসিধে গলাবন্ধ কোট ও খাকি প্যাণ্ট পরা, আমাদের অনুরোধে কয়েকটি কথা বললেন। তিনি তখন যাচ্ছেন আমেরিকাতে 'প্রেমে'র বিষয়ে সে দেশের লোককে কিছু বলতে, কিন্তু আমাদের যা বললেন তাতে তো violence ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর মতে গান্ধিজীর অহিংস নীতি দেশের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে। পঞ্জাবের অহিংস আকালি আন্দোলনের উল্লেখ করে তিনি বললেন যে একটি তেজস্বী মার্সিয়াল সম্প্রদায়কে এরকম ক্লৈব্যে পরিণত করার চেয়ে দেশদ্রোহিতা আর কি হ'তে পারে। বাস্তবিক রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে যেন জ্বলন্ত আগুন বলে মনে হয়েছিল।

দু-একটি বাঙালী পলিটিকাল রিফিউজিও ওখানে দেখেছিলাম। তার মধ্যে ডাঃ রাম ভট্টাচার্যকে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় ও দিল্লীতেও দেখেছি। তাঁর স্ত্রীও বিদুষী—তিনি Czech মহিলা তবে বাংলা ভাষা বেশ ভাল করে শিখেছেন আর বাঙালী পরিবারে বেশ ভালভাবে নিজেকে মিশ খাইয়েছেন। জানি না এখন তাঁরা কোথায় আছেন।

বিদেশে নতুন বন্ধু তো কতকগুলি পেয়েছিলাম—দু-একজন যাঁদের সঙ্গে দেশেই পরিচয় হয়েছিল যেমন দে মশাই, বিদেশে তাঁদের আবার দেখা পেলাম ও আরো ভাল করে পরিচিত হলাম। সুবোধ মুখুজ্যের কথা আগেই বলেছি। আর একজন হলেন কে. এম. পানিকার, পরে ইনি সর্দার পানিকার নামে দেশেবিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রফেসার, ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট, দেশীয় রাজন্যবর্গের অমাত্য, ভারতের রাষ্ট্রীয় দূত, ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার এইরূপ একটির পর একটি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েও তাঁর অসাধারণ প্রতিভা যেন তার পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয়নি। ১৯২৩এ অমৃতসরে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হ'লে তখন তিনি অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালা কমিটীর সেক্রেটারী হয়ে ওখানে আসেন। তারপর লণ্ডনে ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে অনেকবার ১১২ গাউয়ার স্ট্রীটে আবার

ওঁকে দেখি—তখন উনি ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট। ১৯২৫-২৬এ প্যারিসে কয়েকবার আমরা একই বাসায় (Maison Meuble'তে) ছিলাম। দেশে ফিরে দিল্লীতে আবার এক জায়গায় যেমন Indian School of International Studiesএ কাজ করবার সুযোগ হয়েছে। এ দুটি বন্ধুর—সুবোধ মুখুজ্যের ও পানিকারের অকালমৃত্যুতে আমাদের দেশ দুটি Genius হারিয়েছে। সুবোধ মুখুজ্যে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যানুরাগ অসামান্য ছিল —সত্যিকারের স্কলার ছিলেন। পানিকারের প্রতিভা বহুমুখী ছিল, কার্যক্ষেত্রও বহুদেশব্যাপী ছিল—শত্রুমিত্রও তাঁর অনেক ছিল।

১৯২৫ সালের শেষের দিকে আমার কম্বুজের কাজ শেষ হয়ে গিছলো। জাভা, সুমাত্রার (যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপের) বিষয় আমাদের School of Oriental Studiesএর Dean Dr. Otto Blagdenএর কাছে তখনও পড়ছি। আমাদের Director, Sir Dennison Ross আমাকে এই সম্বন্ধে ডাচ্ শিখতে বললেন। তাঁর মতে যারা ইংরিজি জানে তারা তো একটু মন দিয়ে ডাচ্ পড়লে বুঝতে পারবে। তিনি নিজে বহুভাষাবিদ্ (৩২টি ভাষা জানতেন এইরূপ খ্যাতি তাঁর ছিল)—তাঁর ও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের যে কতটা প্রভেদ তা তিনি বুঝতেন না। আমাকে তো কষ্ট করে ডাচ্ শিখতে হ'ল —আর যখন কিছু কিছু পড়তে পারি তখন Dr. Blagden আমাকে Holland-এর Leyden Universityতে ঘুরে আসতে বললেন। ওখানে Dr. Krom ছিলেন যবদ্বীপে হিন্দুযুগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

১৯২৫এর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে খুব বরফ পড়ছে, এমন এক সন্ধ্যায় মাইলখানেক হেঁটে স্টেশন পৌঁছলাম, জাহাজে যখন চড়লাম তখন ডেক বরফে ঢাকা, যেন মার্বলের মতো মেঝে রং হয়েছে। রাত্রে খুব ঝড় ছিল—আর এবার তো কেবল Channel Crossing নয়—North Seaতে সমস্ত রাত্রি পাড়ি দিতে হল। খুব Sea-sick হয়েছিল, ভোরবেলা হল্যাণ্ড যখন পৌঁছলাম—তখন সেখানেও দেখলাম সব সাদা হয়ে আছে। ঘণ্টা দুয়েক রেল যাত্রার পর Leyden পৌঁছলাম, সেখানে রাস্তাঘাট বরফে ঢাকা।

Leydenএ সার্ ডেনিসনের নির্দেশানুসারে আমি একটি ডাচ্ প্রফেসারের বিধবা স্ত্রীর (তিনি ব্রিটিশ) বাড়িতে দুই সপ্তাহ ছিলাম। খুবই ভদ্র পরিবারটি—গিন্নী ঠাকরুণ আমাকে ডাচ্ শিক্ষাও দিতেন। কাছেই ছিল প্রফেসার Kromএর বাড়ি—তার পরের দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। সৌম্য মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক,

দেখেই যথার্থ পণ্ডিত প্রকৃতির বলে মনে হয়। তিনি আমার প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর দিয়ে আমাকে Leydenএর পুরাতত্ত্বের মিউজিয়াম দেখে যেতে বললেন। তিনি তখন তাঁর বৃহৎ যবদ্বীপে হিন্দু সংস্কৃতির বিষয়ে বই লিখছিলেন। দেশে ফিরে কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে ঐ বই পড়েছি—বইটি ঐ বিষয়ের স্ট্যাণ্ডার্ড বই। আজকাল দু-একটি ডাচ্ লেখক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় প্রভাবকে যতটা পারেন ততটা কম করে দেখাতে চান। প্রফেসার Kromএর সিদ্ধান্ত ঠিক এর বিপরীত।

তাঁর বাড়ি থেকে আমি সোজা সেই আর্কিয়লজিকাল মিউজিয়ামে গেলাম। Leyden ছোট জায়গা—সবই কাছাকাছি। মিউজিয়ামের ঠিক বাইরেই দেখলাম বিশাল শিবমূর্তি, রাত্রে বরফ পড়েছিল, সেই বরফে আধখানা ঢাকা। বড়ই ভাল লেগেছিল দেশের ঠাকুরটিকে বিদেশে বরফে ঢাকা দেখে। মিউজিয়ামের হলে সব আগেই দেখলাম সেই জগদ্বিখ্যাত প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তি, বোধহয় ভারতীয় স্টাইলে ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ঐতিহাসিকদের মতে এটি বাস্তবিক মধ্যকালীন জাভার Queen Dedesএর প্রতিমূর্তি, যাঁকে 'পদ্মিনী' রমণী বলে সমসাময়িক রাজন্যবর্গ ঘোষিত করেছিলেন। পদ্মিনী রমণীর পাণিগ্রহণ করলে সার্বভৌম নৃপতি হওয়া যায় এই ধারণার দরুন Queen Dedesকে পাবার জন্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত হয়েছিল। Leydenএর এই Indonesian Antiquities-এর সংগ্রহ বোধহয় জাভার অনেক আর্ট কলেক্শনের চেয়ে ভাল। সুকার্ণোর মতো ব্যক্তি যদি নিজ ক্ষমতা বহাল রাখতে পারতেন তাহলে নিশ্চয় এই ডাচ্ মিউজিয়ামের অনেক সামগ্রী আবার নিজের দেশে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতেন।

হল্যাণ্ডে এসে এমন এক দৃশ্য দেখা গেল যা অন্য কোথাও দেখা যেত না। খাল থেকে নদীতে আর নদী থেকে সমুদ্রে অনবরত জল পাম্প করে বের করা হচ্ছে। এর জন্যে অসংখ্য উইণ্ড মিল চারিদিকে তাদের পাল ঘোরাচ্ছে—এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ দেশের ডেঙ্গী সমুদ্রতলের চেয়ে নীচু তাই দেশটাকে সমুদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে রাতদিন এই সব কলাকৌশল করতে হয়।

Leydenএ এই ভদ্র পরিবারেরবাড়িতে Xmas (কেক, craol গান সমেত) পালন করে প্যারিসে ফিরে এলাম। বরফ-ঢাকা হল্যাণ্ড খুব ভাল লেগেছিল। নদী খুব পুরু বরফ জমা, তার ওপর স্কেটিং হচ্ছে, নদীতীরে টাটকা বরফ দিয়ে স্নোবল নিয়ে খেলা, বরফে আটকানো বোট,—এ রকম দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি।

প্যারিসে আর একটি জীবনে প্রথমবার অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। আমি, সুবোধ মুখুজ্যে আর একটি অল্পবয়েসী কলকাতার কেমিস্ট্রীর লেকচারার (মহেন্দ্র গোস্বামী) একটি ছোট চার সীটার এরোপ্লেনে Le Bourget থেকে Brussels বেড়াতে গেলাম। এরোপ্লেনটি যেমন ছোট, তেমনি বেশী উঁচু দিয়েও যাইনি, নীচের ঘরবাড়ি, রাস্তার গাড়িঘোড়া সব দেখতে দেখতে গেলাম। Ardenneএর অরণ্য—শেক্সপিয়ারের 'As You Like It'এর পটভূমি দেখা গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তোপের গোলাতে চুরমার হয়ে আছে। Battle of Sommeএর যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দিয়ে ওড়বার সময় অসংখ্য cross দেখলাম—প্রত্যেক ক্রসের নীচে কত যোদ্ধার কবর আছে। আকাশে যে জায়গায় জায়গায় বাতাস খুব কম (এয়ার ভেকুয়াম পকেট) থাকে তা পাইলটকে বুঝিয়ে দিতে হ'ল যখন আমাদের ছোট প্লেনখানি সুন্দর উড়তে উড়তে হঠাৎ ঝপ্ করে বেশ খানিকটা পড়ে যাচ্ছিল। প্রথমবার তো আমরা ভয় পেয়েছিলাম যে সব শেষ হ'ল—মাটিতে ধড়াস করে পড়ে এবার ইহলীলা সাঙ্গ হ'ল। তারপর ফ্রেঞ্চ পাইলটকে জিজ্ঞেস করে এয়ার পকেটের রহস্য জানা গেল।

ব্রাসেলস্ প্যারিসের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তবে শহরের মধ্যে বড় 'চৌকে' (Square) ফুলের হাট আর সামনে মধ্যযুগের প্রাচীন অট্টালিকাগুলি দেখবার মতো। এরি কাছে একটি নতুন ধরনের ফোয়ারা দেখা যায়। একটি তিন-চার বছরের খোকা দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছে। সুন্দর স্ট্যাচুটি খোকাবাবুর আর 'হিসি'টিও খুব ভাল পানীয় জল। এর গল্প হ'ল যে শহরের এক ধনী বণিকের খোকা হারিয়ে যায়। তারপর যখন খোকাবাবুকে পাওয়া গেল, তখন তিনি এইখানে দাঁড়িয়ে 'হিসি' করছিলেন। তখন শহরের ঐ পাড়ায় ভাল পানীয় জলের অভাব ছিল, বণিকটি ছেলে ফিরে পাওয়ার আনন্দে ঐখানে ভাল জলের ঐরকম ফোয়ারা তৈরী করে দেন। ব্রাসেলস্এর একটি চিত্রশালায় রবি ঠাকুরের দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে দেখলাম, দুটিই খুব ছেলেমানুষ।

ব্রাসেলস্ থেকে তার পরদিন জার্মানীর বন্ শহর ট্রেনে করে যাওয়া গেল। Rhine Land দেখা হ'ল, ওখানকার প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটির (একসময় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার জন্যে বিশেষ করে প্রসিদ্ধি ছিল) ঘুরে আসা গেল। ফেরার পথে Cologneএর বিখ্যাত গির্জা দর্শন হ'ল। এই দেবস্থলটি যেন মানুষের হাতের তৈরী নয়—এ যেন কবির স্বপ্ন আর কবিরাই এর বর্ণনা করতে পারেন। Cologneএর আর একটি জায়গা মনে থাকবে। 'ও ডি কলোন'

(Eaude Cologne) তো সবাই জানে, অনেকেই ব্যবহার করেছে—এই 'কলোনের জল'—খাঁটি অকৃত্রিম 'ও ডি কলোন'—যাঁরা কয়েক শতাব্দী থেকে শৌখীন জগতের সেরা প্রসাধন রূপে fashion circlesএ উপহার দিয়ে আসছেন সেই 'মারিয়া ফরিনার' রাজপ্রাসাদ সম show room দেখে এলাম। প্রকাণ্ড 'হল', দেওয়ালে সেই মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে জার্মান সম্রাটদের চিত্র, তাঁদের মোহর লাগানো প্রশংসাপত্র—আর নানা আকারের, খুব বড় (জালার মত বড় কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে) আঁধার (জেস্) আর খুব ছোট শিশি 'ও ডি কলোন' ফারিনা ছাপমারা চারিদিকে সাজানো রয়েছে। সত্যিই এক বিরাট ব্যাপার। এই হ'ল ও ডি কলোনের আদি উৎপত্তিস্থল।

এবার প্যারিস ছাড়বার আগে আমার বন্ধুজের থিসিস টাইপ করিয়ে নিলাম। আমাদেরই maison meubleতে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে ওপরের garretএ থাকতেন। দেশ (বাঙলাদেশ) অনেকদিন ছেড়েছেন, অনেকদিন চেকোস্লোভাকিয়ায় ছিলেন, বিয়েও করেছেন সেখানে, এখন অবস্থা মোটেই ভাল না (খানিকটা নিজের দোষেই)। তিনি আমার সন্দর্ভ টাইপ করার কাজ খুব সাগ্রহে নিলেন। পান দোষই তাঁর দুরবস্থার কারণ, কিন্তু ও লোকটির সাহিত্যচর্চার ওপর টান ছিল, নিজেও দেশ-বিদেশের উপকথার ওপর বেশ ভাল গবেষণা করেছিলেন। তাঁর সাহায্যে আমার থিসিস্ ভাল করেই টাইপ হয়েছিল। লণ্ডনে যে বাকি অংশটা (উপসংহার) টাইপ করতে হয়েছিল তার জন্যে অনেক বেশী দাম (প্যারিসে অন্য সব চ্যাপ্টারের জন্য যা দিয়েছিলাম সেই একই পরিমাণ অর্থ) দিতে হয়েছিল।

লণ্ডন ফিরে আসবার মাসখানেক পরে পঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে খবর এল যে আমার 'A Comparative Study of the Gold Exchange Standard' ডক্টরেটের জন্য মনোনীত হয়েছে। একটা মস্ত বড় বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল। অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আমার 'Indian Cultural Influence in Cambodia' থিসিসের শেষ অধ্যায় শেষ করলাম। ঐ অধ্যায়টি আমার নিজের খুব পছন্দ হ'ল, কেন না লিখতে লিখতে অনেক নতুন ধারণা মনে এল, যার কথা আগে ভাবিনি, আর সেগুলি যেন বিনা আয়াসে লিখে ফেলতে পারলাম। যখন ও রকম করে কিছু লেখা যায় তখন বেশ ভালই লেখা হয়।

অবশেষে (বোধ হয় এপ্রিল ১৯২৬এ) এই থিসিসটি লণ্ডন ইউনিভার্সিটির

অফিসে দিয়ে এলাম। বেশ মনে পড়ে যে রেজিস্টারের অফিস থেকে রাস্তায় নেমে এসে মনে হ'ল যেন বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—হেম্পস্টেডে ফেরবার আগে কোথাও বসে জিরুতে হবে। কাজেই একটি ছোট পার্কের বেঞ্চে অনেকক্ষণ চুপ করে বসলাম—তখন সেখানে কেউ ছিল না—তারপর ধীরেসুস্থে বাসায় ফিরে এলাম। এরপর তো রেজাল্টের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কাজ রইল না। খুব ঘুমনো আর সকাল বিকেল খুব বেড়ানো গেল।

কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসার J. M. Keynes (পরে Lord Keynes বলে যিনি পরিচিত হলেন) আমার কারেন্সি থিসিসের একজন পরীক্ষক ছিলেন। আমার মনে হ'ল এখন তো রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, আর কোনো বাধা নেই, এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে কেম্ব্রিজ পৌছলাম। আমার খালসা কলেজের (অমৃতসরের) একটি ছাত্র পদম্ চান্দ্ ভাণ্ডারী ওখানে পড়ছিল, তাকেও চিঠি লিখেছিলাম। সে স্টেশনে এসে আমাকে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির একটি চক্কর দিয়ে Keynesএর ঘরের কাছে ছেড়ে দিলে, কারণ তার তখন ক্লাস আরম্ভ হবে। অক্সফোর্ডের মত কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিও সুন্দর ছবির মত দেখতে—তফাত হ'ল অক্সফোর্ডের কলেজগুলির front হ'ল দেখাবার জিনিস, কেম্ব্রিজের হ'ল কলেজের back। তাই Oxonরা ঠাট্টা করে Cantabদের "you show your backs" বলে। 'Backs'-এর Lawnগুলির ঘাস এমন পুরু আর এমন সবুজ মনে হয় যেন খুব দামী পার্সিয়ান কার্পেটের ওপর পা দিয়েছি। কেম্ব্রিজের একটি হোস্টেলের কয়েকটি cubicles দেখলাম সেই মধ্যকালীন যুগের Monksদের থাকবার কুঠুরি। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মঠ থেকেই বিদ্যাচর্চার ভার নেয়। এই কুঠুরিগুলি ছোট ছোট দেওয়াল আব্‌ড়োখাব্‌ড়ো পাথর দিয়ে তৈরি, মেঝেও সেই রকমই paved, আছাড় খেলে বিলক্ষণ লাগবার কথা। আমার ছাত্র (পদম্ চান্দ্ ভাণ্ডারী) বললে এ কুঠুরি পাবার জন্য খুব রেষারেষি হয়।

সময়মত Keynes সাহেবের ঘরে (বোধ হয় কিংস কলেজে) উপস্থিত হলাম। তিনি তখন কলেজের লনে একটি গ্রুপ ফটোর জন্যে বসেছিলেন। খানিকক্ষণ পরে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলেন যে ঐ থিসিসের জন্য ডক্টরেট পেয়েছি কিনা? ওঁর সম্পাদিত ম্যাগাজিনে (কোয়ার্টারলি ইকনমিক রিভিউতে) আমি ঐ থিসিসের কিছু অংশ ছাপাতে পারি। আমি যখন তাঁকে বললাম যে এখন আমি ইকনমিকস্ ছেড়ে দিয়ে ইতিহাস নিয়ে কাজ করবো স্থির করেছি

আর আমার দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার ওপর কাজের কথা বললাম, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে আরও কয়েক বছর ইকনমিকসের কাজ করে তারপর হিষ্ট্রির কাজ নেওয়া উচিত হ'ত। আরও একজন ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এলেন, আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

Keynes তথনই তাঁর Monetary Economics Policyর জন্যে জগৎ-বিখ্যাত হয়েছিলেন। মুদ্রার হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের হ্রাস বৃদ্ধি বিচক্ষণ শাসকেরা সুকৌশলে করতে পারেন। এই হ'ল Keynsian Doctrine, বোধ হয় এখন আর তত খ্যাতি নেই। আমার ছাত্রের (পদম্ চান্দ্ ভাণ্ডারীর) কাছে শুনেছিলাম যে Keynes Stock Exchangeএ বেচাকেনায় লক্ষপতি হয়েছেন, একটি রুশ রাজকন্যাকে বিয়ে করেছেন, আর যদিও অল্প বয়েসের জন্যে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসার হতে পারেননি তবে যশ ও কৃতিত্বে শুধু ব্রিটিশ কেন সারা পৃথিবীর ইকনমিস্টদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছেন।

কেম্ব্রিজ ছাড়বার আগে Cam নদীতে বোট রেস দেখতে গেলাম। এই রেসে যে বোট জিতবে সেই বোট অক্সফোর্ডের সঙ্গে বোট রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এর দিনকতক পরেই আমার 'ভাইভাভোসি' পরীক্ষার (পরীক্ষকদের সম্মুখীন হওয়া আর ওঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া) ডাক এল। দুজন পরীক্ষক ছিলেন—একজন তো আমার টিউটার প্রফেসার ডড্ওয়েল আর অন্যটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের Oriental Section of the Libraryতে যাঁকে দেখতাম তিনিই বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ স্কলার Dr. Allan। Dr Allanই আমাকে তিন-চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন—তার মধ্যে একটি হ'ল ফ্রেঞ্চ স্কলাররা যা বলেছেন তা ছাড়া নতুন কিছু আমি লিখেছি কিনা। আমার উত্তর তৈরীই ছিল। আমি বললাম যে নালন্দার সঙ্গে কম্বুজ ও শ্রীবিজয়ের সম্বন্ধ, বাঙলার পাল বংশের মহাযান ধর্মের ইন্দোচায়না ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচার, বাঙলার প্রাচীন উপকথার কম্বুজে প্রচলন—সংক্ষেপে কেবল দক্ষিণ ভারতের নয় উত্তর ভারত বিশেষতঃ বাঙলা ও মগধের সংস্কৃতির এই অঞ্চলে বিস্তার—এসব আমার নিজের তরফের নতুন কথা। তখন Dr. Allan বলেছিলেন যে আমার শেষ অধ্যায়—Conclusion—বেশ ভাল হয়েছে। তারপর দুই পরীক্ষকই আমাকে কন্‌গ্রাচুলেট্ করলেন। Dodwell সাহেব বললেন যে তোমার নিজের পছন্দ বিষয় ছিল—তাই এত যত্ন করে লিখতে পেরেছ।

যাক আমার দু বছর পরিশ্রম করা সার্থক হ'ল। আমার দুটি থিসিসই মনোনীত হ'ল—বিশেষতঃ কম্বুজের কাজটি আমার নিজেরও খুব ভাল লেগেছিল।

এবার এতদিনের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। Hampstead-এ যে বাড়িতে থাকতাম সেখানে একটি সিনিয়ার মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট যেমন বুদ্ধিমতি ছাত্রী ছিলেন তেমনি তাঁর ব্যবহারও ভদ্র ছিল। নিজের পড়াশুনা করে গৃহস্থালী কাজকর্মও গুছিয়ে করতেন। ইনি বাসার সব tenantদের খুব যত্ন করতেন।

Dodwell সাহেবকে বেশীর ভাগ ভারতীয় ছাত্র মোটেই দেখতে পারতেন না—আমি তো তাঁকে সত্যিই গুরুরই মত দেখতাম। Dr. Blagdenএর কাছে তো আমি বিশেষ ভাবে ঋণী, তিনি যদি আমাকে ডাচ স্কলারদের বই থেকে পড়ে আমাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে না দিতেন তাহলে আমার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। Dr. Lionel Barnett শিলালিপি (বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের) বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। বাস্তবিক স্কুল অফ্ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ, লণ্ডন, আমার জীবনে একটি স্মরণীয় তীর্থস্থানের মত রইল।

লণ্ডন থেকে প্যারিসে এলাম। এখান থেকে দেশাভিমুখে যাত্রা শুরু হবে। আমি সুইট্জারল্যাণ্ড, ইটালী হয়ে নেপল্স্এ জাহাজ ধরবো ঠিক করলাম। সুবোধ মুখুজ্যে, প্রবোধ বাগ্‌চী নেপল্সে ঐ জাহাজেই আমার প্রতীক্ষা করবেন, তাঁরা সুইট্জারল্যাণ্ড, ইটালী আগেই ঘুরে এসেছেন। প্যারিসে পানিকারের ও অন্যান্য সুহৃদের কাছে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে সুইট্জারল্যাণ্ড যাত্রা করলাম। ভোর বেলা ঘুম ভেঙে দেখি সামনে Lake Geneva ছোট সমুদ্রের মত—হ্রদে স্টীমার চলছে। সবচেয়ে যা ভাল লেগেছিল সেটি হ'ল Lago Maggiore—হ্রদের মধ্যে ছোট দ্বীপগুলি ফুলে ভরা। তার পর এল Simplon tunnel—পৃথিবীর দীর্ঘতম এই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এল ইটালীর বিখ্যাত শহর Milan। Swiss train বদলে ইটালীর স্টেশনে যাবার সময় Milan গির্জের পাশ দিয়ে গেলাম। এ গির্জাটিও খৃষ্টান জগতের একটি দর্শনীয় Cathedral, প্যারিসের Notre Dame, Cologneএর গির্জার তুলনীয়। সন্ধ্যা দশটা আন্দাজ Florence পৌঁছলাম। বড় সুন্দর হোটেল। সকালে ব্রেকফাস্টের পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম Pitti Palace ও Uffizi gallery দেখতে চাই হোটেলের ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন যে সেই সুবিস্তৃত চৌকের মধ্যেই এই দুটি বিখ্যাত

চিত্রশালা ফার্লং খানেক দূরে রয়েছে। তখনি হাঁটতে আরম্ভ করলাম—লাঞ্চের আগে এ দুটি আর্ট গ্যালারি ঘুরে এলাম—গ্রেট ইটালীয়ান মাস্টারসদের বিশ্ববিশ্রুত চিত্র প্রাণ ভরে দেখে এলাম। এত অল্প জায়গার মধ্যে এত সুন্দর জিনিস বোধ হয় আর কোথাও নেই। এই চৌকের মধ্যেই Savonarolaকে জ্যান্ত পোড়ানো হয়েছিল। এখন সেইখানে তাঁর স্ট্যাচু আছে। আর এরই কাছে Michael Angeloর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সেই শ্বেতপাথরের প্রতিমূর্তিগুলি আছে। অনেক দিন আগে Italian Renaissanceএর বিবরণ ভাল করে পড়েছিলাম। এখন মনে হ'ল যেন Lorenzo de Mediciর যুগে এসে পড়েছি। যে দিকে যাই Savonarola, Machiavelli, Michael Angelo, প্রভৃতি, Lorenzoর সমকালীন ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাই। Arno নদীর উপর সেতুটি Danteর কথা মনে করিয়ে দেয়। Florence অনেক দিন ধরে দেখবার জায়গা—আমার দেড় দিনে দেখায় তো আরো ভাল করে দেখবার ইচ্ছেই বেড়ে গেল। কিন্তু আমাকে তার পরের দিনই রোম অভিমুখে যেতে হ'ল দেশে ফেরবার জন্য সময়মত জাহাজ যাতে Naplesএ ধরতে পারি।

রোম অমর শহর (ইটারনাল সিটি)—এখানে বিদেশী পথিক 'বাঁশ বাগানে ডোম কানা' হয়ে যায়। Forum, Capitol, Colisseum, St. Peter, Vatican Palace—এখানে ইতিহাস জমাট বেঁধে রয়েছে। হোটেল থেকে যেতে আসতে একটি বিজয়স্তম্ভ (বোধ হয় Trajanএর) ও আর একটি বিজয়-তোরণ বার বার দেখতাম আর এখনও রোমের কথা মনে পড়লে ঐ দুটি স্মৃতিপটে দেখতে পাই। ঐতিহাসিক, কবি ও দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা রোমের নানা স্থানের কত বর্ণনা করেছেন—আমার এ সবের মধ্যে মর্মস্পর্শী মনে হয়েছিল Quo Vadis Church যেখানে যীশু পলায়মান পিটারকে Quo Vadis (কোথা যাও) বলে বকেছিলেন; আর রোমের Catacombs, মাটির নীচে গুপ্ত শহর, (যেখানে অত্যাচার-পীড়িত খৃষ্টানেরা কয়েক শতাব্দী ধরে আশ্রয় নিয়েছিল) সেই বিজয়তোরণ ও বিজয়স্তম্ভ যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, আর রোমের ফোয়ারা (অন্য কোথাও ফোয়ারায় জলের অত তোড় দেখিনি)। রোমে আর একটি ঘটনা (St. Peters' Cathedral দেখবার সময়) উল্লেখযোগ্য—এখানে টুরিস্টদের ভিড়ের মধ্যে অনেক আমেরিকার নরনারী দেখেছিলাম। তার মধ্যে কতক যেমন ভদ্র ও সুশিক্ষিত ছিলেন, তেমনি অনেক যাত্রী নিতান্ত

অভদ্র ও কুশ্রীও দেখা গেল। তাদের সবায়ের একই কথা—রোমে মন প্রাণ খুলে মদ খাচ্ছি কেমন (U. S. A. তে তখন Prohibition চলছে)—কয়েকজনের চেহারা বাস্তবিকই বীভৎস ছিল।

রোমের পর Naples। See Naples and then de—Naples দেখবার পর বেঁচে থাকবার আর কোনো মানে হয় না—কথাটা একেবারে বাজে কথা নয়। সামনে নীল সমুদ্র, দূরে Capri দ্বীপের ছবির মত দৃশ্য, পেছনে Vesuviusএর আগুন ও ধোঁয়ার ঝলক—সব মিলিয়ে এক অপরূপ পরিবেশ। জাহাজ (যাতে মুখুজ্যে ও বাগ্‌চী আসছেন) তখনও এসে পৌঁছয়নি।

Naplesএর খুব কাছেই ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি। তার কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনছি—ভাবলুম জাহাজ আসতে তো আর একদিন দেরী—ভিসুভিয়াস দেখে আসি। যাবার খুব সুন্দর বন্দোবস্ত—Funiculer railway। পাশাপাশি দুটি ট্রেন, একটি উঠছে আর একটি নামছে খাড়া পাহাড়ের গায়ে, একটি মোটা 'কেব্‌ল্‌'এ একটির মুখ আর একটির ল্যেজ বাঁধা।

এর আগে কখনও ওরকম ট্রেন চড়িনি। খানিক দূর তো পীচ এপ্রিকট্‌ প্রভৃতি ফলের বাগানের মধ্যে দিয়ে যাওয়া গেল—ছোট গাছগুলি ফলের ভাবে নুয়ে পড়েছে। তারপর জমি কালো হয়ে গেল—যেন কয়লার গুঁড়োর পুরু স্তরে ঢাকা। তারপরে নেমে দেখা গেল পাহাড়ের ওপরটা যেন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—আর সেই প্রকাণ্ড গর্তের ঠিক মধ্যে একটি ছোট টিলার মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে ধোঁয়া ও আগুন বেরুচ্ছে। পর পর দুটি ঝলকের মধ্যে একটি গুরুগম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে। দশ-বারো মাইল থেকে সেই গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় ২০০০ বছর আগে যখন দুটি শহর Herculancum ও Pompeii ধ্বংস হয়ে যায় তখন ঐ বিরাট গহ্বরটি পাহাড়ের বুক চিরে ফেটে বেরোয় আর ঐ প্রকাণ্ড ক্রেটার থেকে আগুন ও লাভা ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ে দূর দূর পর্যন্ত একটি সুন্দর শস্যশ্যামল অঞ্চল পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এখন-কার ক্রেটার সেই পুরোনো ক্রেটারের তুলনায় অনেক ছোট।

আগ্নেয়গিরি থেকে নেমে এসে Naplesএর যাদুঘর দেখলাম। সেখানে পম্পেইএর সেই ভীষণ রাত্রের অনেক নিদর্শন রয়েছে। একটি তো ভোলবার নয়—একটি মেয়েমানুষ উপুড় হয়ে বোধ হয় তার খোকাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে, সেই অবস্থায় 'লাভার' গায়ে তার দেহের ছাপ রয়েছে।

সেইদিন বিকেলে জাহাজ এলো—ইটালিয়া Loyd Tristino জাহাজ।

মুখুজ্যে, বাগচী 'ডেক্' থেকে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। কবি কামিনী রায়ের ছোট ছেলে (নাম মনে নেই) Naples থেকে সেই জাহাজে উঠলো। আর প্যারিস থেকে আসছিলেন কাবুলের আমানুল্লার ছেলে আর ফ্রান্সে কাবুলের রাজদূতের ছেলে বারো-তেরো বছর বয়সী জাহির খাঁ। এই জাহির খাঁ এখন জাহির শাহ। এঁরা সব আমাদেরই সঙ্গে এই জাহাজে বোম্বাই যাবেন। এই ছেলেরা ফ্রান্সে স্কুলে পড়ে—গরমের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে। ইটালিয়ান জাহাজে খাবারদাবারের বন্দোবস্ত বেশ ভাল ছিল। যাত্রীরাও বেশীর ভাগ ঘরমুখো, সুতরাং সবাই হাসিখুশি প্রফুল্লচিত্ত। ডেকে, সেলুনে এ মেলামেশা ভাল রকমই চলছিল। কাবুলের রাজদূত-পুত্রের (জাহির খাঁর) সঙ্গে ও তার দু-একটি সঙ্গীদের সঙ্গে ডেকে খেলাধুলাও হত। ঐ দলটির সবাই খুবই ভদ্র ও খুব মিশুক ছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুযেজখালে জাহাজ ঢুকলো। ভূমধ্যসাগরের পর মরুভূমিব মধ্যে এই খালের এলাকা বেশী রকম গরমই মনে হচ্ছিল—রাত্তিরে 'ডেক'এর ওপর বিছানা পেতে শোয়া যেত। একদিন ভোরবেলা মনে হ'ল যে আমার বিছানার পাশে কেউ যেন খস্‌খস্ শব্দ করে ঘুরছে। ভাল করে চেয়ে দেখি যে ওটি কাবুলের রাজদূতের ছেলে (বছর বারো-তেরো বয়স)জাহির খান—হাতে একটি বড় কাঁচি। আমি জেগে উঠেছি দেখে ছেলেটি পালিয়ে গেল। পরে আমবা জলযোগ খেতে বসেছি তখন জাহির খান ডাইনিংরুমে ঢুকে, শাসিয়ে গেলেন যে মসিঁয় সাত্তেজির গোঁফ ডাইনিংরুমে একেবারেই সহ্য করা যেতে পারে না। বিশেষতঃ সাত্তেজি যখন সুপ খান তখন মনে হয় যেন ওঁর গোঁফ ছাঁকনির কাজ করছে। 'তাই (জাহির) আজ ভোরবেলা ঐ গোঁফ একেবারে কেটে পরিষ্কার করে দিতাম। সাত্তেজি আমার খুব বন্ধু, তাই তাঁর এই উপকার করতে গিয়েছিলাম।'

সেইদিনই কাবুলের রাজপুত্র—আমানুল্লার ছেলে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে, 'জাহির যদি এ রকম জ্বালাতন করে তাহলে আমাকে বলো,—আমি ওকে দুষ্টুমি করতে দেব না।'

যা হোক এর পরেও সবায়ের সঙ্গে তেমনি ভাবসাব চললো। আমার একটি ফ্রেঞ্চ বইয়ে জাহির খাঁ ও আর একটি আফগান ভদ্রলোক (বোম্বায়ের কাবুল কন্সাল জেনারেলের ছেলে) লিখেছিলেন যে তুমি নিশ্চয়ই কাবুলে আসবে আর আমরা নিজে তোমাকে সব দেখাব শোনাব। জাহির খাঁ পরে জাহির শাহ—

আফগানিস্থানের রাজা হন। বইটি সযত্নে তুলে রেখেছি—কিন্তু কাবুল যাওয়া হয়নি। অনেক দিন পরে একবার কাবুলের অ্যামব্যাসেডরকে তাঁদের রাজার ছেলেবেলাকার এই গল্প বলেছিলাম—ভদ্রলোক খুব হেসেছিলেন আর বলেছিলেন যে এবার যখন কাবুল যাবেন রাজাকে এই বৃত্তান্ত শোনাবেন।

বোম্বাই পৌঁছনো গেল। ওখানকার কাবুলীরা ওদের রাজপুত্রের খুব ধুমধাম করে অভ্যর্থনা করলে—আমি ও প্রবোধ বাগচী সুবোধ মুখুজ্যের এক আত্মীয়ের বাড়ি ডাল ভাত শুক্তো চচ্চড়ি ইলিস মাছ ভাজা ইত্যাদি সব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। তবে হলুদের গন্ধটা যেন বেশী বোধ হল—কিছুদিন ওরকম হলুদের গন্ধটা খারাপ লাগতো।

লাহোর থেকে বেরিয়েছিলাম বিদেশযাত্রায়, এবার কলকাতায় নিজেদের বাড়িতে ফিরলাম। জানি না এর আগে বলেছি' কিনা যে ১৯২৫এ বাবা ল কলেজের প্রিন্সিপ্যালশিপ থেকে রিটায়ার করে কলকাতায় উড স্ট্রীটে বাড়ি কিনেছিলেন।

ছেলেমেয়েদের ধরমশালায় (কাংড়া ডিস্ট্রিক্ট) খুব ছোট দেখে গিছলাম, এখন তারা অনেকটা বড় হয়েছে। সুজনের (আমার ভায়ের) দেড় বছরের খোকাকে (দেবরাজকে) এই প্রথমবার দেখলাম। আমার স্ত্রীকে অ্যানিমিক দেখলাম—অ্যানিমিয়া ওঁর অনেকদিনের অসুখ—এখনও মাঝে মাঝে ঐ রোগে ভোগেন।

আমার ভাই সুজনরাজের স্বাস্থ্য কলকাতায় এসে তখন ভালই আছে। আর তার স্ত্রী তুহিনিকা তো কলকাতারই মেয়ে—ভাল থাকবারই কথা। বাবাকে দু বছর পরে দেখে কিন্তু মনে হল বার্ধক্যের কিছু চিহ্ন এসে গেছে। অনেকদিন পরে নিজের লোকদের দেখলে কি রকম বদলেছে ভাল করেই বোঝা যায়।

উড স্ট্রীটের বাড়িটি খুবই সুন্দর—আর কলকাতায় খুব ভাল পাড়ায়—তবুও ধরমশালার 'কোনিয়ম' যেমন মনের মতনটি মনে হত ৫নং উড স্ট্রীট তেমনটি কখনও মনে হয়নি।

এই হ'ল বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে দু বছরের মধ্যে যত অদলবদল হয়েছে মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া। আমার নিজের শরীরটা তখন বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে (পরিশ্রমটা অতিরিক্ত হয়েছিল—দুটো থিসিস্ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখে ও তা শেষ করতে 'স্ট্রেন' নিশ্চয়ই হয়েছিল) সেইজন্য মনেও ততটা স্ফূর্তির ভাব ছিল না, হয়তো তাই এসব পরিবর্তনের ছাপ মনের ওপর

বেশী করে পড়েছিল।

মাস কতক তো বেশ রোগভোগে কেটে গেল—আর কোনও ভাল কাজেরও খোঁজ পাওয়া গেল না। কখনো শুনলাম দুয়েকটি কাজের পক্ষে আমি 'ওভার-কোয়ালিফায়েড', কখনো অমৃতসর খালসা কলেজের গোলযোগের ব্যাপার হল বিশেষ রকম অন্তরায়। শেষোক্ত কারণটি আমার সুইটজারল্যাণ্ডে 'ইণ্টার-ন্যাশানাল লেবর অরগ্যানাইজেশনে' কাজ পাবার আশায় বাধা দিল। ওখানে যাবার সম্ভাবনাটা ভালই ছিল, কারণ কলকাতায় 'Clow' সাহেব আমার ফ্রেঞ্চ-ভাইভা পরীক্ষার পর নিজেই আশা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভারতে ঐ ভাষায় যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাঁর মধ্যে আমারই 'রেজল্ট' সব চেয়ে ভাল হয়েছিল। যা হোক সব চেয়ে যার জন্য আমার মনে দুঃখ হয়েছিল তা হ'ল রবি-ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে জাভা, বালী (বলী দ্বীপ) যাবার জন্যে ডেকেছিলেন—তখন আমার শরীরটাও তত ভাল ছিল না, আর কিছুদিন পরে জেনেভা যাবার তখনও সম্ভাবনা ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম না—আমার বন্ধু সুনীতি চাটুজ্যে গেলেন। রবি ঠাকুর একদিন আমায় বলেছিলেন—'বিজন, জেনেভার মোহে পড়ে তুমি জাভা, বলী গেলে না।' আমার জেনেভাও হল না, বালীও হল না।

এই রকম করে দেড় বছর কেটে গেল। এর মধ্যে একটি কাজ করতে পেরে-ছিলাম। আমার ইণ্ডিয়ান কালচারাল ইনফ্লুয়েন্স ইন ক্যাম্বোডিয়া প্রখ্যাত ঐতি-হাসিক স্যার যদুনাথ সরকার পছন্দ করেছিলেন। তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর। তিনি ক্যালকাটা যুনিভার্সিটি প্রেস থেকে ঐ ক্যাম্বোডিয়ার উপর থিসিস ছাপিয়ে দিলেন। জাভা, বালীর উপর যে নোট লিখেছিলাম কলকাতার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর ভারত সোসাইটি সেগুলি একটি বুলেটিন আকারে প্রকাশিত করলেন। এ দুটি বইয়েরই বেশ কদর হয়েছিল। বিলাতে স্যার ডেনিসন রস ও দেশে স্যার যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এর ভাল সমালোচনা করেছিলেন। সেই সময়—যখন কোনও কাজ পাচ্ছিলাম না—তখন এই দুটি বইয়ের জন্য যে খানিকটা খাতির পেয়েছিলাম সেটা সে দুঃসময়ে মনে অনেকটা সান্ত্বনা দিয়েছিল।

উর্দুতে একটা প্রবাদ আছে 'খোদা যব দেতা হয়, তব ছপ্পর ফোড়কে দেতা হয়।' ১৯২৮এর শেষের দিকে আমার কাজকর্মের বিষয়ে তাই হল। বিরলারা তাঁদের আদিনিবাস পিলানির ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন।

আমি যেন সেখানে গিয়ে ওটিকে ডিগ্রী কলেজ করি। কিছুদিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টে' রীডরশিপের 'অফার' এল (দু বৎসরের জন্য)। তার দু-এক সপ্তাহ পরে মীরট কলেজের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের হেডসিপ খালি হল। আমার শ্বশুরমশাই মীরটেই বাড়ি করেছিলেন, রিটায়ার হবার পর। আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা তখন মীরটে। আমারও মীরটই পছন্দ হল। মীরট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন কর্ণেল ও'ডনেল, আয়ারল্যাণ্ডের লোক। তিনি ওসব অমৃতসর পুলিস রিপোর্ট প্রভৃতির পরোয়া করেন না। আমার মীরট কলেজের কাজটিই হল। আমি অক্টোবর ১৯২৮-এ ঐখানে ইতিহাস বিভাগেব কাজ আরম্ভ করলাম। চোদ্দ বছর ঐ ইতিহাস বিভাগের 'হেড' ছিলাম —তারপর ১৯৪২ সালে কর্ণেল ও'ডনেল রিটায়ার করবার পর আমাকে মীরট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ দেওয়া হয়। দশ বছর ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা করে ১৯৫২ সালে আমিও ঐ কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করি। চব্বিশ বছর আমি মীরট কলেজে কাজ করেছি। কলেজ ছাডবার পর আরও ১৯ বছর হয়ে গেল মীরটেই আছি। আর বোধ হয এইখানেই জীবনের শেষ অধ্যায় শেষ হবে।

যা হোক এখন সেই বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথায় ফিরে যাওয়া যাক। ইতিহাস বিভাগে আমার একটা অসুবিধা হল যে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে (মীরট কলেজ তখন আগ্রা য়ুনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (এনশ্যেন্ট ইণ্ডিয়া) পড়াই হত না। মধ্যযুগের (medieval period) চর্চাই এ অঞ্চলের ঐতিহাসিকদের ও ছাত্রদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আমার ঝোঁক ছিল প্রাচীন ভারতের ওপর ও ঐ বিষয়েই কাজও করেছি। কিন্তু মধ্যযুগের এ বন্ধন থেকে বেরুতে আমার প্রায় সাত-আট বছর লেগেছিল। এ সময়টা আমি ইয়োরোপীয় ইতিহাসের ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব (আমার খুবই প্রিয় পাঠ্য বিষয়) নিয়ে কাজ করে গেলাম। অবশ্য ইয়োরোপীয় ইতিহাসের (ইংলণ্ডের ইতিহাসের জায়গায়) আরও কোনও অংশ ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানেরও কিছু কাজ করতাম। ইংলণ্ডের ইতিহাস তুলে দিয়ে তার জায়গায় ইয়োরোপীয় ইতিহাসপড়ানো আমি প্রিন্সিপ্যাল ও'ডনেল সাহেবকে বলে আমাদের এই বিভাগে (ইতিহাস বিভাগে) বড় রকম পরিবর্তন করতে পেরেছিলাম। ও ডনেল সাহেব এ বিষয়ে যা বলেছিলেন—আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। "ইংলণ্ডের ইতিহাসের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সব দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়।" ও'ডনেল ছিলেন আইরিসম্যান; কোনো ইংরাজ শিক্ষক এ কথা বলতেন না।

প্রঃ বোসমল্লিক (জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক) আমাদের কলেজের একজন প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন। মধ্যযুগের (মুসলিম পিরিয়ড) ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁরই বড় ছেলে শ্রীসুবোধ বসুমল্লিক, আই, এ, এস, দিল্লীতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছেন। ইতিহাসের পাঠ্যতালিকা থেকে রাজনীতি শাখা বের করে নিয়ে প্রঃ বোসমল্লিককে তার (পলিটিক্সের) 'হেড' করে দিয়ে এই দুই বিভাগের কাজেই বেশ উন্নতি হল, আর মল্লিক মশাইও তাঁর যোগ্য পদ পেলেন।

দুঃখের বিষয় এই সময়েও কলেজের দুজন প্রবীণ শিক্ষক মল্লিক মশাই আর অঙ্ক বিভাগের মদনমোহন আগ্রা যুনিভার্সিটির সিনেট প্রভৃতিতেও কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে নিজের নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায় বেশ দলাদলির সৃষ্টি করেছিলেন। আরও দুঃখের বিষয় যে আজ (চল্লিশ বছর পরে) এই রকম দলাদলি বড় বেশীরকম বেড়েছে—আর কেবল শিক্ষকদের মধ্যে নয়, কলেজগুলির কর্তৃপক্ষদের মধ্যেও সাংঘাতিক রূপে দেখা দিয়েছে। আর এর ভয়াবহ পরিণাম যে এই ঝগড়াঝাঁটির আবহাওয়া ছাত্রমহলেও খুব বেশী রকম ঢুকেছে। আজ সমস্ত দেশটায় যে স্কুল-কলেজগুলি একটা বিক্ষোভের ঝড়ের মধ্যে পড়েছে—এর জন্য দায়ী শিক্ষক ও কলেজ-স্কুলের কর্তৃপক্ষ, এঁদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ছাত্র সম্প্রদায় বিদ্যাচর্চা ছেড়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে! এই বিষবৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত না করলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আজ এই বিষ খুব ছড়িয়েছে—চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে এর লক্ষণ নিশ্চয়ই ছিল—তবে তখন ছাত্রেরা পড়তো, স্কুল-কলেজে রক্তপাত হত না—পরীক্ষাগুলি নির্বিঘ্নে আরম্ভ ও শেষ হত। এর প্রতিকার কেমন করে করতে হবে, এর জন্যে রীতিমত বিপ্লব রাষ্ট্রে ও সমাজে দরকার হবে কিনা—এইটিই হল আজকের বিষম সমস্যা। এ সমস্যার ঠিকমত সমাধান না হলে আমাদের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

১৯৩০ সালে শ্বশুরমহাশয় মারা গেলেন। ৺শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর প্রদেশের District ও Session Judge ছিলেন। অবসর গ্রহণের কয়েক বছর পরই হৃদরোগে ভুগছিলেন। ওঁর সম্পত্তির ব্যবস্থা তাঁর 'উইল' অনুসারে আমার ও তাঁর বড় দৌহিত্রের—শ্রীঅনিলদেব মুখোপাধ্যায়ের উপর, ন্যস্ত হয়েছিল।

শ্বশুরমহাশয় উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু পরে ঐ পরিবারটি উত্তরপ্রদেশে চলে আসেন। বেরেলী, এলাহাবাদেই হয়েছিল ওঁদের কর্মস্থল।

ওঁদের মধ্যে দুজন—পিতা ও পুত্র—ও ঐ বাড়ির একজন জামাতা U. P. High Court-এর judge হয়েছিলেন (স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়)। মীরটের নামী ডাক্তার প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার শ্বশুরমশায়ের ভাইপো। প্রবোধনাথের ছোট ভাই সুবোধনাথ আমার পরম সুহৃদ ছিলেন—মীরটে বছর কুড়িক ওঁর সাহচর্য পেয়েছিলাম। মীরটে ওঁকে জানতো না এমন লোক খুব কমই ছিল।

সুবোধদাই আমাকে সার সীতারামের সঙ্গে পরিচয় করে দেন। সার সাহেব (ওরফে পণ্ডিতজি) হলেন মীরটের Premier Citizen—শহরের সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে পণ্ডিতজি বলতো কারণ তিনি সংস্কৃতের উচ্চ পরীক্ষায় বোধ হয় শাস্ত্রী পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। U. P. Legislative Assemblyর President ছিলেন পণ্ডিতজি—আর রাজনীতিতে মধ্যপন্থী ছিলেন বলে অনেক তীব্র সমালোচনাও তাঁকে ভোগ করতে হত তবে মীরট কলেজটিকে সত্যই ভালোবাসতেন—কলেজের তিনি 'ওল্ড বয়েজ'দের অগ্রণী ছিলেন ও অনেকদিন কলেজের Hony. Secretary ছিলেন। তখনকার দিনে Hony. Secretary অনেক সময় প্রিন্সিপালের, সাহেব প্রিন্সিপালেরও সমকক্ষ বা তারও বেশী হতেন ক্ষমতা ও প্রভাবে। পণ্ডিতজি বাঙলা জানতেন—আর আমার সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়েছিল।

বাবা আমার বড় ছেলে বিজুকে বড় ভালবাসতেন, আর চিরকালটা পশ্চিমে কাটিয়ে কলকাতায়ও একনাগাড়ে বেশীদিন থাকতে পারতেন না। প্রায়ই মীরটে আসতেন, বিজুকে পড়াতেন আর এখানে অনেকের সঙ্গে বেশ ভাবসাব করেছিলেন। কলকাতায় ও তারও আগে লাহোরে তিনি বাঙলায় নাটক ও উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেছিলেন। অনেকদিন তাঁর এরকম লেখা চলেছিল—তার অনেকগুলি ছাপিয়েও ছিলেন। তাঁর মণিমহেশ বইটি, এর বছর আট-নয় আগে ধরমশালায় লেখা, ঐ অঞ্চলেরই গদ্দীদের পুরনো কথা-কাহিনী নিয়ে একটি বড় গল্প, আমাদের খুব ভাল লাগতো। তবে সবচেয়ে ভাল লাগতো আরো অনেক দিন আগের কথা, যখন লাহোরে বাবা কোনো ভাল বই থেকে (স্কটের Quentin Durward ডুমার মন্টিক্রিস্টো, উর্দু ভাষার বাহার দরবেশ, প্রভৃতি) খানিকটা পড়ে শোনাতেন আর তারপর গল্পটা বেশ সবিস্তারে বলতেন। এইরূপে বাঙলা, ইংরাজি, সংস্কৃত, ইত্যাদি সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু রত্নের সঙ্গে আমাদের অল্প বয়সেই পরিচয় হয়েছিল। যাকে বলে a born teacher, সত্যিই বাবা তাই ছিলেন।

শেষের দিকে (১৯৩৪-৩৬ সালে) 'ব্লাড্ প্রেসারে'র দরুন অসুস্থতার জন্তে আর মীরটে আসতে পারেন নি—আমরাই কলকাতায় (৫ উড্ স্ট্রীটে) ছুটির সময় তাঁর কাছে যেতুম। আমার ছোট ভাই—Dr. S. R. Chatterji, M. D. (Durham University) ওঁর চিকিৎসা করেছিল, আর গোড়ার দিকে এ চিকিৎসায় বেশ উপকারও হয়েছিল। তবে বার্ধক্যের দুর্বলতা আর ব্লাডপ্রেসারের দরুন ১৯৩৬ সালে কার্তিকী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর জন্মও একাত্তর বছর আগে ঐ কার্তিকী পূর্ণিমায় হয়েছিল।

আমার কেবল লেখাপড়া নয় (অর্থাৎ সাধারণতঃ যাকে লেখাপড়া বলা হয়) বাবার কাছে তার চেয়ে অনেক ভাল বিষয়ে ভাল শিক্ষা পেয়েছিলাম। ছেলে-বেলাতেই বুদ্ধের জীবনী ও তাঁর ধর্মের সঙ্গে একরকম পরিচয় হয়েছিল, মা ও বাবার কাছে 'অমিতাভ' প্রভৃতি বই পড়া শুনে। তাঁদের একটি কথা বেশ মনে আছে যে বুদ্ধদেবের বাণী জগতে প্রথম মানুষকে জানিয়েছিল যে মানুষ শুধু তার নিজের চেষ্টায়—কারও সাহায্য না নিয়ে—নির্বাণ বা মোক্ষ (সকল সাধনের কাম্য লক্ষ্য) লাভ করতে পারে। অবশ্য অনেক পরে শ্রাবকযান (বা হীনযান) ও মহাযান বোঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি হলে পরে মহাযান (ভক্তি ও করুণা) হীনযানের (জ্ঞান ও নিবৃত্তির) চেয়ে অনেক বেশী মনের মত বোধ হয়েছিল।

একটি দিকে কিন্তু এখনও আমার এ সব বিষয়ের ধারণা অন্যরূপ রয়ে গেছে। বাবার শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময়। আমার কিন্তু অনেকদিন থেকে মনে হয়েছে ঈশ্বর মঙ্গলময় কিন্তু সর্বশক্তিমান নন। সর্বশক্তিমান হ'লে জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেন ? অনেকদিন থেকেই এই ধারণাটা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আর সব ব্যাপারেও যেমন, এদিকটাতেও সেই রকমই এক বিপুল বিবর্তন চলছে। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এক বিরাট শক্তির প্রবাহ (শক্তিটি শুভ বা শিব) একটি স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যে পৌছলে শক্তিটি পূর্ণতা লাভ করবে—তখন ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময় ও সর্বশক্তি-মান হবেন—সম্পূর্ণ হবেন। তিনি আমাদের সবার সঙ্গেই এদিকে এগুচ্ছেন। আমরা যখন জেনেশুনে পাপ করি তখন কেবল আমাদের নয় ঈশ্বরেরও অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। এ বিরাট বিশ্বস্রোত সবাইকে নিয়ে পূর্ণতা ও চরম উৎকর্ষের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ও কোনো-না-কোনো যুগে এই দিব্য পরিণতিতে পৌছবে। এখন চলছে একটা Transitional Stage—পরীক্ষার মাঝামাঝি স্তর, দুঃখ কষ্ট বাধা বিঘ্ন সহ্য করে এগিয়ে যাবার। ঈশ্বর ও আমরা এখনও

অপূর্ণ—আমরা ওঁরই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করবো ঐ বিরাট শক্তির (ওঁরই এগিয়ে যাবার শক্তির) জোরে। আমি ফিলসফার নই, ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে কমই পরিচয়—তবে কি রকম করে জানি না এই বিশ্বাস ছাড়তে পারছি না আর বোধ হয় পারবোও না। বছর দুয়েক আগে ৺ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের—সত্যিকার এক মহাপণ্ডিতের—জীবনীতে তাঁর এই রকম একটি সিদ্ধান্তের আভাস পেয়ে বড় আনন্দ বোধ করেছিলাম।

বাবা বলতেন মানুষ মাত্রেই তার নিজের একটা ধারণা করে নেয় এই সব যাকে বলে আধ্যাত্মিক-ব্যাপারের। এইটিকেই কি তার 'স্বধর্ম' বলা যেতে পারে ? তাহলে আমার স্বধর্ম হ'ল 'God is in the making and along with him we too are attaining the good—the perfect stage of all that is imperfect now.'

যা হোক এসব আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমার মত অজ্ঞ লোকের মতামত মোটেই গ্রাহ্য নয়—এইখানেই এ আলোচনা শেষ করা যাক।

কলেজের কথা—আমার ওখানকার সহকর্মী ও বন্ধুদের কথা কিছু না বললে এই স্মৃতিকাহিনী অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। কর্নেল ও'ডনেলের উল্লেখ আগেই করেছি—তিনি ইংরাজি পড়াতেন আর তাঁর সবচেয়ে শখের কাজ ছিল University Training Corps—এখন যাকে N. C. C. বলা হয়। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন U. T. C.র প্রধান—আর তাঁর তত্ত্বাবধানে মীরট কলেজের U. T. C.র বেশ নাম ছিল। শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদা তখনও খুবই ছিল (এখনও খানিকটা আছে) সুতরাং ইউরোপিয়ান প্রিন্সিপালকে কলেজ চালানোর কাজে বেশী অসুবিধা পেতে হত না। বিশেষতঃ কমিশনার (কলেজ কমিটির প্রেসিডেন্ট) কলেক্টার (কমিটির ভাইস্-প্রেসিডেন্ট) এঁরা সব ইংরেজই হতেন। কমিটির দেশীয় মেম্বারেরাও সাদা চামড়ার খাতির করতেন (অবশ্য দু-একজন ছাড়া)। তবে কর্নেল ও'ডনেল নিজে এই 'বর্ণ'সমস্যার অন্যায় প্রয়োগ করতেন না।

আমার সহকর্মী অধ্যাপকদের মধ্যে দু-একজনের একটু বিশেষত্ব ছিল। নন্দলাল ইকনমিক্সের 'হেড' ছিলেন। নিজেকে পুরো নাস্তিক বলে জাহির করতেন, খুব ভাল পড়াতে পারতেন—যদিও ছাত্রাবস্থায় কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি, শিক্ষকমণ্ডলীর নিজেদের মধ্যে দলাদলিতে (তখনও এটা এত উগ্র-ভাব নেয়নি) সতেজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর নিজে যেমন ভোজনবিলাসী

ছিলেন তেমনি বন্ধুবান্ধবদেরও ভাল খাওয়াতেন। আমার চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতায় একমাত্র নন্দলালকেই খোলাখুলি ভাবে ও'ডনেল সাহেবকে রূঢ় সম্ভাষণ করতে শুনেছি। কেন তা জানি না, আমার সঙ্গে নন্দলালের কখনো ঝগড়া হয়নি—বরং বেশ সদ্ভাবই ছিল। অনেকদিন পরে (যখন আমি সতেরো-আঠারো বছর কলেজ ছেড়েছি) একজন ঐ কলেজেরই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে প্রফেসর নন্দলালকে অমন ঠাণ্ডা করে রাখা আর তো কেউ পারেনি।

অধ্যাপক চাঁদ বাহাদুর লাহোরে আমার সঙ্গে এম. এ. (ইতিহাস) ক্লাসে ছিলেন, তার ষোল বছর পরে মীরট কলেজে আবার আমাদের এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হয়। তারপর চল্লিশ বছর আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

তাম্মাজি ফিজিক্সের প্রফেসর—গোঁড়া অন্ধ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। উনি আমাদের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন,—আর অত গোঁড়ামি সত্ত্বেও সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। তিনি তাঁর ফিজিক্স ল্যাবরেটরীর জন্য অনেক রকম অ্যাপারেটস্ তৈরী করতেন আর এই দক্ষতার জন্য এ প্রদেশে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তাম্মাজির অকালমৃত্যু না হলে আমাকে আর প্রিন্সিপ্যাল পদের দুর্ভোগ ভোগ করতে হত না।

বাঙালী বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে মল্লিক মশায়ের কথা আগেই বলেছি।

যদুবাবু (প্রঃ যদুনাথ সিংহ। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, পি. এইচ. ডি.) ফিলজফির হেড ছিলেন। পণ্ডিত ছিলেন, লেখক ছিলেন। এখনও তাঁর বছরে দু-একখানি বই কলকাতায় তাঁর নিজের প্রেস থেকে ছাপা হচ্ছে। আর নির্ভীকও ছিলেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে তাঁর মসীযুদ্ধ বেশ কিছুদিন চলেছিল—পরে বিচারালয়ে এর আপোসে মিটমাট হয়ে যায়। রাধাকৃষ্ণনজি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম জর্জ প্রফেসর আর যদুবাবু তাঁর কাছে কিছুদিন আগেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির পরীক্ষার্থী ছিলেন। এই পরীক্ষার থিসিস নিয়েই দুজনে খুব ঝগড়া হয়।

প্রিয়কুমার গোস্বামীর (ইংরাজি বিভাগের) অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী, ছেলে শ্যামল (১৯৬২র লদাখের লড়ায়ে মহাবীর চক্র পেয়েছে), মেয়ে অশোকা (মীরট এন. সি. সি.তে মেজর) প্রভৃতি আমাদের কেবল বিশেষ পরিচিত নন—আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে আরও নিকট-সম্বন্ধ আছে। আমার ছোট জামাই কাপ্তেন কৈলাসনাথ লাহিড়ী অশোকার মা অমলাদেবীর মামা।

ঐ ইংরাজি বিভাগেরই আরও দুজন—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও যোগেশ-চন্দ্র বিশ্বাস (দুজনেই এখন পরলোকে)—আমাদের বাড়ির অনেক ছেলে-মেয়েদের ইংরাজি সাহিত্য বিষয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন। দুজনেই ঐ বিষয়ে নামকরা শিক্ষক। একজন, মুখুজ্যে, একটু বেশী সেন্টিমেন্টাল আর অন্যটি, বিশ্বাসমশাই, খুব প্র্যাকটিক্যাল লোক। দুঃখের বিষয় এ দুজনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না আর এই কারণে বিশ্বাস ইংরাজি বিভাগের যখন 'হেড' হলেন মুখুজ্যে রাগ করে মীরট ছেড়ে দিলেন। অনেক ঘুরলেন, বছর দশেক আগে একবার মীরটে এসেছিলেন তখন তিনি উড়িষ্যা পৌছেছেন চাকরির সন্ধানে। বেচারীর পারিবারিক জীবন বড় দুঃখের। একে একে তাঁর পরিবারের সবাই (একটি ছেলের কথা জানি না, সেটি ছাড়া) টাইফয়েড রোগে মারা যায়। ভদ্রলোকটি তো আট-ন বছর হল মারা গেছেন।

বিশ্বাস মশাই অবসর গ্রহণের পরও পরীক্ষক (অনেক রকম পরীক্ষায়) হয়ে ও কোচিং করে বেশ রোজগার করছিলেন—হয়তো অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই বছর দেড়েক হল মারা গেছেন (১৯১০ সালে)।

আর একজনের কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। মীরট কলেজের সংস্কৃত বিভাগের 'হেড' ডাঃ ধর্মেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী একসময়ে আর্যসমাজী হয়েও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নয়, "বাই বিট্ অভ ড্রাম" (by beat of drum) বৌদ্ধ। সত্যিকার বিদ্বান হয়েও বেশীরকম ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন। আর একটু বেশী মাত্রায় কলহপ্রিয়। লোকটির গুণও আছে আর দোষও আছে। সংস্কৃত বিভাগে আজীবন কাজ করেও একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার মালিক হয়েছেন। কত রকম কাজে তিনি হাত দিয়েছেন (ভাল ও মন্দ) বলতে পারি না—তবে সব কাজেই তাঁর উদ্যম ও অধ্যবসায় অফুরন্ত। তাঁর বন্ধুও অনেক, শত্রুও অনেক।

এ রকম বিচিত্র স্বভাবের সহকর্মীদের সঙ্গে চব্বিশ বছর কাজ করেছি। আর আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে বেশ মিলেমিশে, বেশ ভাল ভাবে এত বছর কাটিয়েছি। কারুর কারুর সঙ্গে বেশী বন্ধুত্ব নিশ্চয় ছিল—কিন্তু কারুর সঙ্গে শত্রুতা নিশ্চয়ই ছিল না।

এবার কলেজের কর্তৃপক্ষের দু-একজনের (এঁরা কলেজের Hony Secretary ছিলেন) বিষয় না বললে আমি অকৃতজ্ঞ বলে নিজের বিবেকের কাছেই অভিযুক্ত হব। প্রথমে বলতে হবে সার্ সীতারামের কথা—আগেই তাঁর উল্লেখ করেছি। তাঁরই আমন্ত্রণে মীরট কলেজে ইতিহাস বিভাগে প্রধান হয়ে

ঢুকেছিলাম—তাঁরই চেষ্টায় ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলাম। যতদিন তিনি কলেজের অনারারি সেক্রেটারি ছিলেন—ততদিন কলেজ-কর্তৃপক্ষের দিক থেকে আমার কোনো আপদবালাই ছিল না। তাঁর কথা ইংরেজ কমিশনার বা কলেকটার (যাঁরা কলেজের প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন) প্রায় নির্বিবাদেই মানতেন। তবে উনি রাজনীতিতে নরমপন্থী বলে ও তাঁর সার্ উপাধি থাকায় জনসাধারণের কাছে তাঁর যোগ্য যশ ও মান পাননি। সার্ সাহেব বা পণ্ডিতজি, এ দুই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্যে এম. এ. ছিলেন, বাঙলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শেষ বয়সে অনেক শোক পেয়েছেন—এখন অন্ধ হয়ে গেছেন। ভগবানই জানেন কেন এ রকম লোকের এত দুর্ভোগ হয়।

১৯৭২ সালে মে মাসে পণ্ডিতজি মারা গেছেন।

ঠিক এর উল্টো ছিলেন আর একজন অনারারি সেক্রেটারী—ডাক্তার ভূপাল সিং। ইনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত, খদ্দরধারী, রাজনীতিতে চরমপন্থী। একবার কমিশনার (কলেজের প্রেসিডেন্ট) কলেজের কোনো একটা নিয়ম বদলাতে চাচ্ছিলেন—অনারারি সেক্রেটারি এটা মোটেই চাইতেন না। কমিশনার সাহেব মীরট ডিভিসনের গুটি তিনেক কলেক্টারকে ডাকলেন মিটিংয়ে—আর ভূপাল সিং ডাকলেন বেসরকারী যত মেম্বারদের। আমাকে অনারারি সেক্রেটারি একদিন চুপি চুপি বলে গেলেন যে Erskineএর Parliamentary Procedure দেখে তাঁর মতের অনুকূল সব পয়েন্টস্ যেন তাঁর জন্যে তৈরি রাখি। যা হোক, মিটিংয়ে খুব ধুমধাম হলো—আর বেশ কয়েকটা ভোটে ভূপাল সিংজিরই জিৎ হলো। সেদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে—(অবশ্য এই আনন্দ প্রকাশ্য ভাবে প্রকাশ পায়নি) ভূপাল সিংজি বেশ রাগী লোক ছিলেন—তবে আমার সঙ্গে তাঁর এমন কিছু মনোমালিন্য হয়নি। কয়েক বছর পরে খুব ভাবই হয়েছিল।

আর একজন অনারারী সেক্রেটারী শেঠ রামেশ্বর প্রসাদ আমার বন্ধুই ছিলেন—তাঁর সঙ্গে অনারারী সেক্রেটারী ও কলেজের কর্মচারীর সম্বন্ধ ছিল না। তিনি যখন সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন, আমি তখন প্রিন্সিপ্যাল হয়েছি। দুজনে বেশ মিলেমিশে কাজ করতে পেরেছিলাম বলে কলেজেরও বেশ উপকার হয়েছিল। গভর্ণমেণ্ট ও য়ুনিভার্সিটির কাছ থেকে কলেজের জন্য টাকা নেবার চেষ্টায় শেঠজি আর আমি অনেক ঘুরেছি (দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি বড় বড় জায়গায় অনেক বড়লোকের বাড়িতে প্রায় ধন্না দিয়েছি—আর অনেক সময়ে

কাজও হয়েছে)। শেঠজির অকাল মৃত্যুতে সত্যিই একজন বন্ধু হারিয়েছি।

ইতিহাস বিভাগের কাজের ভার (এ ভার ভালই লাগতো) নিয়ে চোদ্দ বছর তো (১৯২৮-১৯৪২) কাটালাম। বোধ হয় ১৯৩৯ সালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি) হিস্ট্রি কংগ্রেস উপলক্ষ্যে লাহোর গিছলাম। লাহোর থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক বন্ধুদের সঙ্গে হারাপ্পা গেলাম। রাবীর পুরানো খাদে এই প্রাগৈতিহাসিক 'সাইট' বড়ই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বিশেষতঃ ছোট ছোট মূর্তিগুলি—সেই 'ডান্সিং গার্ল', একটি দেবীমূর্তি আর পটারি (লাল, কালো—৮০০০ বছরের ঘড়ার টুকরো) এই প্রথমবার দেখলাম।

১৯৪২ সালের এক গ্রীষ্মাবকাশে সুজনের অসুখের কথা শুনে ধরমশালা গেছি, —ওখানে দিন দশ বারো থাকবার পরে টেলিগ্রাম এল যে কলেজের কাজে মীরটে ফিরে আসতে হবে। ফেরবার পথে কাঙড়ারপ্রসিদ্ধ মন্দির(১৯০৫ সালে ভূমিকম্পে ধ্বংস হবার পর লাহোর ও অমৃতসরের ধনী হিন্দুদের দ্বারা এ মন্দির পুনর্নির্মিত হয়েছিল) এই প্রথমবার দেখলাম আর কাঙড়া থেকে আর একটু এগিয়ে এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরানো মন্দির বৈজনাথ (বৈদ্যনাথ) দর্শন করলাম। বৈজনাথ মনে রাখবার মতন জায়গা। এর পেছনে ধওলাধার এক মহান বিরাট ব্যাপার। ফেরবার পথে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে নেমেছিলাম 'জ্বালামুখী' মন্দির দেখবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুপুরবেলা স্টেশন এত গরম বোধ হয় যে দু-তিন মিনিট পরেই আবার গাড়িতে চড়ে বসলাম আর সোজা অমৃতসরে নামলাম। একটি দিন খালসা কলেজে ঘুরে (পণ্ডিত অর্জুনদেবের অতিথি হয়ে) আঠার বছর আগের নিজের কর্মভূমি ও বাসস্থান দেখে এলাম। বোধ হয় আর কখনও দেখা হবে না।

মীরটে ফিরে এসে শুনলাম যে কর্ণেল ও'ডনেল রিটায়ার করেছেন। ষাট বছরের উপর তাঁর বয়েস হয়েছে, আগ্রা য়ুনিভার্সিটি নাকি আর এক্সটেনশন দিচ্ছেন না। আর সার্ সীতারাম প্রভৃতি কর্তৃপক্ষীয় কর্তারা আমারই নাম ঐ পদের জন্য প্রস্তাব করেছেন। যদিও সার্ভিস হিসাবে আমার চেয়ে কয়েকজন সিনিয়র আছেন, তবে মাহিনা ও 'অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেসনস'-এর জন্য তাঁরা আমাকেই মনোনীত করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই কলেজ কমিটির অধিবেশনে আমাকে মীরট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে নিযুক্ত করা হল (আগস্ট ১৯৪২)।

মীরট কলেজে অধ্যক্ষতা

এবার জীবনের আর এক পর্ব আরম্ভ হল। মীরট কলেজে এর আগে কখনো দেশী অধ্যক্ষ হয়নি। আমাকে নিয়েই নতুন 'এক্সপেরিমেণ্ট' করা হল। দশ বছর (১৯৪২-৫২) কলেজের প্রিন্সিপ্যালশিপ পিরিয়ডের কথা আরম্ভ করবার আগে কিছু বাড়ির খবর বলা দরকার। এ সময়ে আমার বড় ছেলে শ্রী বিজয়রাজ এম. এ. পাস করেছে, কিছুদিন ধরে ইউ. পি.র (U.P.র) ('যুক্তপ্রদেশ'—ইউনাইটেড প্রভিন্সেস) আদি পর্বের উপর—কি করে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ হল—রিসার্চ করেছিল। মেজ ছেলে শ্রী রাজরাজ স্থানীয় নানককন্দ স্কুলে পড়ছিল। সবায়ের ছোট শ্রী নটরাজ তখন ছয় বছরের। বড় মেয়েটির—অমিতার—এর আগের বছর (১৯৪১) বিয়ে হয়ে গেছে। উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা মুখুজ্যে বংশের ছেলে শ্রী বিজলীভূষণ হলেন আমার জামাতা। ছোট মেয়ে মানসী'র বিয়ে এর তিন বছর পরে হয়েছিল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সময়।

১৯৪৩ সাল পর্যন্ত আমরা বেগমপুলের 'রমা মন্দিরে' (শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বাড়িতে) থাকতাম। ঐ বছর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাঙ্‌লোতে চলে এলাম আর ১৯৫২ পর্যন্ত ঐখানেই ছিলাম। অনেকদিনের শখ মনের মতন বাগান করা—ওখানে মেটানো হল। জমি ছিল, জল ছিল আর ভাল মালি ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে কলেজ বাঙ্‌লো ফুলের জন্য সাহেব কলেক্টর ও কমিশনরদের বাঙ্‌লোর সঙ্গে টেক্কা দিতে পেরেছিল।

কলকাতায় আমার ছোট ভাই ডাক্তার সুজনরাজের শরীর কয়েক বছর থেকে খারাপ যাচ্ছিল—রাঁচির স্যানাটোরিয়ামে কয়েক মাস থেকে মধ্যে বেশ উপকার হয়েছিল—আবার নিজের প্র্যাকটিস ৫ উড স্ট্রীটে শুরু করতে পেরেছিল। আমার ভাইপো শ্রী দেবরাজ তখন কলকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার স্কুলে পড়ে। আমার জাঠতুত ভাই সনৎকুমার (রায়বাহাদুর সনৎকমার চট্টোপাধ্যায়) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'ল' প্রফেসর ও কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট (সমবায় উদ্যোগ)-এর ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সনতের ছেলে বাদল (শক্তিকুমার) তখন

খুব রোগা, ধব্ধবে ফর্সা ছোট্টটি ছিল। আমার মেজদার (পিস্তুতো ভাই মন্মথ মুখুজ্যের) ছেলেরা তখন (মেজদাদা মারা যাবার পরে) লাহোর ছেড়ে আমাদের কাছে মীরটে আছে। বড় ছেলেটি—শ্রী অমরনাথ—দিনকতক অন্য অন্য জায়গায় কাজ করে পরে অর্ডন্যান্স ডিপার্টমেন্টে ঢোকে—এখন ঐখানে বেশ ভাল পোস্টে আছে। ছোট ছেলে শ্রী সমরনাথ বেনারস বিশ্বালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে দু-এক জায়গায় ভাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল। আমার কাকাবাবুর (৺অসিতচন্দ্রের) ছেলেরা বারাসতে 'কৈলাসপুরী'তে (আমার ঠাকুরদাদা ৺কৈলাসচন্দ্রের বাড়ি) আছে। ছোটকাকা ৺গোবিন্দচন্দ্রের দুই মেয়ে—ছোট মেয়ে শ্রীমতী উমা দেবী বারাসতের মেয়েদের ইণ্টার কলেজের প্রিন্সিপাল। ছোটকাকার বড মেয়ে শ্রীমতী বাণী দেবী'র মেয়ে রেবাও ভাল করে এম. এ. পাস করে কোনো এক কলেজে লেক্চারার হয়েছিল। এখন বিয়ে করে গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত আছে।

এবার আমার 'অধ্যক্ষগিরি'র প্রথম ধাক্কার কথা বলি। এদিকে একটি কথা বেশ প্রচলিত আছে—'সির মুনাতেহি ওলে পড়ে' [মাথাটি মুড়ুলাম আর শিলাবৃষ্টি (মাথার ওপর) আরম্ভ হল]। আমারও ঠিক সেই রকম অবস্থাটি হ'ল। আমি 'অধ্যক্ষ' হলাম জুলাইয়েরশেষ (১৯৪২ সাল) আর কুইট্ ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট (ভারত থেকে বেরোও) শুরু হ'ল অগাস্টের গোড়াতেই। সেকী তুমুল আন্দোলন! বেহারে তো রেলগাড়ির যাতায়াত কিছুদিনের জন্য বন্ধ হ'ল। আর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তো বিষম বিক্ষোভ। সোজাসুজি স্ট্রাইক নয়—একেবারে স্কুল-কলেজ বন্ধ করবার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা। আমি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় দল কলেজ অফিসের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলুম। তারা বললে যে আমার দেশের এ দুর্দিনে (তখন গান্ধীজি প্রমুখ নেতারা সব কারাগারে) দেশের জন্য কিছু করতে চাই। আমিও তাদের বললাম যে আমি তো তোমাদেরই মতন এই দেশেরই লোক—আমারও এই সঙ্কটে দেশের কথা ভুলে থাকবার কথা নয়। আমি ও তোমাদের অন্য শিক্ষকেরা এ সময়ে যে রকম করে দেশসেবা করা যেতে পারে তোমাদের সেই সেবার কাজের বিষয়ে সহযোগী হ'তে চাই। সুতরাং যখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মতভেদ নেই—তখন যেন আমরা পরস্পরকে ভুল না বুঝি। আমার ও আমাদের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই সেই কুইট্ ইণ্ডিয়ার দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে আমরা এই যুবজাগরণের ঢেউটিকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচিয়ে

ঠিক ঠিক ভাবে সামলে নিয়ে যাই। কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না। এ বিপ্লবের উগ্রপন্থী নেতারা এ রকম মধ্যপন্থার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা তখন ভারত-জোড়া ধ্বংসলীলা দেখতে চান। কলেজ একেবারে বন্ধ না করে তাঁরা ছাড়বেন না—আর ছাত্রদের মধ্যে তাঁদের জোর প্রভাব ছিল। আমি ও আমাদের কয়েকজন সহকর্মী ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে তোমরা কলেজে না আসতে চাও এসো না—তবে যারা আসতে চায়, তাদের বাধা দিও না। মুসলমান ছাত্রেরা আর সরকারি কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা তো কলেজ ছাড়তে মোটেই চায় না। তারা সংখ্যাতে খুব কম নয়। আবার কলেজ-কমিটির প্রেসিডেণ্ট হলেন কমিশনার সাহেব—মিঃ-উড—একেবারে উগ্রপন্থী কট্টর ইংরাজ সিভিলিয়ান। যদি পারতেন তবে তিনি এই বিক্ষোভের নেতাদের কঠোরতম শাস্তি দিতেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালী বলে খুবই সন্দেহ করতেন। একদিন আমাকে ও প্রফেসর মদনমোহনকে তাঁর আফিসে ডেকে পাঠান—সেখানে জেলার কলেক্টর বনার্জি (ডব্লিউ. সি বনার্জির পৌত্র) উপস্থিত ছিলেন। কলেজের অনারারী সেক্রেটারী সার্ সীতারামও সে মিটিংয়ে ছিলেন। উড সাহেব এমন করে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করলেন যে আমি আর থাকতে পারলাম না। কমিশনার সাহেবকে বললাম, 'আমি আপনার চাপ্‌রাশী নই, আমি চললুম।' এই বলে বেরিয়ে এসে আমি বাড়ি গিয়ে (তখনও আমরা রমা মন্দির, বেগমপুলে থাকি) আমার প্রিন্সিপ্যালের পোস্ট থেকে ছাড়া পাবার জন্য পদত্যাগপত্র লিখলাম। কিন্তু বাড়ির সবাই (তার মধ্যে গুরুজনরাও ছিলেন) ধরে বসলেন যে ওরকম করে কাজ ছাড়লে সর্বনাশ হবে—জেল তো হবেই হবে। সার্ সীতারামও খবর পাঠালেন যে আমি 'রিজাইন' না করি। আমার আর পদত্যাগ করা হল না। তারপর অনেকবার ভেবেছি যে তখন প্রিন্সিপ্যালের পদ ছেড়ে যদি ফের ইতিহাস বিভাগে ফিরে যেতাম তা হলে ভালই হত, মনে কোনও খেদ আপসোস থাকত না। দু-এক দিন একটু শান্ত আবহাওয়ার পর আবার দারুণ ঝড় উঠলো। একদিন সকাল বেলা আমি ডিরেক্টর অফ এডুকেশন (ইউ.পি.)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর অফিস থেকে যাই ফিরেছি তখুনি কলেজের অধিকাংশ ছেলে হঠাৎ কলেজ-অফিস আক্রমণ করলো। আমি প্রায় একলা ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করেছিলাম। সে যেন রীতিমত ফুটবলের ম্যাচ—খুব জোর ধাক্কার পর ধাক্কা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামলালাম। সেই সময় কোনও একজন প্রফেসর আমাকে বললেন যে কতক্ষণ এরকম চলবে—পুলিসের সাহায্য নিতে হবে। দু-তিন দিন ধরে পুলিস কলেজের গেটের বাইরে জমায়েত ছিল—

ওরা যেন জানতো এ রকম একটা ব্যাপার হবে। ফোন করতেই হুদ্দাড় করে শ'খানেক পুলিস কলেজের হাতার মধ্যে হুঙ্কার করতে করতে ঢুকে পড়লো। ঢুকে জন কুড়িক ছেলেকে ধরে পুলিসভ্যানে পুরে থানায় নিয়ে গেল। কলেজ খালি হয়ে গেল—কেবল পুলিসের দল রয়ে গেল। এটা আমার জীবনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিস ঢুকলো—আর বেরুল না—মাস খানেক কলেজের মধ্যে তাঁবু গেড়ে অধিষ্ঠান করলো। তারপর মাস দুয়েক কমিশনার উড্ই কলেজ চালালেন—প্রিন্সিপাল, স্টাফ্, ম্যানেজিং কমিটি সাহেবের হুকুম অনুসারে কাজ চালালো। অনেকবার এ প্রশ্ন মনে উঠেছে—যে যখন পুলিস ডাকা হয়েছিল তখন আমাদের বলে দিতে হ'ত তাদের যে সে দিনের ছাত্রদের হাঙ্গামা শেষ হলেই তারা (পুলিস) যেন কলেজ ছেড়ে চলে যায়। যা হোক, সব গোলমাল থামলো বটে তবে ক্রীতদাস জীবন যে কেমন তা মাস দেড়েক হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। তখন অনেকবার মনে হয়েছে যে এ ঘটনার কিছু দিন আগে যখন পদত্যাগ করবার ওরকম একটি সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন প্রিন্সিপালশিপ ছেড়ে না দিয়ে কি ভুলই করেছি।

অমানিশারও শেষ আছে—উড সাহেব মীরট থেকে চলে গেলেন (যদিও যাবার সময় কলেজ-কর্তৃপক্ষদের আমার উপর কড়া নজর রাখতে বলে গেলেন) আর ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে দু'জন ভারতীয় অনারারি মেম্বার—সার্ শঙ্করণ নায়ার ও সার্ হোমি মোদি—কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন। কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টের উগ্রতম স্টেজ অহিংস অসহযোগে পরিণত হ'ল। আমরা দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেলাম। তবে আমার Webley-scott রিভলভারটি এই বিভ্রাটের মধ্যে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

মনে একটা সান্ত্বনা রইল যে আমাদের দিয়ে কোন ছাত্র বা শিক্ষককে শাস্তি দেয়ানো হয়নি। Collector Bonnerjiও বোধহয় এরূপ কিছু করতে অনিচ্ছুক ছিলেন—আমি জানি ভেতরে ভেতরে তাঁর এ ব্যাপারে কিছু সহানুভূতি ছিল—তবে উড সাহেবকে মেনে ওঁকে চলতে হ'ত। আর আমরাও কাউকে অযথা শাস্তি দেবার বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম।

এই ফাঁড়াটা কাটিয়ে—আমার শিক্ষক জীবনের বোধহয় সবচেয়ে দারুণ ফাঁড়া—আমার দশ বছরের প্রিন্সিপালশিপ পিরিয়ড্টি প্রায় নির্বিঘ্নে কেটে গেল। এর পর যে কমিশনার ও কলেক্টার—কলেজের প্রেসিডেণ্ট আর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট—এলেন তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের উদারপন্থী—কলেজের কিসে ভাল

হয় সেটা তাঁরা বাস্তবকিই ভাবতেন। দু-একজন প্রিন্সিপালেরই কথা বেশী শুনতেন—কলেজ-কমিটির মন্তব্যের চেয়ে কলেজের অধ্যক্ষেরই মতটা মেনে নিতেন। আবার একদিন এল যখন কমিশনার (কলেজ-কমিটির প্রেসিডেণ্ট) আমার অনেক দিনের বন্ধু S. S. Khera—(বিলেতে, গাওয়ার স্ট্রীটে অনেকদিন একসঙ্গে ছিলুম), মীরটে Dist. Sessions Judgeও আমার অনেক বছরের খুব জানাশোনা লোক—তখন আর সাহেবদের পর 'দিশী' লোক আর কি 'প্রিন্সিপালগিরি' করবে এরকম কথা আর শোনা যায়নি। আর এ সময় ভাল কর্মঠ 'অনারারী সেক্রেটারি'র সাহায্যে কলেজের কিছু উপকারও করতে পারা গিছলো।

ছাত্রসংখ্যা বেশী বেড়ে না যায় সেরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও কলেজে দু-তিন বছরের মধ্যে ঐ সংখ্যা হাজার তিনেক হ'ল—আরও দু-এক বছরে চার হাজারে দাঁড়ালো। আমারই চেষ্টায় মীরট শহরে দুটি ইণ্টার কলেজে বি. এ. পড়ানো আরম্ভ হ'ল। আমার ইচ্ছা ছিল যে বি. এ. ক্লাস তিনটি কলেজেই হোক—এম. এ. কেবল মীরট কলেজেই থাকুক। আজ কুড়ি বছর পরে এই কলেজগুলি মীরট কলেজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সব সময়েই প্রস্তুত—আর অনেক সময়ে অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে দিন কতক আগেও এই নতুন ডিগ্রী কলেজগুলি তাদের এই উন্নতির জন্যে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। এখন এঁরা এম. এ. ক্লাস খুলতেও কুন্ঠিত নন যদিও এঁদের লাইব্রেরি প্রভৃতি বিশেষ সুবিধার নয়।

আর এ কয়েক বছরের মধ্যে 'বটানি' 'ফিসিক্স্' প্রভৃতি এম.এস্‌সি. ক্লাস খোলা হ'ল। কিছু দিনের মধ্যেই বটানির এম.এস্‌সি. ক্লাস ডাঃ পুরীর তত্ত্বাবধানে দেশজোড়া নাম কিনতে পেরেছিল। ১৯৫২ সালে যখন আমি কলেজের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলাম তখন আগ্রা ইউনিভার্সিটির প্রায় প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ে আমাদের কলেজে বি. এ., বি. এস্‌সি., বি.কম্, এম.এ, এম.এসসি, এম. কম্ ক্লাস খোলা হয়েছে। আর যা কর্নেল ও'ডনেল (তাঁর সঙ্গে মসুরিতে দেখা হয়েছিল) নিজে আমাকে বলেছিলেন ছাত্রসংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও প্রায় সব পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা ভাল করে (কেবল তৃতীয় ডিভিসনে নয়) পাস করেছে। এখানে অবশ্য বলে রাখা উচিত যে এই রকম উন্নতি আমার সহকর্মী অধ্যাপক মণ্ডলীরই কৃতিত্ব—এ কথা বলাই বাহুল্য।

কর্নেল ও'ডনেল যে U. T. C (University Training Corps) গড়ে তুলেছিলেন তা এখন N. C. C. তে (National Cadet Corps)

পরিণত হয়েছিল। রীতিমত আর্মি অফিসাররা (গোড়ায় ইংরেজ অফিসার) কলেজে এসে ট্রেনিং দিতেন। আমার মেজ ছেলে রাজরাজ মীরট কলেজে N.C.C. থেকেই ডেরাডুন মিলিটারি একাডেমিতে যায়। এখন ও Lieutenant Colnel—শীঘ্রই full Colnel হবে।

আর একটি নতুন ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে। এসিয়ার আধুনিক ইতিহাস—বিশেষতঃ শেষ একশো বছরের—বি. এ. ইতিহাসের একটি Paper হিসাবে (Last Hundred Years in China and Japan, Last Hundred Years in the Middle East—The Arab World, Israels etc) পাঠ্য তালিকায় ঢোকাতে পেরেছিলাম। এখন এটি compulsory paper হয়েছে।

এ কয় বছর কলেজে কয়েকটি সত্যিকারের বড়লোক আসেন—আর তাঁদের আমার বাসায় (প্রিন্সিপালের বাঙ্‌লোতে) দু-একদিন রাখবার সুযোগও হয়েছিল। সার্ সি. ভি. রমণ মীরট কলেজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও বাড়ির সকলের সঙ্গে অনেককালের পরিচিতের ন্যায় মজার গল্প করেছিলেন। অত বড় বৈজ্ঞানিক যে ওরকম আমুদে হতে পারেন—তা আমাদের ধারণা ছিল না। নোবেল প্রাইজ্ নেবার সময় ইওরোপে তাঁর ভাত খাবার গল্পটি ভুলবো না। যেখানে যান বড় বড় বিদুষী মহিলারা তাঁর জন্যে ভাত রাঁধেন—ভাত গলিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে একেবারে লেট্টি তৈরি করেন। আর ওঁকে বলতে হয় চমৎকার হয়েছে। শেষে ওঁকে আগে থেকে 'হোস্ট', 'হোস্টেস্'দের বলতে হ'ল যে ডাক্তার ওঁকে কিছুদিনের জন্যে ভাত বন্ধ করিয়েছেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ তখন তাঁর পৃথিবীর সর্বত্র দিগ্‌বিজয় যাত্রা আরম্ভ করেন-নি—তবে দিল্লীতে তখন তাঁর খুব খ্যাতি। ও রকম উচ্চাঙ্গের, অথচ সাধারণের বোধগম্য, বক্তৃতা আমি তো আর কোথাও শুনিনি। উনি কয়েকবার কলেজ এসেছেন, আর আমার কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পরও মীরটে এসেছেন ও আমাদের বাড়িতেও উঠেছেন। উনিও কথাবার্তায় সন্ন্যাসীজনোচিত গাম্ভীর্য ছেড়ে দিয়ে সবায়ের সঙ্গে বেশ হাসিঠাট্টা করতে পারেন। ওঁর বাস্তবিক একটি ম্যাগ্‌নেটিক শক্তি আছে—তাতে লোকের মনের ওপর তাঁর এক আশ্চর্য প্রভাব হয়। এখন তো ওঁর জগৎজোড়া নাম।

আর এক দম্পতি—সার বেসিল ব্র্যাকেট ও লেডি ব্র্যাকেট—আমাদের কলেজের বাড়িতে অনেকক্ষণ ছিলেন। বিলেত থেকে এসেছিলেন দিল্লীতে

সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে। মীরট আর্মি হেড কোয়ার্টারে সার্ বেসিল ব্ল্যাকেটের কিছু কাজ ছিল। লেডি ব্ল্যাকেটকে কয়েক ঘণ্টা আমাদের বাড়িতে (প্রিন্সিপালের বাঙ্লোতে) থাকতে হয়। তিনি এই প্রথম এদেশে এসেছেন, আমার স্ত্রী ইংরাজিতে কথাবার্তা কইতে পারেন না, আমার বড় বৌমা মীরাও ও বিষয়ে এমন কিছু অভ্যস্ত নয়, আমাকেও কলেজে নিজের কাজে যেতে হয়েছিল—এ সব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মেমসাহেব বেশ হাসিখুশি গল্পসল্প করে দুপুরবেলাটা কাটিয়ে ছিলেন। বিকালবেলা সার্ বেসিন ব্লাকেট কলেজে বক্তৃতা দিলেন। উনি ছিলেন নিউক্লিয়ার (nuclere) ফিসিক্সের বিশেষজ্ঞ। উনি আমাদের ফিসিক্স ল্যাবরেটারির তৈরি ফিসিক্স পড়াবার apperatusও দেখে গেলেন।

এর কিছুদিন আগে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার লোহার সরঞ্জাম (কলেজের জন্য) কেনবার অনুমতি পেয়েছিলাম। উনি আমাদের কলেজের কন্‌ভোকেশনেও এসেছিলেন। ওঁর সেদিনকার Convocation Address শুনেছিল আমাদের বড় গম্বুজওয়ালা হল্‌ভতি লোক। বাস্তবিক উত্তরাঞ্চলে অল্পদিনের জন্যই এসেছিলেন —কিন্তু তারই মধ্যে উনি যেরূপ এদিকের জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তেমনটি আর কোনো বাঙালী পাননি।

১৯৫২ সালে মে মাসের গোড়ার দিকে কলেজ ছাড়লাম। বিদায়-দিনে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ও শহরের গণ্যমান্য লোকেরা আমাকে তাঁদের ভক্তির ও স্নেহের আশাতীত নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের সেদিনকার আন্তরিক স্নেহের সম্ভাষণ আমি ভুলিনি।

কলেজে থাকতে থাকতেই আমার ছোট মেয়ে মানসীর ও বড় ছেলে বিজয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে যেদিন জাপান বিশ্বযুদ্ধে হার স্বীকার করলো —সেই দিনেই শ্রী কৈলাসনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে মানসীর বিয়ে হল। কৈলাস তখন Navyর (British Indian Navy) officer—বিশ্বযুদ্ধে আরাকান coastএ নৌযুদ্ধেও উপস্থিত ছিল। এ বিয়েটি এমন তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে বলা যায় যে কৈলী (কৈলাসনাথ) জুলিয়াস সিজারের 'veni, vidi vici' (এলাম, দেখলাম, যুদ্ধ জয় করলাম)-কেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। এর বছর খানেক পরে কৈলাস-নাথ Navy ছেড়ে দিয়েছিল। ১৯৪৯এ ও মাদ্রাজ বন্দরে পাইলট নিযুক্ত হয়েছিল। ওর সমুদ্রের ধারে সুন্দর কোয়ার্টার আমরা দেখে এলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে মহাবলীপুরম্, তিরুপতি, তিরুমলাই সপরিবারে দর্শন লাভ করলাম।

দাক্ষিণাত্যে এই হ'ল আমাদের প্রথম 'অভিযান'। মহাবলীপুরমের নীল সমুদ্র, পল্লবযুগের স্থাপত্য বিস্ময়কর দৃশ্য—না দেখলে বোঝানো যায় না। কলেজের বাড়িতেই বিজয়েরও (আমার বড় ছেলের) বিয়ে হ'ল। আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল যে পুত্রবধূরা শিক্ষকদের বাড়ির মেয়ে হন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আর আমি এলাহাবাদের K. P. Collegeএর ইংরাজি সাহিত্যের প্রফেসার শ্রী নিমাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা মীরাকে দেখে এসে—সেই পাত্রীটির সঙ্গেই বিজুর বিয়ে দিলাম (১৯৫০)।

কলেজের বাড়ি ছাড়তে যা কষ্ট হয়েছিল তা ওর বাগানের জন্য হয়েছিল। বিজুও তখন বাগানের কাজে খুব মন দিত, মালীও ভাল ছিল—বাগান সব সময় ফুলে ভরে থাকতো। আমাদের Ranunculus (Butter-Cup), Cactus, Porana প্রভৃতি লোক এসে দেখে যেতো। আর ওরকম বাগান হবে না। কলেজের বাড়ির বাগানও এর পর নষ্ট হয়ে গেল—আর কেউ যত্ন করে ওটি রাখতে চেষ্টা করল না।

এর বছর খানেক পরে আমার ছোট ভাই স্বজনরাজ মারা গেল। বাবার তো বাহাত্তর বৎসর বয়েসের গোড়ার দিকে মৃত্যু হয়েছিল—স্বজন তো সাতান্ন-আটান্ন বছর বয়সেই মারা গেল—আর অনেক দিন ভুগেই গেল। খানিকটা সান্ত্বনার বিষয় যে তার একমাত্র পুত্র দেবরাজের বিয়ে দেখে যেতে পেরেছিল।

আমার জাঠতুতো ভাই সনৎকুমারও (রায়বাহাদুর সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়) ঐ বছর মারা গেল। ও আমাকে নিজের ভায়েরই মতন দেখতো। ওরও একটি ছেলেই ছিল—বাদল, ভাল নাম শক্তিকুমার।

আমরা আবার রমা মন্দিরে (বেগমপুল) ফিরে গেলাম। খানিকটা ইচ্ছে ছিল যে কলকাতায় ফিরে যাই—উড স্ট্রীটের অমন বাড়ি থাকতে আর কোথায় ঘুরে বেড়াব। ঐ দিকেই মনের মতন কোনো কাজও পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে ও রকম 'জোলো' হাওয়ায় আমাদের মত শুকনো জায়গার (পঞ্জাবের) লোক টিকৃতে পারবে না। দেশে থাকবার আশা ছেড়ে দিতে হ'ল।

এই সময়ে অনেক দিনের শখ চীনের বিষয় Up-to-date হবার ইচ্ছা খুব হ'ল। পানিকার (Sardar Pannikar) চীন থেকে ফিরেছিলেন (উনি তখন Chiang Kai-shekএর K. M. T. Govt.এ Nankingএ ভারতের দূত ছিলেন) তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করলাম। কলকাতায় থাকতে শুনলাম

প্রবোধ বাগচী মশাই পিকিং থেকে শান্তিনিকেতন ফিরেছেন। আমি শান্তি-নিকেতন গেলাম। বাগচীর চীনের বিষয় বক্তৃতা শুনলাম—দিন কতক বিশ্বভারতী (শ্রীনিকেতন পর্যন্ত) ঘুরেফিরে দেখলাম। ভাল লাগলো—কিন্তু ওখান থেকে যাবার তেমন ইচ্ছে হ'ল না। মীরটের ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘের সদস্য হয়ে কিছু চীনের সমসাময়িক ইতিহাসের মালমসলা পেলুম।

১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে দিল্লীতে একটি ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘের অধিবেশন হয়। বাঙলা, মহারাষ্ট্র, কেরল, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রত্যেক প্রদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। এই সম্মিলনীর একটি শাখার আমি সভা-পতি ছিলাম। এর আগের বছর চীন থেকে চীন-ভারত মৈত্রী সঙ্ঘের একটি goodwill mission এসেছিল আমাদের দেশে। এবার দিল্লীর এই অধিবেশনে স্থির হলো যে আমাদের একটি goodwill mission চীনে যাবে।

আজকাল যা দেশের মনোভাব তাই বুঝিয়ে বলা দরকার যে ১৯৫৩-৫৪-৫৫ এই বছরগুলিতে পণ্ডিত জোয়াহরলাল নেহরু থেকে আমাদের মত শিক্ষকশ্রেণীর সাধারণ ব্যক্তির পর্যন্ত একটা আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে এশিয়ার দুই মহাদেশ ভারত ও চীন একতাবদ্ধ হয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করতে পারলে এশিয়াকে আর ইওরোপের হুকুম মেনে চলতে হবে না। ৩০০ বছরের ইওরোপের সার্বভৌম প্রভুত্ব এশিয়াকে আর মাথা পেতে স্বীকার করতে হবে না। এই আশা দুরাশায় দাঁড়াবে (আমার এখনও মনে হয় যে দু'পক্ষের ভুলেতেই এরকমটি হল) তখন কেউ ভাবেনি। দিল্লীর এই সভাটি বেশ ভাল করে মনে আছে কারণ সেই সময়েই দিল্লীতে থাকতে থাকতে আমার বেয়ান ঠাকরুণ শ্রীমতী ছায়া দেবীকে অনেক দিন পরে দেখলাম—আর তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আমার মেজ ছেলে রাজরাজের বিয়ে তাঁর বড় মেয়ে সুনন্দার (মনুর) সঙ্গে হওয়া প্রায় স্থির হ'ল। ছায়া দেবীকে প্রায় ৩৫ বছর আগে প্রথম দেখি মীরটে যখন তিনি আমার বেয়াই শ্রী শৈলেশ রায়ের সঙ্গে, তাঁদের বিয়ের পরেই, রমা মন্দিরে এসেছিলেন। এ বিয়ের ঘটকালির কাজ খানিকটা আমিই করি। উনি (শ্রীমতী ছায়া দেবী) হলেন রমাপ্রসাদবাবুর (কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের) শালী। রমাপ্রসাদবাবু কলকাতা থেকে আমাকে লেখেন যে মীরটে শ্রী শৈলেশ রায় এসেছেন নতুন কাজ নিয়ে (কৃষি-বিভাগে), তাঁর সঙ্গে ছায়া দেবীর বিয়ের কথা হচ্ছিল—আমাকে তাই পাত্রের খোঁজ নিতে লিখেছেন। যাক, এ হ'ল প্রায় ৩৫ বছর আগের কথা।

দিল্লীর এই ভারত-চীন মৈত্রীর অধিবেশনের পর আমরা ধরমশালা গেলাম। সেই আমাদের 'কোনিয়ামে' শেষ বার থাকা—আবার ধরমশালা খুব ঘুরেছিলাম। বিজু, মীরা, খোকন, মুটু চলে যাবার পরেও দুজন দিন পনেরো ওখানে রয়ে গেলাম। তারপর টেলিগ্রাম পেলাম যে চীনে এবার যে 'গুড-উইল মিশন' যাচ্ছে ১লা অক্টোবর, পিপল্‌স্ রিপাবলিক অফ চায়নার ষষ্ঠ বাৎসরিক সমারোহ উপলক্ষ্যে, আমাকে সেই মিশনের মেম্বার করা হয়েছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি মীরটে ফিরে এসে পাসপোর্ট ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে ফেলি। খবর পেয়ে আমরা দুজনেই নেমে এলাম। দিল্লী স্টেশনে রায় মশাই ও ছায়া দেবী আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে ওঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন, সেখানে মনুকে আমরা দুজনে দেখলাম তারপর মীরট ফিরলাম। রাজুকে (ও তখন ক্যাপ্টেন) বলা হল যে ও বিজুকে সঙ্গে নিয়ে মনুকে যেন দেখে আসে—আমরা দুজনে তো দেখে ও পছন্দ করে এসেছি।

পাসপোর্ট ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার বাস্তবিক বড় জটিল বিষয়। তবে এই গুডউইল মিশনের জন্য 'সেণ্টার' এ সব কাজ খুব সহজ করে দিয়েছিলেন। যথাসময়ে সব ঠিক ঠিক হয়ে গেল। দিল্লী চীন রাষ্ট্রদূতালয়ে দিল্লী থেকে যাঁরা চীনে যাবেন তাঁদের চীন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একটি ফটো তোলা হল। তার দু-একদিন পরে কলকাতা মেলে কলকাতা যাত্রা করলাম। সঙ্গে ডাঃ জ্ঞানচন্দ—আমাদের একটি নেতৃস্থানীয় সত্যিকারের বিদ্বান লোক—ছিলেন আমার কম্পার্টমেণ্টেই : আর সেই ট্রেনেই ছিলেন একজন খুব গোঁড়া কমিউনিস্ট ভাইসগুরুবক্‌স্ সিং, পঞ্জাবের। কলকাতায় সেইদিনই বিকেলে বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় স্থানীয় গুডউইল মিশনের মেম্বারদের একটি পার্টিতে সম্বর্ধনা করলেন। আমরা আর তাতে যোগ দিতে পারলাম না।

সেই রাত্রেই ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর এয়ার অফিস থেকে আমরা ওদেরই বাসে দমদম অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের দলের সবাই গলা ছেড়ে রবিঠাকুরের গান "আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু" গাইতে গাইতে সে পাড়ার লোকেদের ঘুম ভাঙিয়ে কলকাতা পিছনে রেখে যাত্রার প্রথম স্টেজ শেষ করলাম।

চীন যাত্রার জন্য আমাদের একটি-চার্টার্ড প্লেনের বন্দোবস্ত হয়েছিল। আর এসব খরচের জন্য প্রত্যেক মেম্বারকে ১৪০০৲টাকা দিতে হয়েছিল। এটা হল দমদম থেকে হংকং আর হংকং থেকে দমদম ফেরার ভাড়া। চীনের মধ্যে খরচ চীন-ভারত মৈত্রীসঙ্ঘের সভ্যদের। অবশ্য পিকিং সরকারই এই খরচের বেশীর ভাগ বহন

করেছিলেন—আর খরচটাও কম হয়নি। আমরা হিসাব করে দেখেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকের জন্য চীনকে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছিল। ওখানে দেড় মাস তো রাজার হালে ছিলাম।

হংকঙে পৌছন গেল ১৮ই সেপ্টেম্বর, দুপুরে। প্লেন থেকে নেমে বড় লাক্সারি বাসে করে ওখানে লাক্সারি (luxury) হোটেল সিরাসারে গিয়ে উঠলাম। এক-একটি সুসজ্জিত বড় ঘরে আমাদের দুজন করে রাখা হল। সন্ধ্যেবেলা জানলার পরদা তুলে মনে হল যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নিয়ে আরব্য রজনীর সেই গুহার দৃশ্য দেখছি। সমুদ্রের খাঁড়ির ওপারে, পাহাড়ের গায়ে হাজার হাজার ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে—সমস্ত পাহাড়টি ঝলমল করছে। মধ্যে মধ্যে দু-তিনটি 'প্যাগোডা' আলোকস্তম্ভের মত রয়েছে, পাহাড়ের গায়ে Funicular রেলওয়ে ট্রেন আগুনের অজগর সাপের মত চলাফেরা করছে। আলোর এত বাহার ইওরোপে বা অন্য কোথাও দেখিনি।

পরের দিন হংকং থেকে ট্রেনে আমরা বেরুলাম। বিকেলবেলা চীনের সীমান্ত রেল স্টেশন শামচুংএ পৌছবার আগেই হংকংএর গাড়ি ছাড়তে হল। একটি পুল পেরিয়ে—এইটিই হ'ল Frontier—শামচুংএ যেতে হয়। আমরা যখন পুল পার হচ্ছি শামচুংএর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে লাউডস্পীকারে ইংরাজি ও চীনা ভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা করা হ'ল। আমরা এখন চীনে প্রবেশ করেছি। হংকং-এর ট্রেনে ও শামচুং স্টেশনে মিস্টার গোবর্ধনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি হলেন পিকিংএ ভারতের রাষ্ট্রদূতের একজন প্রধান কর্মচারী। আবার তিনি হলেন আমাদের মীরট কলেজের ছাত্রী—আমার এম. এ. ইতিহাস ক্লাসে দু বছর পড়েছেন সেই কমলা সিংহের স্বামী। মীরটেই এঁদের বিয়ে হয়েছিল বছর তিন-চার আগে। মিস্টার গোবর্ধন মরিসাসের হিন্দু বাসিন্দা—ফ্রেঞ্চ খুব ভাল জানেন, ইংরাজি ফ্রেঞ্চ toneএ বলে থাকেন। বিয়ের পর বোধহয় হিন্দী ভাল করে শিখছেন।

শামচুংএ আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রেন অপেক্ষা করছিল। সুন্দর গাড়ি, খাবার ঘর, বৈঠকখানা, হাওয়া খাবার জন্যে গাড়ির পেছন দিকে খোলা বারান্দা, শোবার কম্পার্টমেন্টগুলিতে ভাল বিছানার বন্দোবস্ত, প্রকাণ্ড নাইবার ঘর—সত্যি বলতে এরকম গাড়ি আগে দেখিনি আর পরেও দেখবার সৌভাগ্য হবে না। চীন ভ্রমণকালে এই গাড়িই আমাদের বিশেষ করে ঘরবাড়ি হয়েছিল। উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ চীন ঘোরবার সময় এই ট্রেনই আমাদের এই বিরাট অভিযান সফল করিয়েছিল।

স্টেশনেও কিছু নূতনত্ব দেখলাম—খোকাখুকীদের জন্য আলাদা Creche আছে, সেখানে নার্স আছে, যাত্রীদের জন্য রিভিংরুম রয়েছে, যারা খাবার বিক্রি করে তাদের মুখে সাদা কাপড়ের মাস্ক, খাবারগুলি সাবধানে ঢাকা, ছোট চিম্‌টে দিয়ে ঢাকা থেকে বের করে খদ্দেরকে দেওয়া হয়। সবই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ট্রেন পিকিং অভিমুখে প্রায় না থেমে চললো। মাঝে মাঝে খুব ছোট স্টেশনে জল, ফল, সব্‌জি নেবার জন্য অল্প কিছুক্ষণের জন্যে থামতো, বড় বড় স্টেশন এড়িয়ে যেত। এর জন্য আমাদের খাওয়াদাওয়ার কোনো কষ্ট হয়নি। আমরা কয়েকজন নিরামিষাশী ছিলাম—আমাদের জন্য ফলের বেশ আয়োজন ছিল। দক্ষিণ চীন থেকে যেমন উত্তর চীনের দিকে এগুচ্ছিলাম নতুন নতুন ফলও পেতে লাগলাম। দক্ষিণে মিষ্টি কামরাঙ্গা, ভাল কলা, এক রকম গোল আলুর মত সুস্বাদু ফল, লিচু নয়, লিচুর Season তখন শেষ হয়ে গেছে, তাই লিচু ছিল না, Cantonএর লিচু অতুলনীয়, ঐখান থেকেই লিচু ভারতে এসেছিল। আরও উপরে উঠে apple, আঙ্গুর, নানা রকমের নাসপাতি, ইত্যাদি; ফুলও কত বদলে গেল গরম জায়গা থেকে যেমন ঠাণ্ডা প্রদেশে ঢুকলাম। গাড়ির ড্রইংরুম বা সেলুন, ফুল, ছবি, ছোট (dwarf) বাহারে গাছ দিয়ে খুব সাজিয়ে রাখতো। Dwarf (বামন) গাছ চীন ও জাপানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি—বড় বড় গাছ (তিরিশ-চল্লিশ ফুটের গাছ) এই বামন অবস্থায় দশ-বারো ইঞ্চিতে পরিণত হয়। দেখতে কিন্তু বড় গাছের বাহার এই বামন গাছেও দেখা যায়—পাতাগুলি ঐ অনুপাতে ছোট হয়—ফুলও ফোটে খুব ছোট ছোট।

রেলগাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখা গেল যে রেল লাইনের কয়েক হাত পরেই জমিতে চাষ হচ্ছে—আর যতদূর দেখা যায় চারিদিকে শস্যক্ষেত্র। চীনেরা চার হাজার বছর ধরে চাষবাস করছে—পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো কৃষিজীবী জাতি—এখন যুদ্ধ (যা বহুদিন থেকে চলছিল) থেমেছে, ওরা পারতপক্ষে এক হাতও জমি ছাড়েনি—কবরস্থানেও শস্য উৎপাদন করছে। যেখানে জলাভূমি সেখানে পদ্ম (pink lotus) লাগানো হয়েছে—পদ্মবিচি এখানকার খুব প্রিয় খাদ্য। অনেক গাঁয়ের পাশে সূর্যমুখীর সারির পর সারি—শুনলুম সূর্যমুখী বীজের তেল এরা ব্যবহার করে রাঁধবার কাজে। দক্ষিণ চীনে বাঁশের ঝাড়ও প্রচুর—বাঁশের কোঁড় (bamboo sprouts) কুচি কুচি করে অনেক তরকারিতেই ব্যবহৃত হয়।

একুশে সেপ্টেম্বর মাঝরাত্তিরে আমাদের রেলগাড়িটিকে দু'খণ্ড করে বড tugএর (মালবাহী খোলা ডেকের স্টীমার) ওপর চড়িয়ে য়াং সে-কিয়াং (চীনের একটি খুব বড় নদী) পার করানো হ'ল—তারপর ওপারে গিয়ে আবার জোড়া লাগানো হ'ল। আমাদের অনেকেই দিব্যি ঘুমুলেন, কিছুই টের পেলেন না—পরদিন সকালে সহযাত্রীদের কাছে খবরটি পেলেন। অনেকেই খুব রেগে গেলেন যে এমন ব্যাপারটি দেখতে পেলেন না। এর পর এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তাঁরা। যা দু-একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমেছিল সেখানে দেয়ালে পোস্টার দেখলাম—যে খাবার পরবার জিনিস খুব বেশী করে বাড়াবার চেষ্টা করে তাইওয়ান (Formosa) পুনরুদ্ধার করতে হবে। আমেরিকাকেই এই তাইওয়ান ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছিল। তেইশে ভোরবেলা একটি নদী পার হওয়া গেল, নদীতে ভীষণ ঢেউ, বন্যা এসেছে—ভয় করছিল আমাদের গাড়ি ভাসিয়ে না নেয়।

তেইশে সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) আমরা পিকিং পৌছলাম। স্টেশনে চীন-ভারত মৈত্রী সঙ্ঘের কয়েকজন বিশিষ্ট মেম্বার (তার মধ্যে পিকিং ইউনিভার্সিটির কতকগুলি প্রফেসর ছিলেন) আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাইরে গিয়ে দেখা গেল যে আমাদের জন্যে কার ও বাস্ দাঁড় করানো আছে। 'নিষিদ্ধ পুরী' (সে কালের রাজভবন), 'স্বর্গের শান্তির তোরণ', Gate of Heavenly Peace, Tien An-men, এই সব ঐতিহাসিক জায়গার পাশ দিয়ে আমরা পিকিং হোটেলে পৌছলাম। এটি একটি নবনির্মিত বিরাট অট্টালিকা, 'নিষিদ্ধ পুরী'র প্রায় পাশেই।

পিকিং হোটেলের যে ঘরে আমি ও একটি গোয়ালিয়ার আর্ট স্কুলের অল্পবয়সী শিক্ষক পিকিং বাসকালে ছিলাম, তার জানলা থেকে এই অতীত চীন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এই 'নিষিদ্ধ পুরী'র খানিকটা খুব ভাল করে দেখা যেত। Cypress গাছের সারি—তারই মধ্যে মধ্যে সিঁদুর ও সোনালী রঙের টালি দেওয়া ছাতের বাড়ি, তার মেঝেতেও ঐ রকম সোনালী ও সিঁদুর রঙের টালি বেশ ছবির মত দেখাচ্ছিল। এগুলি ছিল সম্রাট ভবনের outhouseএর মত—আসল Imperial Palaceগুলি বাইরে থেকে দেখা যায় না।

পিকিং নগরের এই সব পুরাতন ঐশ্বর্যের (ঐতিহ্যের) নিদর্শনগুলি এই শহরটিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। Sylvain Levi—জগৎবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ বলতেন যে তিনি পৃথিবীর অনেক নগরই দেখেছেন—পিকিংএর মত এমন মনোহর শহর কোথাও দেখেননি।

২৩শেই সন্ধ্যাবেলা আমাদের নতুন চীনের নতুন কংগ্রেস দেখতে নিয়ে গেল। ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) People's Govt. of China র নতুন constitution ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালের পর পাঁচ বছর একটি সাময়িক প্রয়োজন অনুযায়ী অস্থায়ী সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। একটি পুরানো রাজবাড়ির প্রকাণ্ড উঠান একটি বিরাট হলে পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা সদর দরজায় না ঢুকে (তখন কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়ে গেছে) পাশের ঘর 'করিডর' ইত্যাদি ঘুরে হলের পেছন দিকে পৌঁছলাম। সেখানে যেতে যেতে কংগ্রেসের সদস্যদের (তাঁরা তখন বক্তৃতা শুনছেন) পাশের দিক থেকে দেখা গেল। খাস চীনের সদস্যেরা মামুলি গলাবন্ধ কোট ও প্যাণ্ট (বেশীর ভাগ খাকি রঙের) পরা। কোনও রকম শৌখিনতা কাপড়চোপড় বিষয়ে (মেয়ে-পুরুষ উভয় পক্ষেরই) তখন বারণ। কিন্তু সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের (সিন্‌কিয়াং, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি প্রদেশের) মহিলা সদস্যেরা খুব জমকালো পোশাকে কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করছিলেন। সভার মঞ্চের উপর কমিউনিস্ট নেতারা দেখলুম বসে আছেন। মাওসেতুং তখনও আসেননি, মাদাম সন্‌য়ৎসেন ও চৌ এন্‌ লাইকে তো চেনা গেল (কতবার তাঁদের ছবি দেখেছি), আর তাঁদেরই সঙ্গে দুজন পীত বসনধারী সৌম্যমূর্তি অল্পবয়স্ক লামাও দেখতে পেলাম।

খানিকক্ষণ পরে ঘণ্টা বাজলো, কংগ্রেসের সদস্যেরা বাইরের বাগানে বেরুলেন। আমরাও বাইরে এলাম—সামনে দেখি মাদাম সিয়েন পিং সিং যিনি ১৯৫৩ সালে চীন ভারত মৈত্রী সঙ্ঘের সভ্য হয়ে মীরাটেও এসেছিলেন। আমাদের তিনি তখুনি চিনলেন, তাঁরই কাছে শুনলাম যে মঞ্চের উপর যে দুজন লামা আমরা দেখেছিলাম তাঁরা হলেন দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা—তাঁরাও চীন কংগ্রেসের সদস্য। খানিকক্ষণ পরেই দালাই লামা তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে নমস্কার করলুম। দেখলুম উনি খুব গম্ভীর আর যেন চিন্তামগ্ন—পাঞ্চেন লামা কিন্তু বেশ ফূর্তিতে আছেন, খুব হেসে হেসে অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা কইছেন।

খবর এল যে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আসছেন আমাদের চীনে আসার জন্যে অভিবাদন করতে। আমরাও তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত—ঠিক সেই সময়েই তিনি এসে পড়লেন। মূর্তিমান্‌ উদ্যম ও উৎসাহ চৌ হাসতে হাসতে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন পথে বিশেষ কষ্ট হয়েছিল কিনা, এই নূতন দেশ কেমন লাগছে? এদিকে আবার ঘণ্টা পড়লো—আমরা সবাই আবার হলঘরে গেলাম। ক্রুশ্চেভ, (রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি

অর্থাৎ রাশিয়ার সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি) তখন কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করেছেন। খুব দীর্ঘ ভাষণ (রুশ ভাষায়)—বলতে বলতে তাঁর একটি কথায় হল-সুদ্ধ লোক ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে চাইল। পরে খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল, ক্রুশ্চেভ চীন যে প্রতিবেশী দেশ ভারত প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে তার জন্য চীন গভর্ণমেণ্টকে যখন প্রশংসা করেছিলেন সেই সময় কংগ্রেসের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরেছিল। ক্রুশ্চেভ শেষ করবার পর মার্শাল বুলগেনিন (রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী) একটু ছোটখাটো বক্তৃতা করলেন। তারপর সেদিনকার মত সভাটি ভঙ্গ হ'ল। আমরা পিকিং হোটেলে ফিরলাম।

তার পরদিন আমরা পিকিংএর স্বর্গমন্দির (যার বিষয় ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছিলাম) দেখতে গেলাম। এটি একটি বিরাট গম্বুজওয়ালা প্রকাণ্ড মার্বেলের হল। মার্বেল আমাদের তাজমহলের 'মক্‌রানা' মার্বলের মত অত ভাল নয়—বড় ক্ষয়ে গেছে, আর যেন তার রঙও মলিন হয়ে গেছে। অবশ্য স্বর্গমন্দির তাজমহলের চেয়ে ঢের বেশী পুরানো। তবে এত বড় মার্বেলপাথরের হল আর কোথাও দেখেছি বলে বোধ হয় না। দেওয়ালে 'ফিনিক্স' (স্বর্গের পাখী) ও ড্রেগন (চীনের নাগ—এ হ'ল শুভ চিহ্ন, বিশেষতঃ চীন সম্রাটদের মাঙ্গলিক চিহ্ন, সম্রাটদের সিংহাসনে, রাজদ্বারে, রাজভবনের সর্বত্র নিপুণ শিল্পীদের দ্বারা বিচিত্র রকমে চিত্রিত, খোদিত, রেশমের স্ক্রীনের উপর এম্‌ব্রয়ডারি করা, মার্বেল পাথরে নানা আকারে খোদাই করা)। খুব বড় একটি সূর্যও মার্বেলের উপর উৎকীর্ণ, সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দির থেকে বেরিয়েই সে যুগের সম্রাটদের পূজার বেদী—যেখানে সম্রাটরা নূতন বছরের প্রথম দিনে স্বর্গের দেবতাকে নিজেদের সাম্রাজ্যের সুখ-দুঃখের বিষয় সবিস্তারে জানাতেন। এটি হ'ল গোলাকার মার্বেল পাথরের প্রাঙ্গণ, রেলিং দিয়ে ঘেরা—খোলা আকাশের নীচে খোলা, সুবিস্তৃত প্রার্থনা অঙ্গন। এই পূজাবেদী থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের একখণ্ড জমিতে সম্রাটরা নতুন বছরে একবার সোনার লাঙ্গল দিয়ে কিছুক্ষণ চাষ করতেন। চাষীদের রাজা চাষীদের জন্যে দেবতার আশীর্বাদ এই রকম করে চাইতেন। এই স্বর্গের দেবতার মন্দির ছিল চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কন্‌ফ্যুসীয় মন্দির—এখন এইটিই একমাত্র কন্‌ফ্যুসীয়ান Shrine যা ঠিক আগেকার মতই রয়েছে। অন্য অন্য কন্‌ফ্যুসীয়ান Shrine হয় মিউজিয়াম নয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে—যখন আমরা চীনে বেড়িয়েছি—তখন গির্জা, বৌদ্ধবিহার ও মন্দির মস্‌জিদ্ প্রভৃতি পূজা ও ভজনালয় নির্বিবাদে খোলা ছিল ও সেই সেই সম্প্রদায়ের উপাসকেরা সে সব স্থানে নির্বিবাদে

যাতায়াত করতেন। কেবল কন্‌ফ্‌সীয় মতকে তার নিজের দেশ থেকে একেবারে পুঁছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কারণটা হ'ল যে কন্‌ফ্‌সীয়ান মত্‌টা ছিল চীনের অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্ম আর কন্‌ফ্‌সীয়ান সংস্কৃতি ছিল গোঁড়া রক্ষণশীল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সব বিষয়ে; সুতরাং বিপ্লবী যুগের সঙ্গে কন্‌ফ্‌সীয়ান্‌ মত একেবারে খাপ খায় না।

সেই দিনই (২৪শে সেপ্টেম্বর) ভারতীয় দূতাবাসে আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় দূত রাঘবন আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। সেখানে মিসেস্‌ গোবর্ধন, আমাদের মীরট কলেজের ছাত্রী, তাঁর স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। সেইখানেই পরঞ্জপের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। ইনি মারাঠী যুবক, আমার বন্ধু বাগ্‌চী এঁকে পিকিংএ চীনা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার জন্য এ দেশে রেখে যান—এখন পরঞ্জপে ঐ বিষয়ে পারদর্শী হয়েছেন, অনেক সময়ে দো-ভাষীর কাজ করেন। পিকীংএ থাকতে পরঞ্জপের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছিল, পরে দিল্লীতেও ওঁর সঙ্গে কয়েকবার কথাবার্তা হয়। ভারতীয় দূতাবাসে কয়েকটি শিখ কর্মচারীর চীনা স্ত্রী, তাঁদের কেউ কেউ পঞ্জাবী বেশে সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন—তাঁদের সেই বেশে বেশ মজার দেখাচ্ছিল। শ্রীমতী কমলা গোবর্ধন আমাকে তাঁদের বাড়িতে দু-তিন দিন থাকবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন—কিন্তু তাতে আমাদের চীন ভ্রমণের যে সময় নির্ধারিত হয়েছিল তাতে বাধা পড়বে বলে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না।

সে দিন বিকেলবেলা আমরা পেইহেই পার্কে গেলাম। পার্কের মধ্যে বেশ একটু উঁচু জায়গায় একটি তিব্বতী ভৈরবমূর্তির মন্দির আছে—সেখান থেকে পিকিং নগরের সুন্দর একটি দৃশ্য পাওয়া যায়। নীচে একটি বৃহৎ জলাশয়—পেই-হেই লেক—তার ওধারে দূরে একটি খুব উঁচু পুরোনো রাজভবন। এরই সব-উপরতলায় চীনের মিং বংশের শেষ সম্রাট শত্রুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে নিজের রেশমের স্কার্ফ গলায় দিয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার পরেই মাঞ্চু নৃপতি বংশ চীনে রাজত্ব করেন। মন্দিরের নীচে খুব বড় বড় গামলায় নানা আকারে নানা রঙের অদ্ভুত রকমারি মাছ (গোল্ড ফিশ) রাখা আছে। সোনালী রঙের মাছ—বেশ বড় সাইজের—তো আছেই, তা ছাড়া কুচ্‌কুচে কালো, কালো মখমলের মত—মাঝারি সাইজের চেপ্‌টা অদ্ভুতআকারের মাছও (মাছ বলে মনেই হয় না) রয়েছে। চীনের বাইরে কোনো Aquariumএও ওরকম মাছ দেখিনি।

সেখান থেকে বেরিয়ে পেইহেই হ্রদের তীরে সেকালকার একটি সম্রাটদের

বিলাসভবনে (প্যাভেলিয়ান) আমাদের নিয়ে গেল। এখন এটি একটি সুন্দর আর্ট মিউজিয়াম। ঢোকবার রাস্তায় অনেকগুলি Stone slabs of volcanic origin দু ধারে সাজানো রয়েছে। প্রত্যেকটি আলাদা রকমের পাথরের, রঙ, গড়ন, সবই আলাদা। চীন ও জাপানে বড় বড় বাগানে এরকম অদ্ভুত পাথর সাজানো একটি প্রাচীন রীতি। দূর দূর থেকে এরকম পাথর আনা হ'ত। পাথরগুলির গায়ে অসংখ্য ফুটো (কৃত্রিম নয়, স্বাভাবিক)। প্যাভেলিয়ানের মধ্যে চীন সম্রাটদের শিলালেখ, রেশমের Scroll তাতে সেকালকার হাতের লেখার নমুনা, এ সব সযত্নে রাখা রয়েছে। চীনের পুরাকালে হাতের লেখা—Caligraphy—একটি রীতিমত উচ্চাঙ্গ শিল্প বলে গণ্য হত। কয়েকজন সম্রাট তাঁদের নিজের হাতের লেখা দিয়ে এই আর্টে নাম কিনেছেন। প্যাভেলিয়ান থেকে বেরিয়ে সেইহ্রদে লেকে ঘণ্টাখানেক ছোট ছোট নৌকোয় হ্রদের ধারে ধারে বেশ ঘোরা হল। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। চারিদিকে নগরের আলো জ্বলে উঠছে—সে এক সুন্দর দৃশ্য।

পিকিং হোটেলে ফেরবার রাস্তায় আমরা বিখ্যাত Dragon Screen দেখলাম। প্রকাণ্ড চীনেমাটির দেওয়ালের ওপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের কয়েকটি ড্রাগন যেন জ্বলজ্বল্ করছে। ড্রাগনগুলি চীনে মাটির, বড় শিল্পীর হাতের কাজ, Dragon Screenএর রঙ এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সেকালের বড় বড় বাড়ির সদর দরজার সামনে এরকম এক-একটি 'স্ক্রীন' (আড়াল-করা দেওয়াল) থাকতো। অশুভ প্রেত প্রভৃতির অনধিকারপ্রবেশ বন্ধ করবার জন্য এই ছিল রীতি।

সেই সন্ধ্যায় হোটেলের সাততলার ছাদে চীন ভারতীয় মৈত্রী-সংঘ আমাদের একটি বড় রকমের ভোজ দিলেন। ন-দশটা করে কোর্স। কয়েকটি নিরামিষ তরকারি বড় ভাল লেগেছিল। আমাদের হোস্টরা এত খাওয়ালেন যে সে রাত্রে আমার তো পেট ব্যথা করেছিল।

২৫শে সেপ্টেম্বর—সকাল বেলা আমরা গেলাম একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট শিক্ষাকেন্দ্রে যেখানে তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, তুর্কিস্থানী প্রভৃতি চীনা নয় এমন সব অল্পসংখ্যক জাতিদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত কর্মচারীদের 'ট্রেনিং' দেওয়া হয়। চীন সরকারের অভিপ্রায় ছিল এই সব অ-চীনা প্রশাসনিক কর্মচারীদের যথাসম্ভব চীনের জাতীয় ভাবের গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনা। তুর্কিস্থানী ও মঙ্গোলীয়দের বিচিত্র পোশাক। তিব্বতীদের পূজার বেদী—ফরমোসা-(তাইওয়ান) বাসীদের সেখানে উপস্থিতি (ফরমোসার কর্মচারীরা যে চীনে

আছেন আগে জানতামনা)—এসবই আমাদের পক্ষে অপ্রত্যাশিত, অতএব বেশী করে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। তুর্কীস্থানের ছাত্রাবাসে আমাদের খাওয়ানো হ'ল—খুব ভাল পোলাও—'মটন' পোলাও ও নিরামিষ দুরকমই তারা দিল। শেষে আমাদের তরফ থেকে আমাকেই এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে হল। এক-একটি সেণ্টেন্স (বাক্য) আমি বলছি ইংরাজিতে আর চীনে তর্জমা তখন বলা হচ্ছে, তারপর আমি আবার আরম্ভ করছি। কিছুদিন পরে এ ব্যবস্থা বেশ লাগতো।

সেইদিনই (পঁচিশে সেপ্টেম্বর) বিকালে আমরা 'তিয়েন আনমেন' সিংহ-দ্বারের বৃহৎ প্রবেশপথে নিষিদ্ধ পুরীর মধ্যে ঢুকলাম। প্রথমে সারি সারি অতি প্রাচীন সাইপ্রেস গাছ—তারপর আর একটি বৃহদাকার তোরণ—তারপর প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ—প্রত্যেকটি বিরাট আয়তনের। এক-একটি প্রাঙ্গণে একটি করে প্যাভেলিয়ন সিঁদুর রঙের (উঁচু একতলা প্রাসাদ), ভিতরে 'জেডের' বা হাতির দাঁতের উপর সুন্দর খোদাই করা চিত্র। রেশমের 'স্ক্রোল' (সেকালের বড বড চিত্রকরের আঁকা ছবি তাতে), এখনও ছবিগুলির রঙ জলজ্বল করছে। বলা বাহুল্য, এই প্রাচীন চিত্রগুলি এখন বাস্তবিকই অমূল্য।

আর ঘরের কোণে কোণে মাছরাঙা পাখীর রঙীন পালকের সযত্নে রক্ষিত গুচ্ছ। এই বিশাল প্রাচীর ঘেরা পুরীর মধ্যিখানের প্যাভেলিয়নটি সবার বড, তার সামনের প্রাঙ্গণে ব্রোঞ্জের প্রকাণ্ড সারস—ধূপ জ্বালাবার ধূনাচির কাজ করছে। সারস চীনের বড আদরের পাখী। ব্রোঞ্জের বিরাট আকার কচ্ছপও অনেক রয়েছে—জানি না কিসের জন্য, বোধহয় মাঙ্গলিক চিহ্ন। প্যাভেলিয়নের ঠিক সামনে বড বড জেডের স্ল্যাব—তাতে ড্রাগন ও ফিনিক্স খোদাই করা—এ সব দেখে মনে হয় এই ভবনটিই ছিল চীন সম্রাটদের—'দেওয়ানে খাস'। এক প্রাঙ্গণ থেকে আর এক প্রাঙ্গণের মধ্যে জলভরা খাল—মার্বেলের সেতু দিয়ে পার হতে হয়। এই সেতুর রেলিং 'ফিনিক্স' ও ড্রাগনের মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত। এই প্রাঙ্গণগুলির বাগানও সুন্দর উইসটেরিয়া, সাইপ্রেস, পাইন, ফার প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষে সুশোভিত। এই সম্রাটপুরীর যথার্থ বর্ণনা করতে একটি আলাদা বই লিখতে হয়—দু-চার পাতায় কিছুই হয় না—তাই এখানেই শেষ করলাম।

এই মাছরাঙা পাখীর পালকের বিষয় একটা মন্তব্য মনে পডল Sir Osbert Sitwell-এর "Escape with Me" বই থেকে। তিনি কম্বুজের অঙ্কোরবাট প্রভৃতি বিরাট মন্দির দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন যে কম্বুজ নৃপতিদের এত টাকা এল কোথা থেকে? পিকিংএর রাজভবন দেখে (তিনি লেখেন) এ প্রশ্নের

উত্তর পেলেন। ঐ যে মাছরাঙার পালক ঘরে ঘরে রাখা আছে ওখানে—ঐ পালকের বিনিময়েই ক্যাম্বেডিয়া অত অর্থ উপার্জন করেছিল। ক্যাম্বেডিয়ায় মাছরাঙা পাখী সব জায়গায় দেখা যায়—আর চীনে ওর খুবই কদর সুতরাং বাণিজ্যের মাধ্যমে কম্বুজ চীন থেকে খুব লাভ করে। আর ঐ লাভের টাকা থেকেই Angkor, Bayon তৈরী হয়েছিল। জানি না এই অনুমান কতদূর সত্য। তবে Sir Osbert Sitwell-এর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে সম্রাটভবনগুলির আসবাবপত্র প্রায় সবই লোপ পেয়ে গেছে,—চিয়াং কাই শেকের সময়ে—জাপানীরা লুট করে নিয়ে যাবে এই অছিলায়। সে-গুলি কি এখন ইয়োরোপ, আমেরিকার মিউজিয়মে ঢুকেছে ?

পঁচিশে সন্ধ্যায় একটি 'ক্লাসিক অপেরা' দেখা গেল—এর প্রজাপতি নৃত্যটি বড় সুন্দর ছিল।

ছাব্বিশে সকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পিকিং-এরই কাছাকাছি খুঁড়ে যা সব জিনিস পাওয়া গেছে তার একটি মিউজিয়মে দেখে এলাম Peking Man। (পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন মানুষের অস্তিত্ব পিকিং-এর কাছেই পাওয়া যায়) সেই মানুষের মাথার খুলি পিকিংএ ছিল—কিন্তু এখন আর পিকিংএ নেই, হয় জাপানীরা না হয় আমেরিকানরা নিয়ে গেছে। Peking Man চীনের একটি গৌরবের বিষয় ছিল,—ওর মাথার খুলি হারিয়ে যাওয়ায় চীনের দুঃখ ও রাগ দুই খুব হয়েছে।

সেই দিনেই বিকেল বেলা আমরা শহরের বাইরে বিশ্ববিশ্রুত Summer Palace দেখতে গেলাম। পুরোনো সামার প্যালেস, যা জগতের একটি 'আশ্চর্য' বলে গণ্য হত সেটিকে তো আজ একশ বছর হল ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যরা লুটে তারপর পুড়িয়ে দিয়েছিল। কত যে আর্ট সামগ্রী এই অগ্নিকাণ্ডে লোপ পেলো তা বলে ওঠা যায় না। এখনকার সামার প্যালেস সাম্রাজ্ঞী Tzu-hsi (সুশী) নিজের অভিরুচি অনুসারে তৈরী করিয়ে ছিলেন। এই রাজভবনে থাকতেই তিনি পছন্দ করতেন—হ্রদ, বাগান, পাহাড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে।

ঢুকতেই সম্রাজ্ঞীর একটি থিয়েটারের মঞ্চ, উনি নিজে তার জন্য নাটক লিখে-ছিলেন, তার পাশে তাঁর একটি বিশ্রামের suite of rooms, একটি ঘরে অসংখ্য ঘড়ি, দেশবিদেশের রাজা, সম্রাট, সম্রাজ্ঞীরা তাঁকে এইগুলি উপহার দিয়ে-ছিলেন। ঘড়িগুলি এখন দম দিয়ে ঠিক রাখবার চেষ্টা করা হয়। এইখান

থেকে বেরিয়ে সম্রাজ্ঞীর প্রিয় বেড়াবার পথ—একদিকে হ্রদ আর একদিকে বাগান তারপর ছোট পাহাড় শ্রেণী। মধ্যে লতা ছাওয়া (চীনের wistaria লতা) pergola মধ্যে দিয়ে রাস্তাটি অন্ততঃ মাইল খানেক লম্বা হবে—সুশী হেঁটে এই রাস্তায় বেড়াতেন, নিজের হাতে বনের পাখীদের খাওয়াতেন। এই পথটি শেষ হ'ল, হ্রদের ওপর একটি মার্বেল ঘাটে, এখানে হ্রদের জলে একটি বড় মার্বেলের জাহাজ যেন নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বড় জাহাজ—তার মার্বেলের ডেকে মার্বেলের চেয়ার পাতা আছে। আমরা জাহাজ চড়ে ছিলাম, ডেক থেকে চারিদিকের দৃশ্য সত্যই চমৎকার, যেখানে হ্রদ সরু হয়ে গেছে সেখানে ঘোড়ার খুরের আকারের মার্বেল সেতু, কাছের পাড়ের ওপর একটি সুন্দর প্যাগোডা আর ঐ পাহাড় শ্রেণীর ওপর জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট প্যাভেলিয়ান, চারদিকে পাইন, ফার, উইসটেরিয়ার কুঞ্জ—সত্যি স্বপ্নে দেখা অলৌকিক দৃশ্য ! এই স্বপ্নপুরী নির্মাণের জন্য সম্রাজ্ঞী সুশী জগতের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁর কাজ নিন্দনীয় বলা উচিত। প্রথম চীন জাপান যুদ্ধে যখন চীনের রণতরীর সংখ্যা দেখতে দেখতে কমতে লাগলো (জাপানীরা চীন নৌবাহিনী প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল), তখন সুশীর রাজভক্ত প্রজারা তাদের সম্রাজ্ঞীর হাতে কোটি দুয়েক টাকা চাঁদা করে তুলে দিয়েছিল ভাল একটি আধুনিক battleship কেনবার জন্যে। সুশী কিন্তু সেই টাকা দিয়ে এই মার্বেলের জাহাজ তাঁর সামার প্যালেসের শোভাবর্ধন করবার জন্য তৈরী করালেন। এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললেন যে battleship তো জাপানীরা ডুবিয়ে দেবে ও তা চীন সমুদ্রে ডুবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তিনি যে তাঁর সামার প্যালেসের জন্যে মার্বেলের জাহাজ তৈরী করলেন, সেটি শত শত বৎসর দর্শকদের আনন্দ দেবে। সুশী ঠিক করে ছিলেন না ভুল করেছিলেন ভেবে দেখা উচিত।

সাতাশে—পিকিং 'Medical Association'-এর অধ্যক্ষ আমাদের চীনের Patriotic Health Movement সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, পিকিং যে আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মাছি যে এখানে আর দেখা যায় না, সংক্রামক রোগ যে দূর করা হয়েছে—এসব এই movement-এর কৃতিত্ব…প্রত্যেক রাস্তা, প্রত্যেক গলির বাসিন্দাদের সাহায্যেই এসব করা সম্ভব হয়েছে।

যখন এ বক্তৃতা শুনছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশে এ রকম কবে করতে পারা যাবে। চীনে কতটা ভয় দেখিয়ে, জোর করে এ কাজ করাতে হয়েছে জানা যায় না, তবে যা হয়েছে তা আমাদের পক্ষে আশ্চর্য ব্যাপার।

শহরের গলিতে ঘুরেছি, হাটবাজার দেখেছি—মাছি পাইনি, ডাস্টবিন ভরা দুর্গন্ধ ময়লার স্তূপ দেখিনি।

সেই দিনই সন্ধ্যায় আমরা আবার আমাদের স্পেশাল ট্রেনে চড়লাম। স্টেশনে শুনলাম মাও সেতুং নতুন চীনের রাষ্ট্রপতি মনোনীত হয়েছেন। রাস্তায় স্টেশনে মাওয়ের সেই দিনের একটি উক্তি পোস্টারে ছাপানো দেখলাম—"বাধা-বিঘ্ন আছে অনেক, আমাদের আশাও আছে অনেক, আর কৃতকার্য হবার উপায় তো আমাদের আছে যথেষ্ট।" এ রকম কথা জাতীয় জীবনে প্রেরণা আনে।

সকাল বেলা শানসী প্রদেশের (পিকিংএর পশ্চিমে) টাটুং শহরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে Yuan King (Rene Grousset's Histoire de l' Extreme Orient, Vol. I,এর Yun Kang P. 321et seq.), এখানে ১০০ বছর ধরে (৪১৪—৫২০ এ. ডি.) Wei সম্রাটদের রাজত্বে পাহাড় কেটে বিরাট আয়তনের বৌদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। গান্ধার ভাস্কর্যের প্রভাব ও Grousset-এর মতে মথুরা স্কুলেরও প্রভাব এখানে চীনের শিল্পীদের প্রেরণা দিয়েছিল। কয়েকজন বোধিসত্ত্ব চেয়ারে ইয়োরোপীয় ফ্যাসানে বসে আছেন। আর এক গুহার প্রবেশমুখে একটি ত্রিশূলধারী মূর্তি দেখা গেল, আর এর কাছে একটি ষাঁড়ও দেখলাম আর ঐ ঢোকার পথের অন্য দিকটায় দেখা গেল একটি ষড়ানন মূর্তি ময়ূরে চড়ে আছেন। সুদূর চীনে শিবঠাকুর ও তাঁর পুত্র কার্তিক ঠাকুর আমাদের অপ্রত্যাশিত আনন্দ দিয়েছিলেন। এক জায়গায় অভয় মুদ্রায় আসীন একটি বুদ্ধ মূর্তিতে M. Grousset গুপ্ত যুগের স্টাইল লক্ষ্য করেছেন। চীনে যে সময়ে এই গুহাগুলির মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল সেইটিই ছিল ভারতে গুপ্তকাল। দু-তিনটি মাটির মূর্তি এখানে এখনও দেখা যায়—বেশীর ভাগই কিন্তু ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এই মূর্তি খোদা পাহাড়ের নীচে একটি 'পরস্পর সাহায্য' করা গ্রামে ঐ গ্রামের মোড়ল আমাদের নিয়ে গেল। এই লোকটি একটি নামকরা গেরিলা যোদ্ধা, দেখতে কিন্তু সরল প্রকৃতির মানুষটি। এই গাঁয়ে একটি ছোট যৌথ ভাণ্ডার আছে, তাতে ফসলের বীজ রাখা হয়। সামনে বড় উঠোন—গাঁয়ের কুটিরগুলি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার—আসবাবপত্রের কোনো বালাই নেই। এইসব কুটিরের উনোন, চীনে নাম কাঙ্, ঘর গরম রাখে এক নতুন উপায়ে। উনোনের একদিকে একটু উঁচু বেদীর মত, ভিতরে ফাঁপা, এর ভেতরে উনোনের আঁচ ও ধোঁয়া ঢুকে বেদীটাকে গরম রাখে—আর ঐ বেদীর উপরই রাত্রে সবাই শোয়। উত্তর চীনে

গাঁয়ের লোকেদের 'কাণ্ড'ই বাস্তু ভিটের আসল কেন্দ্রস্থল। সেই রাত্রেই আমরা পিকিং ফিরে এলাম। শুনলাম যে Congressএর অধিবেশন শেষ হয়েছে।

ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর—রাজধানীর লাসা মন্দির—য়ৎ হো কুৎ—চিয়াং কাই শেককে তাড়াবার পর এই মন্দিরটিকে সারিয়ে-সুরিয়ে আবার খোলা হয়েছে। এখানে পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ চন্দন কাঠের (একটি আস্ত চন্দন গাছ ব্যবহার করা হয়েছে এর জন্য) বুদ্ধ মূর্তির পূজা হয়। এখানে ধর্মচক্রের জায়গায় একটি Yin-yang চক্র (স্ত্রী-পুং তত্ত্ব,—এ দুয়ের মধ্যে বিশ্বজগৎ ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে—এ একটি প্রাচীন চীন কল্পনা) প্রথম দেখলাম। এ মন্দিরে লামারা মঙ্গোলীয় (তিব্বতী নয়)।

ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নূতন চীনের রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী আমাদের ও অন্যান্য বিদেশীদের, যাঁরা সে সময় পিকিং এসেছেন, তাঁদের সবাইকে নতুন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করলেন। পিকিং হোটেলেরই সংলগ্ন প্রকাণ্ড একটি হলে মহাসমারোহে সেদিনকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল। ঐ হলে হাজার তিনেক লোক সেদিন সমবেত হয়েছিল—পৃথিবীর কোনো দেশই (হয়ত আমেরিকা ছাড়া) বাদ যায়নি। রাশিয়ান ও বুলগারিয়ান সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর আফ্রিকা থেকে (Egypt, etc) Visitors, ভারতের কর্মী সঙ্ঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) ও ছাত্র সঙ্ঘের (স্টুডেন্ট ইউনিয়ান) কয়েকটি প্রতিনিধি, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কিছু Leftist M.P.রা, আর চীনের নতুন কংগ্রেসের সদস্যরা—সবাই মিলে একটি রীতিমত World Parliament সৃষ্টি করেছিলেন। ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে daisএর দিকে চেয়ে দেখলাম সেখানে মাও, চৌ এন লাই, মাদাম সন য়াৎ সেন, দালাই লামা প্রভৃতি নূতন রাষ্ট্রের সকল নেতারা রয়েছেন। মাও দাঁড়িয়ে কিছু বললেন, হল থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠলো, তারপর চৌ এন লাই মঞ্চ থেকে নেমে এসে অতিথিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর নাচের বাজনা বাজলো, আগন্তুকদের চক্রাকারে দাঁড় করানো হল। ছেলে বুড়ো কাউকে রেহাই দেওয়া হল না। সবাইকে হেলেদুলে সেই নাচে যোগ দিতে হ'ল। জলযোগের ব্যবস্থা প্রচুর ছিল। চীনের লাল মদিরা ও যাঁরা tee to taller তাঁদের জন্য লেমনেড ইত্যাদি পানীয় সহকারে 'টোস্ট' ও তার জবাবে আবার টোস্ট অনেকক্ষণ চলল। তারপর মাও প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতারা এই রূপে অতিথি সৎকার করে 'হল' থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে আমরাও চলে এলাম।

তিরিশে সকালবেলা আমরা রাজধানীর কলাকেন্দ্রে গেলাম। এখানে অনেকগুলি 'ক্লাস রুমে' দেখা গেল আধুনিক রীতিতে ছবি আঁকা হচ্ছে। কোথাও 'মডেল' (দু-একটি গরীব বুড়ো) সামনে রেখে ছবি বা প্লাস্টার অফ প্যারিস-এ প্রতিমূর্তি গড়া হচ্ছে। শোনা গেল যে নতুন চীনে শিল্পীদের খুব কদর, চাহিদা খুব বেশী, যোগান তত নয়। আর্টস্কুলে গরীব ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। সব দেখে মনে হল যে আধুনিক ললিতকলা (চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি) আজ চীনে ইয়োরোপের কাছে একটি robust objective style—একটি সবল বস্তুতান্ত্রিক শৈলী—শিখেছে বটে কিন্তু চীনের নিজের পুরানো exquisitely delicate touches—মনোরম, কমনীয়, হাল্কা তুলির স্পর্শ—হারিয়ে ফেলেছে। এ জগতের নয় আরও কোথাকার এর চেয়ে সুন্দর জগতের স্পর্শ আভাস আর চীনা আর্টে পাওয়া যাবে না।

সেদিন (তিরিশে) সন্ধ্যায় কংগ্রেসে বিদায়ের পালা হল। রুশ ও বুলগেরিয়ান অতিথিরা তাঁদের বিদায় ভাষণ দিলেন। ক্রুশ্চেভ আবার একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় চীনে দেশবিদেশের রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব রাখার প্রয়াস উল্লেখ করে খুব প্রশংসা করলেন। চীনের তাইওয়ান (ফরমোসা) পুনর্বার অধিকার করবার প্রস্তুতিরও উনি বিশেষ সুখ্যাতি করলেন। তিনি যাই তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, অমনি দুজন চীনা কর্মচারী আমাদের নেত্রী শ্রীমতী উমা নেহরুর কাছে এসে তাঁকে কিছু বললেন। তারপর উমাজী তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস হলের পাশে একটি ঘরে চলে গেলেন। আমরাও হোটেলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে জানা গেল উমাজী ফিরেছেন। উনি আমাদেরই মত চার তলার ঘরে থাকতেন। আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর কাছে শুনলাম ওঁকে মাওয়ের অফিস ঘরে নিয়ে গিছলো। মাও তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন শরীরে ও মনে স্বস্তি বোধ করছেন কিনা?' উমাজীও বেশ 'ডিপ্লম্যাটিক' উত্তর দিলেন। 'হ্যাঁ, আজ চীনের নেতা মাওয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে বাস্তবিক স্বস্তি অনুভব করছি।'

মাও হাসলেন আর দু-একটি কথা আমাদের মৈত্রী সঙ্ঘের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে সেকহ্যাণ্ড করলেন। এরপর উমাজীকে বিদায় দিলেন।

চৌ এন্ লাইয়ের সঙ্গে আমরা অনেকে দু-একটি কথা কয়েছি। অল্পস্বল্প হাসিখুশীর কথাও হয়েছে—কিন্তু মাও সেতুংএর সাক্ষাৎ পাওয়া কেবল আমাদের নেত্রী উমাজীরই হয়েছিল।

তিরিশে রাত্রি পিকিং যেন জেগেই কাটালো। ১লা অক্টোবর চীন জাতীয় দিবসের জন্য রাত জেগে প্রস্তুত হচ্ছিল।

পয়লা অক্টোবর, ১৯৫৪। বিশেষতঃ এই দিনটির জন্যই আমরা চীনে নিমন্ত্রিত হয়েছি। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করে আমরা তিয়েন আন্‌মেনএর (স্বর্গের শান্তির তোরণ) দিকে এগুলাম। সোজা রাস্তায় (আধ মাইলও হবে না) ভিড়ের জন্য যাবার উপায় ছিল না। অনেক গলিঘুঁজি দিয়ে পেছন দিক দিয়ে পৌছুন গেল। সিংহদ্বারের বাঁ দিকে খোলা বারান্দায় গ্যালারিতে আমাদের দাঁড়িয়ে দেখবার জন্য জায়গা করা হয়েছিল। কেবল উমাজীর জন্য একটি ছোট গদিওয়ালা চেয়ার এনে দিলে। দেশবিদেশের রাষ্ট্রদূতেরা দাঁড়িয়েই ছিলেন। আমাদের ঠিক ডান দিকে সিংহদ্বারের ঠিক ওপরে সিঁদুর রঙের সামিয়ানার নীচে মাও, চু-টো, লি সাও চি, চো এন্ লাই প্রভৃতি চীনের নেতারা দশটার সময় এলেন। অনেকগুলি ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজলো। তারপর দলে দলে পদাতিক, অশ্বারোহী, ট্যাঙ্ক আর্মাড কার, নৌবাহিনী ও এয়ার ফোর্সের সৈন্য মার্চ করে, নেতাদের স্যালিউট্ করে সামনে দিয়ে চলে গেল। তারপর এল এক শ্রমজীবীদের দল মাওয়ের বড় বড় ছবি নিয়ে। এরপর 'বয়' ও গার্ল স্কাউট (বাছা বাছা—ভাল পড়াশুনার জন্য যারা মেডেল পেয়েছে—বুকে মেডেল ঝুলিয়ে) তিয়েন আনমেনের সামনে এসে শত শত পায়রা উড়িয়ে দিলে। কৃষকরা এবার দেখা দিল, শস্যের আঁটি, ফল সব্জি কাঁধে করে। দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই 'প্যারেডে' যোগ দিয়েছিল। সবশেষে এল মায়ের দল—খোকাখুকী কোলে করে।

তিন ঘণ্টা লাগল শোভাযাত্রা শেষ হতে। অন্ততঃ ছয় লক্ষ লোক এই উৎসবে—এই 'প্রোসেশনে' যোগ দিয়েছিল।

১টার সময় যখন সব শেষ হল, মাও আমাদের গ্যালারির দিকে তাকিয়ে হাত ঘুরিয়ে আমাদের বিদায় দিলেন। যাঁরা বলেন যে চীনের কমিউনিস্ট রেভলিউসন একটি পার্টির কাজ, জনসাধারণের নয়, তাঁদের চীনে ১লা অক্টোবরের দৃশ্য একবার দেখে যাওয়া উচিত। এ যে জাতীয় উচ্ছ্বাস, কোন পার্টির বা ডিক্টেটরের হুকুমে এ রকম ছেলে বুড়ো শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী পুরুষ সবায়ের Mass demonstration সম্ভব নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় ধুমধামে আতস বাজি দেখানো হবে কথা ছিল—কিন্তু খবর এল যে তাইওয়ান (ফরমোসা) থেকে বম্বার মেঘের আড়ালে ঘুরছে—তাই শহরে

বেশী আলো না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা হল। তবে প্রায় সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় Yanko নাচ চলেছিল। সকালে উঠে শুনলাম যে আমাদের দলের কয়েকজন নাকি বেশ নেচেছিলেন। তার পরদিন (দোসরা অক্টোবর) পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ আমার হোটেলের ঘরে এলেন। আমার ও আমাদের গুডউইল মিশনের ডাঃ সত্যকেতু বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনা করলেন। ভাইস-চ্যান্সেলার সাহেব ফিলসফির প্রফেসার ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনভার সামলানো। এঁদের কাছে প্রথম শুনেছিলাম (পরে দু-এক জায়গায় পড়েওছি) যে মিং সম্রাট য়ুংলোর সময় চীনের অ্যাডমিরাল চেংহো ভারতবর্ষের বাঙলা, কেরল প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থান ঘুরে গেছেন—এর বিবরণ চীন ইতিহাসে পাওয়া যায়। ওঁদেরই কাছে শুনলাম যে টুংহুয়াঙে—'সহস্রবুদ্ধের গুহার' কাছে—একটি বৌদ্ধ যুগের প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বিভাগ খোলা হয়েছে। আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম যে চীনের মধ্যযুগের কোন Classic আমরা কি তর্জমার মাধ্যমে পড়তে পারি? তাঁরা দুজনেই একবাক্যে তৎক্ষণাৎ বললেন যে আপনারা Dream of the Red Chamber—সেই লালঘরের স্বপ্ন—পড়ুন, ওর ইংরাজি অনুবাদ আছে। আমরা আরও জিজ্ঞেস করলাম 'All Men are Brothers' (মানুষ সব ভাই ভাই), মাওয়ের প্রিয় পুস্তক, সেটি কেমন হবে? ওঁদের মতে প্রথম বইটি আমাদের বেশী ভাল লাগবে।

এই কথোপকথন আমাদের খুব ভাল লাগছিল—কিন্তু তাঁদের ইউনিভার্সিটির ক্লাস ছিল—তাঁরা চলে গেলেন। তাঁদের আমাদের ঘরে এসে এরকম কথাবার্তা কওয়ায় আমরা তো নিজেদের বিশেষ রূপে সম্মানিত মনে করলুম।

সেদিন দুপুরে নিউজিল্যাণ্ডের Rewi Alleyর সঙ্গে চীনের সমবায় (কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট) বিষয় আলোচনা হ'ল। Alley চীনের পুরনো Classical Poetry—শ্রেষ্ঠ কবিদের কিছু কবিতাও অনুবাদ করেছেন। Edgar Snowর উনি প্রিয় বন্ধু—Snow ওঁর 'On the other side of the river'এ R. Alleyর প্রশংসা করেছেন।

সেদিন (দোসরা অক্টোবর) সন্ধ্যাবেলা মহাত্মা গান্ধীর জন্মবাৎসরিক দিবসে আমরা ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের গৃহে একটি সম্মিলনীতে ওখানকার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করলাম। পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রের দূতও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের হোস্ট শ্রী রাঘবন খানিকক্ষণ পরে তাঁর লিগেসন অফিসে

চলে গেলেন—চৌ এন্ লাই সেখানে তাঁর কাছে গান্ধীজির জীবনী নিতে আসবেন, সেদিন সকাল বেলা বলে পাঠিয়েছেন। পরন্তুপে সেদিন আমাদের একটি মনে রাখবার মত কথা বলেছিলেন, "ষোলোশো, সতেরোশো বছর আগে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ যেমন চীনা ইতিহাসে জাতীয় জীবনে বিপ্লব এনেছিল তেমনি আজকের কমিউনিজমের আগমন এদেশে সেইরূপই গুরুতর পরিবর্তন এনেছে।" চীন দেশ বিদেশী প্রভাব মোটেই পছন্দ করে না—কিন্তু এর ব্যতিক্রম দুবার এই দেশের ইতিহাসে ঘটেছে—বৌদ্ধধর্ম ও কমিউনিজমের এখানে প্রভাব ব্যাপারে।

ঐ দিনেই বিকেল বেলা পিকিংএ রাশিয়ান এগ্‌জিবিশন দেখতে গেলাম। বিরাট প্রদর্শনী—বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জায়গার শিল্পের, কৃষি সামগ্রীর, কলকব্জার অতুলনীয় সম্ভার। ঐখানে একটি আদর্শ রেস্তরাঁ দেখানো হচ্ছিল। আমরা এক দরজা দিয়ে সেখানে ঢুকছি—আর এক দরজা দিয়ে ঢুকলেন মার্শাল বুলগানিন। আমাদের দেখে তিনি হেসে Salute করলেন। তারপর অন্যদিকে চলে গেলেন। এর কিছুদিন পরে বুলগানিন রাশিয়ার প্রাইম্ মিনিস্টার (প্রধানমন্ত্রী) হয়েছিলেন। কয়েক মাস পরে মীরটে বলতে পেরেছিলাম যে ব্রাহ্মণ আচার্যকে নমস্কার করেছিলেন বলেই সেই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে বুলগানিন প্রধানমন্ত্রী হ'তে পেরেছিলেন। বক্তৃতায় শ্রোতাদের একটু হাসানো দরকার।

তেসরা অক্টোবর—সরকারী গোশালা—চীনে গরুর নিতান্ত অভাব। চীন যাযাবর পশুপাল যুগে (pastoral stage) বোধহয় কোন কালে ছিল না—গোড়া থেকেই মনে হয় কৃষিকর্ম (agricalture stage) যুগে ছিল। এইখানে শহরের কাছেই ডাচ্, রাশিয়ান, মঙ্গোলিযান ও চীনের গরু, বাছুর সযত্নে রাখা হয়েছে। ভেতরে ঢোকবার সময় আমাদের নাক Mask দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল—আমাদের নিশ্বাসে যাতে গরুর কোন অসুখ না করে। বেশী হাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য গোশালাটির একদিকে খুব ঘন করে পপলার গাছ লাগানো হয়েছে। এই হল উইণ্ড স্ক্রীন। আরও একটু বড় হলে এটি দুর্ভেদ্য জঙ্গল হয়ে যাবে। এরি মধ্যে এই সরকারী farm থেকে কিছু লাভ হচ্ছে শুনলাম।

সেইদিনই (তেসরা অক্টোবর) কৃষি বিভাগের মন্ত্রী আমাদের বোঝালেন চাষবাস সমস্যা নতুন চীন কি করে সামলাচ্ছে আর এদিক দিয়ে সমাজতন্ত্র কেমন করে সম্ভব করা যায়। ১৯৫৩ সালে ভূমিস্বত্বাধিকার বিষয়ে আমূল পরিবর্তন

হয়েছিল। তিরিশ কোটি কৃষকের মধ্যে পাঁচ কোটি হেক্টেয়ার (এক হেক্টেয়ার = আড়াই একর) জমি বিতরণ করা হয়েছিল। [গ্রামাঞ্চলে নিশ্চয়ই রক্তপাত হয়েছিল—অ্যামেরিকান ঐতিহাসিকদের মতে লক্ষাধিক ভূস্বামী এই সময়ে প্রাণ হারায়। (মন্ত্রী মশাই এ বিষয়ে কিছু বলেননি) গাঁয়ের লোকেরাই এদের বিচার করে দণ্ডও দেয়।]

খুব ছোট ছোট ক্ষেতে চাষবাস লাভজনক হয় না। সে জন্য সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা প্রচলিত করতে খুব চেষ্টা হচ্ছে—আর ফলও পাওয়া গিয়েছে। তবে ভাল করে কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার চালু করবার জন্য কলেকটিভ ফার্মিং (সমবেত চাষ) দরকার। যেমন পাশাপাশি দু-তিনটি গাঁয়ের চাষের জমি একটি বড় ক্ষেতে পরিণত করে চাষ করা মন্ত্রী মশায়ের মতে ১৯১০ পর্যন্ত এদিকে অনেকটা এগুতে পারা যাবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা তখন শেষ হবে।

আমরা সেই রাত্রে পিকিং ছাড়লাম। রাজধানীটিকে বন্যা থেকে রক্ষা করবার জন্য কাছেরই একটি নদীতে বড় বাঁধ দেওয়া হয়েছে ও সেই সঙ্গে একটি বড় রকমের হ্রদেরও উৎপত্তি হয়েছে। সকাল বেলা (চৌঠা অক্টোবর) বাঁধ দেখলাম —এর আগে এরকম বাঁধ দেখিনি। এরপর মাইথনের বাঁধ (দুর্গাপুরের কাছে) দেখেছি—সেটি এর চেয়ে বড়ই হবে।

পিকিং-এ ফেরবার পথে চীনের ইতিহাসবিশ্রুত প্রাচীর দেখলাম—প্রায় তিন হাজার মাইল—সমুদ্রতীর থেকে। পশ্চিমের মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত—চীনের অধিষ্ঠাত্রী বিরাট ড্রেগন যেন পাহাড় পর্বত উপত্যকার উপর ঢেউ খেলিয়ে দেশ রক্ষা করছে। অশোকের সমকালীন চীন-সম্রাট শি-হুয়াংটি মঙ্গোল যাযাবরদের আটকাবার জন্য এই বৃহৎ প্রাচীর (জগতের সপ্তম আশ্চর্য) তৈরী করেছিলেন। অনেক জায়গায় এই বিরাট কীর্তি এখনও অটুট আছে। দেওয়াল খুব চওড়া—অন্ততঃ দশজন সৈনিক পাশাপাশি লাইন বেঁধে মার্চ করতে পারে—জায়গায় জায়গায় আরও চওড়া—ওখানে অনেক যোদ্ধা সমবেত হতে পারে। 'চীনের প্রাচীর' এখনও দেশ রক্ষার প্রতীক স্বরূপ রয়েছে—চীনের জাতীয় সঙ্গীত দেশবাসীকে রক্তমাংসের নতুন দেওয়াল তৈরি করতে ডাক দিচ্ছে। দেওয়ালের কোণে কোণে খুব ছোট হলদে ফুল ফুটে রয়েছে। কিছু ফুল পেড়েছিলাম দেশে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু ফুলগুলি রইল না—ঝরে গেল।

পাঁচই অক্টোবর Opera Actors Training School-এ আমাদের নিয়ে গেল সকাল বেলা। নতুন চীনে অপেরার খুব কদর—আর লোকশিক্ষার

(প্রোপাগাণ্ডাও বলা যায়) এ বেশ ভাল উপায়। এ সব অনুষ্ঠানে সরকারী সাহায্য মুক্তহস্তে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও কম নয়—যদিও এর কোর্স ন বছরের। বার বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশাধিকার আছে। একুশ বছর বয়সে পুরোপুরি Opera Actor-Actress হয়ে বেরুবে। তিন-চারশত বছর পুরনো ও আজকালকার নতুন নাটক—দুই রকমেরই অভিনয় দেখানো হয় —আর সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত জিমন্যাস্টিকের মত শারীরিক ব্যায়াম সব শিক্ষার্থীদের করতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা থিয়েটারে কমিউনিস্ট বিপ্লবের একটি নামকরা নাটক 'লিউ হুলান' দেখলাম। নায়িকা লিউ হুলান একটি বিপ্লবী বীরাঙ্গনা। শেষ অঙ্কে নিজের প্রাণটি দিলো, তবে নিজের কাজ পুরো করতে পারলো। থিয়েটারে খুব ভিড় ছিল। 'লিউ হুলান' এখন কমিউনিস্ট বিপ্লবের জান্ ডার্ক (মধ্যযুগের ফ্রান্সের বীরাঙ্গনা)।

ছয়ই অক্টোবর—পিকিং মিউনিসিপ্যাল তিন থেকে সাত বছরের বাচ্চাদের স্কুল দেখতে গেলাম। সরকারী আমলাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এই স্কুল। এখানে বই খাতাপত্রের বালাই নেই। খেলা, নাচগান, নিজেদের কাজ নিজেরাই করা— (বড় ছেলেমেয়েরা ছোটদের দেখবে শুনবে এর ব্যবস্থা, এই স্কুলের বিশেষত্ব) স্কুলটি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বাচ্চাদেরই এই পরিষ্কার রাখা কাজ। অল্প-সল্প বাগানের কাজও করে। নিজেদের হাতের ফুল, সব্জী করা—এও তো একটা খেলা। ১, ২, ৩, সংখ্যা গণনা শেখানো হয়। তাছাড়া আমরা যাকে লেখাপড়া বলি সেরকম এখানে কিছুই নেই। খুব হাসিখুশি নাচগান বাচ্চাদের—আমাদেরও নাচিয়ে ছেড়েছিল। চীনে খোকারা ওজনে বেশ ভারি—একটি বছর তিনেকের বাচ্চাকে কোলে করে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। স্কুলটি বড় ভাল লেগেছিল। বাচ্চাদের খেলাধুলায় আমোদ-আহ্লাদে ভরপুর এই জায়গাটি সুখশান্তির একটি ছবির মত মনে রয়ে গেছে।

সেই দিন বিকেলে Prof. Yin Ta আমাদের হোটেলের ঘরে এলেন ও আমার ও বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে দেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন। যদিও উনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের একজন বিশেষজ্ঞ তবুও আধুনিক যুগের কথা ভাল করেই বুঝিয়ে ছিলেন।

আমার প্রশ্ন ছিল, চীনের নতুন সরকারকে এখন দেশটিকে সব বিষয়ে নতুন করে গড়তে আর সেই সঙ্গে বিরাট সামরিক আয়োজনও করতে হচ্ছে—কি রূপে একাজ সম্ভব হচ্ছে?'

এর উত্তরে প্রঃ য়িন টা বললেন, এ প্রশ্নের 'মাওএর উত্তর হল 'নিজের পরিশ্রমের ফল দিয়ে' (By your own work)।'

জাপানের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলছিল—তখনও অবস্থা এর চেয়েও খারাপ ছিল। আর এখন তো ঐ চারটে পরিবার—চিয়াং, চেন, কুং, সুং—নেই—যারা দেশটাকে লুটছিল। আর এখন কাস্টমস্ ডিউটিস (আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক) নিজেদের হাতে—মাঞ্চু রাজত্বেও আয়টি বিদেশীর হাতে ছিল। তাছাড়া বিলাসের জিনিস আর তো বিদেশ থেকে আসছে না। দেশেও খুব কমই তৈরি হচ্ছে। দেশের পুনর্গঠনের কাজেই এখন বেশী ব্যয় হচ্ছে সৈন্যসামন্তের উপর তত নয়।

আর আসল কথা হল দেশবাসীর উৎসাহ ও উদ্যম। তাদের মনে পুরো বিশ্বাস আছে যে এত অশান্তি ও যুদ্ধের পরেও তারা দেশে আবার সুস্থ সবল অবস্থা আনতে পারবে।

আমাদের আর একটি প্রশ্ন ছিল যে দক্ষিণ চীন কি উত্তর চীনের মত নতুন কমিউনিস্ট সরকারের উপর আস্থা রাখে (কমিউনিস্ট বাহিনী উত্তর দিক থেকে তাদের জয়যাত্রা আরম্ভ করেছিল)?

প্রঃ য়িন টার উত্তর, দক্ষিণ-চীনই চিরকাল বেশী বিপ্লবপন্থী, তাইপিং ক্রান্তি তো মনে আছে? তাছাড়া চিয়াং কাই শেক দক্ষিণেরই বেশী কাছে আছে, তার উপদ্রবের আশঙ্কা এই দিকে বেশী। উত্তর ও দক্ষিণবাসীদের মনোভাবে তফাৎ নেই। মাওয়ের উপর আস্থা দুয়েরই আছে।

আমরা এবার জিজ্ঞাসা করলাম এখানকার ঐতিহাসিকরা এই সমসাময়িক ঘটনাগুলির উপর লেখা শুরু করেছেন কিনা? আমরা তো ইতিহাস নিয়েই কাজ করি তাই আমরা নিজেরাও বিশেষ উৎসুক এই সব world shaking events ভাল করে জানতে। য়িন টা বললেন যে Chinese Modern History References দশ খণ্ডে বেরুচ্ছে। পাঁচ খণ্ড ছাপাও হয়ে গেছে। আরও বললেন যে ইংরাজি People's China পাক্ষিক পত্রে এ থেকে কিছু বাছা বাছা অংশ শীঘ্রই আপনারা দেখতে পাবেন।

যদিও য়িন টা সম্পূর্ণ অন্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, তা সত্বেও সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিষয়ে তাঁর মন্তব্য আমার খুব ভাল লেগেছিল। বিদ্যালঙ্কার কিন্তু বিরক্ত হয়েছিলেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধ্যাপক পাঠাবার কি দরকার ছিল —আধুনিক ইতিহাসের লোক কি ছিল না?

সাতই অক্টোবর—বিজয়া দশমী—আমরা পরস্পর বিজয়ার সম্ভাষণ আদান-

প্রদান করলাম। তারপর পিকিং হোটেলের সাততলার ওপর ছাতের বারান্দায় বসে মিঃ শি-মু চাওএর কাছে চীনের আর্থনীতিক পরিকল্পনার কথা শুনলাম। উনি চীন সরকারের আর্থনীতিক গঠনমূলক সমিতির সদস্য আর নিজেও একজন অর্থ-বিত্তাবিদ। এঁর ভাষণটি বাস্তবিক বহু তথ্যপূর্ণ হয়েছিল তাই এর বিশেষ উল্লেখ করা উচিত—চীন সরকারের ব্যয়ের শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ গঠনমূলক খরচ করা হচ্ছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগ হচ্ছে কলকারখানা—একটি কৃষিপ্রধান দেশকে উন্নততর স্তরে তোলবার জন্য এরকম করা দরকার ছিল।

এই কাজ ঠিক করবার জন্য চাই দেশে শান্তি। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তো দেশে একটি নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থা চালু করবার চেষ্টা চললো। ১৯৫৩ সাল থেকে গঠনমূলক কার্য আরম্ভ হল। ১৯৫৩ সালের গ্রীষ্মকালের আগেই পুরনো জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে তারা গিয়েছিলো। এর ফলে সাড়ে বার কোটি একর জমি তিরিশ কোটি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হল।

গরীব চাষীদের জমি তো দেওয়া হ'ল—কিন্তু ছোট ছোট ক্ষেত থেকে যে ফসল পাওয়া যায় তার পরিমাণ তো বেশী আশা করা যায় না। আর এতে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় না। এর জন্যে সমবায় প্রথা অবলম্বন করা হচ্ছে। বছর খানেকের মধ্যে এক কোটি কৃষক এই রকম পাঁচ লক্ষ সমবায় সমিতিতে যোগ দিয়ে কৃষিকার্যে এক নতুন যুগ আনবে।

কুয়োমিন্টাং শাসকদের সময়ে চারটি পরিবার (কিয়াং, কেন্, কুং, শুং) কয়েকটি লাভজনক শিল্পজাত দ্রব্যের নির্মাণ নিজের হাতে রেখে এ রকম অসৎ উপায়ে অনেক ধন উপার্জন করেছিল। এখন আর সে রকম হতে পারে না। বড় বড় কলকারখানার কাজে এখন শ্রমিকদের বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়। শ্রমিকদের উৎসাহ দিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রসর করা হচ্ছে।

শি-মু চাও বেশ জোর দিয়েই বললেন যে রাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প ব্যবসায়গুলিই বেশী লাভদায়ক হয়েছে। কিন্তু এখনও তো কেবল সরকারী ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে চলা যায় না—তাই ব্যক্তিগত ব্যবসায় কিছুদিন টিকে থাকবে। তবে এগুলি স্বার্থপর, দেশবিদ্রোহী ব্যক্তির হাতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না।

আর এমন কোনো কাজও ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) হাতে থাকতে দেওয়া হবে না যা দেশের পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি করে নেবার দরকার।

রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যবসায়ের মধ্যে লোহা, ইস্পাতের বড় বড় কারখানা থেকে সরকারের সবচেয়ে বেশী আয় হয়েছে। এই সব কারখানায় তৈরী দ্রব্যের পরিমাণ

আগেকার সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন সামগ্রীর দ্বিগুণ হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয়কৃত শিল্পক্ষেত্রই হবে দেশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আয়ের উপায়। মিঃ শি-মু চাও বললেন যে এখন 'হেভি ইণ্ডাষ্ট্রি' (বড় বড় 'মেশিন' নির্মাণ করা) হ'ল সবচেয়ে দরকার। এর (হেভি ইণ্ডাষ্ট্রির) উন্নতি না হলে আধুনিক প্রণালীর কৃষিজাত, শিল্প, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদিতে কিছুই উন্নতি হবে না। এর খরচ মেটাবার জন্য সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। বহির্বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির অনেকটাই সরকারের হাতে। ব্যাঙ্কিংও রাষ্ট্রের হাতে আছে (সেইদিনই বাণিজ্য বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সন্ধ্যাবেলায় এই কথা আমাদের বলেছিলেন) ও রাষ্ট্রপরিকল্পিত পিপলস্ ব্যাঙ্ক অফ চায়না দেশের বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব রাখে।

প্রাইভেট্ ব্যাঙ্কগুলি—এখনও যেগুলি টিকে আছে—ঐ স্টেট ব্যাঙ্কের আদেশানুসারে কাজ করছে।

একটা বড় রকমের অসুবিধা এখনও রয়েছে মিঃ শি-মু চাওএর মতে—তা হল সুদক্ষ শিল্পীর (ট্রেন্ড ওয়ার্কিং পারসোনেলের) অভাব। ১৯৫৪ সালে রুশ দেশীয় বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট করছিলেন—রুশ মিস্ত্রী, এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি—আমরাও মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণকালে অনেক দেখেছি। আর এও দেখেছি চীনা মিস্ত্রীরা (স্ত্রী-পুরুষ) কেমন ভাল কাজ শিখছে।

চীনের আজকাল যে মুদ্রার চলন (কারেন্সী) তা সত্যিই আশ্চর্য হবার ব্যাপার। চিয়াং কাইশেকের শাসনকালের শেষ দিকে 'য়ুআনের' মূল্য প্রায় কিছুই ছিল না। বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে হোটেলে 'ডিনার' খাবার আগে খাবারের যা দাম ছিল—'ডিনার' শেষ হবার সময় দাম ডবল হয়ে যেত। লাখ খানিক 'য়ুআন' (তখন K. M. T. নোট—দশ লাখ ৫০ লাখ এই রকমই হত) লাগতো গৃহস্থের সাধারণ ব্যবহারের সামগ্রী কিনতে। এই ধাক্কা সামলাতে হল নতুন কমিউনিস্ট সরকারকে—আমরা যখন চীনে ছিলাম তখন পাঁচ হাজার 'য়ুআনের' নোট K.M.T. যুগের বোধ হয় পাঁচ লাখের জায়গায় বাজারে চলছিল। আমাদের এক টাকার সমান ছিল পাঁচ হাজার 'য়ুআন' নোট। সত্যি এই সুকৃতিত্বের দৃষ্টান্ত। এর পরের বছরেই—১৯৫৫ সালে নতুন 'য়ুআন' নোট ছাপা হল। এক য়ুআন—দু টাকা (ভারতের) সমান মূল্যের। এই 'এক্সচেঞ্জ রেট' বিনিময় হার এখনও চলতি রয়েছে (১ য়ুআন = ২ টাকা)। কুয়োমিণ্টাং যুগের 'রান্ অ্যাণ্ড ইনফ্লেশন' এই রকম করে ধাপে ধাপে সামলানো হয়েছে। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান মার্কের মূল্যের পতন তখন অবিশ্বাস্য বোধ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাও এতটা হয়নি। এসব অর্থনীতির কথা পাঠকের (যদি এ লেখার পাঠক কখনও হয়) ভাল লাগবে না—বিষয়টি বদলানো যাক।

তার পরদিন—৮ই অক্টোবর—আমরা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। চীনের রাণী সুশীর গ্রীষ্মাবাসের খুব কাছে প্রায় রাস্তার এধার ওধার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু একর বিস্তৃত হাতা (grounds)। ঢুকে বোধ হল যেন একটি সুন্দর পার্কে প্রবেশ করলাম। কেমেস্ট্রি ল্যাবরেটরী জলের ট্যাঙ্কটিও প্যাগোডার আকারে তৈরি হয়েছে আর বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগগুলি খানিকটা সেই প্রাচীন চীনের স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত। সায়েন্স ব্লকগুলি অবশ্য আধুনিক প্রণালীতে তৈরী। দেবদারু, ফার, সাইপ্রেস, উইলো (একটি হ্রদের চারিপাশে) জায়গাটিকে প্রায় নিকটবর্তী 'সামার' প্যালেসের মত সুন্দর করে রেখেছে। আর ঐ প্যাভেলিয়নের মতই একটি হলে পিকিং য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর আমাদের বসালেন ও ওখানকার শিক্ষাপদ্ধতির কথা কিছু বললেন। তাঁর ভাষণটি শুনে অনেক নতুন খবর পেলুম।

১৮৯৮ সালে যখন চীনের যুবক সম্রাট আর তাঁর মাসীমা—'সুশীর' মধ্যে খুব মনকষাকষি চলছে—দেশটাকে কতটা আধুনিক করা যায় এই নিয়ে—সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়টির পত্তন হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ৪ঠা মে ১৯১৯-এর ঐতিহাসিক ছাত্র বিক্ষোভ চীনের সে সময়ের শাসনকর্তাদের পরাভব স্বীকার করায়। কার্ল-মার্ক্স-এর গ্রন্থাবলীর চর্চা এখানেই শুরু হয় ও মাও সেতুং প্রভৃতি নেতারা এই শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই বিদ্যালয়েই যে বীজ বপন করা হয়েছিল—আজ তারই ফল জগৎসুদ্ধ দেখছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন প্রধান কাজ হচ্ছে নতুন চীনের নতুন কর্মচারীদের অর্থনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, অঙ্কশাস্ত্র ও 'মার্কসবাদে' সুশিক্ষিত করা। এখনকার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ হাজার দুশো ; পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসগুলিতে দুশো নব্বই। উপরকার ক্লাসগুলিতে সংখ্যা কম—কারণ নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষিত কর্মীদের যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশী—গ্রাজুয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার নির্ধারিত কাজে নিযুক্ত হতে হয়। এখানে কাজ নেই, রোজগার নেই, বাড়ি বসে থাকা—লোকের ভিড় এখনো তো হয়নি।

কৃষক ও কলকারখানার শ্রমিকদের জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এখানে আছে। প্রায় আটশত কৃষক ও শ্রমিক এই রকম

শিক্ষা পাচ্ছে। এ ছাড়া আলাদা 'পিপলস্ য়ুনিভার্সিটি' (জনসাধারণের শিক্ষাকেন্দ্র) আছে—যেখানে যাদের হাতের কাজ বেশ ভাল, তারা সে সব কাজের 'থিওরি' ও 'সায়েন্স' বিষয়টাও শেখবার সুযোগ পায়। তারা এর জন্য সরকারী অর্থসাহায্যও পেয়ে থাকে।

গত পাঁচ বছরে (১৯৪৯-১৯৫৪) পাঁচ কোটি টাকা (আমাদের ভারতের টাকা) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে খরচ হয়েছে। এখন বড় বড় 'সায়েন্স ব্লকস্' তৈরি হচ্ছে। যে ঘরে ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব আমাদের এসব বললেন তার চারিধারে সুন্দর সুন্দর 'বামন' গাছ (ডোয়ার্ফ ট্রিস, দেবদারু, চীর প্রভৃতি) সুন্দর চীনেমাটির টবে সাজানো রয়েছে।

এর পর ঐ য়ুনিভার্সিটির 'ডীন'দের কাছে চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থার আরও কিছু তথ্য আমরা পেয়েছিলাম।

গ্র্যাজুয়েসন্‌এর জন্য (আমাদের বি. এ. তুলনীয়) চার বছর পড়তে হয়। শীঘ্রই পাঁচ বছরের কোর্স করে দেওয়া হবে। ইতিহাস ও গণিতের সব ছাত্রদের মার্কসবাদ ও চীনের রেভলিউসানারি হিস্ট্রি (চীন বিপ্লবের ইতিহাস) পড়তে হয়। অনেকেই রাশিয়ান শেখে। তবে চীন পুরাতন ঐতিহ্য ভুলতে চায় না। পুরাতন সাহিত্যের বাছা বাছা বিষয়ের ওপর গবেষণার কাজ চলছে। কাছাকাছি প্রাগৈতিহাসিক স্থানগুলিতে ছাত্ররাই খোদাই কাজ করছে।

এখানে বছরে দুইবার পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার মৌখিক প্রশ্নোত্তর রীতির প্রচলন সবায়েরই ভাল বোধ হচ্ছে। যাতে কেউ 'ফেল' না হয় এ বিষয়ে পরীক্ষকদের বিশেষ দৃষ্টি আছে—কারণ পরীক্ষার্থী 'ফেল' হলে শিক্ষক ও সহপাঠীদেরই সমানভাবে দোষী মনে করা হয়। মাও নিজে ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশ দিয়েছেন—"থাকো ভাল করে (স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে), পড়ো ভাল করে, কাজ করো ভাল করে (দেশের জন্যে)।" দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা ঘুমানো। অন্ততঃ এক ঘণ্টা খেলাধুলা আর সপ্তাহে চুয়ান্ন ঘণ্টা পড়াশুনা (class work and attendance সমেত)—এই হ'ল শিক্ষার্থীদের জন্যে চীনের সব য়ুনিভার্সিটির (সংখ্যায় একুশটি) তরফ থেকে বিশেষ নির্দেশ।

সেইদিনই (৮ই অক্টোবর) শিক্ষা বিভাগের দপ্তরে আমরা ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টারের কাছে ওখানকার জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে আরও তথ্য শুনলাম। স্কুল শিক্ষার প্রথম ধাপ হল 'কিণ্ডারগার্ডেন'—তিন থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যে। এ স্তরে লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা, ছবি ইত্যাদির

মাধ্যমে বিদ্যারম্ভ হয়। দ্বিতীয় ধাপ হল 'প্রাইমারি স্কুল'—ছয় বছর ব্যাপী, তারপর 'মিড্‌ল স্কুল' স্তর। কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য এই দুই স্তরে (প্রাইমারি ও মিড্‌ল স্কুল পর্যায়ে) তাদের অবসর সময়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এখন প্রাইমারি স্কুল স্তরে শতকরা আশীজন শিক্ষার্থী কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর। য়ুনিভার্সিটি স্টেজেও শতকরা ২৩ জন এই শ্রেণীর।

পাঠ্যপুস্তক অনেক বদলাতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হাতে এ কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৫২ সালের সংখ্যার দ্বিগুণ।

মাওএর মতে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের উন্নতিরও বিশেষ প্রয়োজন। নিরক্ষরতা সমস্যা দূর করবার জন্য দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক দেশ জুড়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের অভিযান চালাচ্ছেন। সবচেয়ে দরকার বড় বড় কলকারখানায় শ্রমিকদের ভাল করে লেখাপড়া শেখানো। মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ভাষণের শেষে স্কুলে 'পঞ্চপ্রেম' শিক্ষা দেবার উল্লেখ করেছিলেন। পাঁচটি ভালবাসবার বিষয় হল—দেশ, দেশের লোক, পরিশ্রম, জনসাধারণের সম্পত্তি (রাস্তাঘাট প্রভৃতি)।

সেদিন (৮ই অক্টোবর) সন্ধ্যায় আমরা চীন-ভারত মৈত্রী সংঘের কাছে বিদায় নিলাম। ডাঃ চেন্‌ হুং মৃংকে (ইনি তার পরের বছর আমাদের দেশে এসেছিলেন) ধন্যবাদ দিয়ে পিকিং-এর কাজ শেষ হল। শুতে গিয়ে দেখি যে আমাদের ঘরে ঘরে সংঘের উপহার বিছানার পাশে রাখা আছে।

৯ই অক্টোবর দুপুর বেলা পিকিং হোটেল ছেড়ে স্টেশনে পৌঁছুলাম। হোটেলের চাকরবাকরেরা বক্‌শিশ্‌ নিলো না। চীনা বন্ধুদের পরামর্শ অনুসারে তাদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে তাদের ধন্যবাদ দেওয়া গেল। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে চীন-ভারত মৈত্রী সংঘের বন্ধুরা আমাদের গাড়িতে চড়িয়ে বিদায় দিলেন। গাড়ি এবার উত্তর দিকে চললো—মাঞ্চুরিয়ায়।

তার পরদিন—১০ই অক্টোবর আমরা বেলা দশটায় মুক্‌ডেন্ (এখন এর নাম সেন্‌ইয়াং) পৌঁছুলাম।

মাঞ্চুরিয়া এই শতাব্দীর রণাঙ্গন। কয়েকবার চীনের হাতে এর হস্তান্তর হয়েছে। রুশের হাতে দুবার গিয়েছিল—জাপানের হাতেও বেশ কয়েক বছর ছিল। এখন আবার চীনেরই অংশভূত হয়েছে। এই মাঞ্চুরিয়া থেকেই চীনের শেষ রাজবংশ (মাঞ্চু বা চিং বংশ) এসে চীনে আধিপত্য বিস্তার করেন। চীনের

শেষ সম্রাট 'পুয়ি' শৈশবে তো চীন সাম্রাজ্য হারান, তবে জাপানীরা তাঁর যৌবনে তাঁকে মাঞ্চুরিয়ার সিংহাসনে বসিয়েছিল—'মাঞ্চুকুয়ো সম্রাট' এই নতুন উপাধি দিয়ে। সে সিংহাসনটিও হারিয়ে এখন তিনি পিকিংএ সাম্যবাদী সরকারের আফিসে কাজ করেন আর ঐ শহরের বাগানগুলির দেখাশোনা করেন। জীবনে অনেক ওলটপালট তিনি দেখেছেন।

মুকডেন্ শহরে জাপানী 'অফিসারস মেসে' আমরা উঠলুম। পিকিংএর রাজ-সূয় সমারোহের পরে এ ব্যবস্থা আমাদের কয়েকজনের মনঃপূত হল না। সকালে পেট ভরে এখানকার আপেল খেলাম, এরকম সুস্বাদু আপেল খুব কমই খেয়েছি, ব্রেকফাস্ট রুটি মাখন চায়ের সঙ্গে খেয়ে মুকডেন্ শহরের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের পাশ দিয়ে একটি শহরতলীতে বত্রিশ হাজার শ্রমিকদের জন্য তৈরি একশো সতরটি বিরাট ত্রিতল বাসভবন দেখতে গেলাম। আরও এ রকম 'ব্লক' তৈরী হচ্ছে। শীঘ্রই আড়াই লক্ষ শ্রমিক এই শ্রমিক নগরে বাস করবে। আমরা দু-একটি ব্লকে ঢুকেছিলাম। দু-তিনজন শ্রমিক গৃহিণী আমাদের তাদের নিজের ঘর দেখায়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খুব সাদাসিদে ব্যবস্থা। ব্লকের ছোট ছেলে-মেয়েদের নাচগানেরও ব্যবস্থা আছে।

মাঞ্চুরিয়াতে লোহা ও কয়লা দুয়েরই কোনো অভাব নেই। রুশ ও জাপান দুই রাষ্ট্রেরই এখানে খুব বড় রকমের কলকারখানার আয়োজন করবার চেষ্টা ছিল। জাপানীরা 'ইস্পাতের উৎপাদনের জন্য বিরাট বিরাট' ফ্যাক্টরী মুকডেন্ শহরের আশেপাশে নির্মাণ করেছিল। চীন সরকার সেগুলিকে আরও বাড়িয়েছে, আর পুরো উদ্যমে এখানে কাজ চলছে।

এ কাজে রুশ বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করছেন। আর চীনে ছাত্রছাত্রীরা এদের কাছে প্রয়োগকৌশল শিখে খুব ভাল করেই কাজ চালাচ্ছে।

এখানকার বড় যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানায় (Tool-making heavy industries) দেখলাম যে অল্পবয়সী মেয়েরা (যারা অল্পদিনই হ'ল কলেজ ছেড়েছে) কেমন অনায়াসে এখানে ওখানে 'সুইচ' টিপে সত্তর-আশি মণ ওজনের লোহার কল এদিক ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এও দেখলাম যে অতি সূক্ষ্ম কাজও, যেখানে একটু নড়েচড়ে গেলে আঙুল উড়ে যাবে, তাও কেমন সুনিপুণ ভাবে করছে। আর যে কেবল হাতের কাজই করছে তা নয়, এইসব কারখানায় নানা বিভাগ আছে, এই রকম কয়েকটি বিভাগে ডিরেক্টর (অধিকর্ত্রী) হলেন রীতিমত ঐ কাজের উপযুক্ত মহিলা। তাঁদের মধ্যে একজন নাকি চীনের

বহু বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। এর স্বামী সৈনিক পুরুষ—মিলিটারি অফিসার—চীনের কোনও সীমান্ত প্রদেশে থাকেন, ইনি পুত্র কন্যা নিয়ে এখানে এই কাজের ভার নিয়েছেন। আমাদের আশ্চর্য বোধ হল যে মহিলাটি মোটেই 'জাঁদরেল' গোছের নন, তিনি বেশ গিন্নীবান্নী ধরনের হাসিখুশীতে ভরা একটি প্রৌঢ়া রমণী।

মুকডেনের কাছেই 'আনশান' যেন একটা দৈত্যপুরী। প্রকাণ্ড 'চিমনি', জ্বলন্ত 'ফার্নেস', গ্যাস রাখবার বিরাটকায় 'কন্‌টেনার', চারি দিকে কলকারখানা। টাটানগর দেখিনি, এরপর দুর্গাপুর, বার্ণপুর দেখেছি, 'আনশান' এ দুই জায়গার চেয়ে অনেক বড়। হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ শ্রমিক এখানে কাজ করছে। লোহা, ইস্পাতের 'আনশান'ই হল প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। ১৯৪৯-১৯৫৪ এই পাঁচ বছরে মাঞ্চুরিয়া আশাতীতরূপে লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন করেছে। এই বৃদ্ধির হার বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

আমরা রোজ সকালে এইসব জায়গা দেখতে যাই মুকডেনের আমাদের জাপানী আমলের অফিসারস মেস থেকে। দুপুর বেলার আহার হয় এর কোনো একটি 'ফ্যাক্টরী'র ভোজনালয়ে। এত বড় সব কলকারখানা কিন্তু কোথাও অপরিষ্কার কিছু চোখে পড়েনি। যা খেতাম বিশেষ করে যে ফল মাঞ্চুরিয়ায় খেয়েছি, বাস্তবিকই চমৎকার ছিল। আনশানে খুব ছোট নাসপাতি দেখলুম গোছা গোছা চেরীর মত। খেতে কাশ্মীরের বিখ্যাত 'বব্বুগোশা'রই মত।

সন্ধ্যাবেলা মুকডেনে একদিন আমাদের 'কমলনৃত্য' দেখানো হ'ল! যে মেয়েরা এই 'ব্যালে' দেখিয়েছিল, বোধ হয় তারা এই কলকারখানাতেই কাজ করে, তবে নাচগান এরা সত্যিই খুব ভাল শিখেছে। নাচের পোশাকের 'স্কার্ট'-গুলি পদ্মের আকারের, আর পদ্মফুল তার ওপর আঁকা—এই 'কমলনৃত্যে' বোধ হয় সরোবরে যেন পদ্মফুল হাওয়ায় দুলছে।

আমাদের দোভাষী হয়ে একটি 'সাংঘাই' কলেজের মেয়ে পিকিং থেকে এসেছিল—কুমারী লী; সেদিন এ মেয়েটি পুরাকালের রাজকন্যার বেশে স্টেজে নেমে ব্যালের প্রত্যেক 'অ্যাক্ট' ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

একদিন মুকডেন থেকে বেরিয়ে আমাদের বাসের রাস্তার পাশে একটি উঁচু জায়গার ওপর সুন্দর একটি পার্কের মত দেখলাম—মনে হ'ল যেন বিখ্যাত সুং বংশের সময়ের আঁকা একটি দৃশ্যের ছবি; শুনেছিলুম ঐটি হল মাঞ্চুসম্রাটদের সমাধিস্থল।

এরই মধ্যে এক দুপুরে ফুশানে আমরা এক কয়লার খনিতে নামলাম। আমাদের মাথায় টুপি পরানো হ'ল; ইলেকট্রিক্ আলো দেওয়া লিফ্‌টে হাজার ফীট্ নামলাম—তারপর লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে প্রেতপুরীর গলির মত খনির গলির মধ্যে খানিকক্ষণ ঘুরলাম। চারিদিকে জল পড়ার শব্দ আর কিছু খোঁড়া হচ্ছে তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গলিতে 'রেল' পাতা আছে। রেলের ওপর দিয়ে ট্রলি কয়লা ভরে নিয়ে এদিকে ওদিকে চলছে। এর আগে কখনো কোনো খনি দেখিনি। আমার পক্ষে এ তো পাতালপুরী দর্শন হল।

মাঞ্চুরিয়ায় ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত আমরা ছিলাম। এখানে শীত প্রচণ্ড। আমাদের রাশিয়ান ওভারকোটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের এখান থেকে চলে যাবার দুদিন পরেই শুনলাম এখানে 'স্নোফল' (তুষারপাত) হল।

মুকডেন থেকে বিদায় নেবার দিন আমাকেই বিদায়ভাষণ দিতে বলা হয়েছিল। আমার সেদিন যেন প্রেরণা এসেছিল—আমি বললাম: এই মাঞ্চুরিয়া থেকে বার বার শত্রু চীন জয় করবার জন্য অভিযান আরম্ভ করেছে—এখন মাঞ্চুরিয়া চীনের দুর্ভেদ্য অস্ত্রাগার হয়েছে—কার সাধ্য আর চীনকে বিব্রত করে! এই কথাগুলি শুনে শ্রোতারা জোরে হাততালি দিয়েছিল।

চীন যাত্রার উত্তর দিক শেষ হল—এবার পশ্চিম চীন অভিমুখে যেতে হবে। ফিরে পিকিংএর দিকে খানিকটা পেছুতে হ'ল। দুপুর বেলা টিয়েন সিন্ স্টেশনে পৌছুলাম। গাড়ি থেকে চীন সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল, চীনে নৌকা-(Junk)গুলি পাল তুলে যাচ্ছে, সবটাই সুন্দর ছবির মত দেখাচ্ছিল। একশো বছর আগে এখানে চীন একদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আর একদিকে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল, কারণ চীন সমুদ্র থেকে জলপথে পিকিং যাবার এই হল একমাত্র রাস্তা। এইখানেই টাকু দুর্গ নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পিকিংএর প্রবেশদ্বার রক্ষা করছে। এই দুর্গ জয় করতে ইয়োরোপীয় নৌবাহিনীকে অনেক যুঝতে হয়েছিল। একবার এদের হার মানতেও হয়েছিল।

আমাদের রেলগাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দলের অনেকেই দিব্যি আরামে দিবানিদ্রায় মগ্ন। এমন সময়ে মস্ত একটি 'রেলওয়ে ট্রেন' এসে পাশেই থামলো। গাড়িটি কিছু বিশেষ রকমের, আমরা যে কজন ঘুমুইনি কাছে গিয়ে জানলাম যে ঐ ট্রেনটি হ'ল ট্রান্সকন্টিনেণ্টাল-লেনিনগ্রাড-পিকিং ট্রেন। সমস্ত ইয়োরোপ ও এশিয়ার সবচেয়ে চওড়া দিকটা পার হয়ে এসেছে। আমাদের চীনা গাইডকে ধরে ঐ রুশীয় 'ট্রানস্‌কন্টিনেণ্টালের' গার্ডকে অনুরোধ করা গেল

যে আমাদের ঐ ট্রেনের ভিতরটা যেন দেখতে দেয়। এই অনুমতি তৎক্ষণাৎ নিয়ে আমরা গাড়িতে ঢুকে 'এঞ্জিন' থেকে শুরু করে গার্ডের কেবিন পর্যন্ত বেড়িয়ে এলাম। ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলি বড় সুন্দর, টাটকা ফুলের তোড়াও রয়েছে ছোট ছোট টেবিলের ওপর। থার্ড ক্লাসের কোন বাহার নেই। তবে বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। আমরা গাড়ি থেকে নেমে আসবার খানিকক্ষণ পরেই গাড়ি ছেড়ে দিল—আধ ঘণ্টার মধ্যেই পিকিং পৌঁছে কত হাজার মাইলের 'সফর' শেষ করলে। আমরা এবার গিয়ে আমাদের 'কুম্ভকর্ণ' সহযাত্রীদের ঘুম ভাঙালাম আর ট্রানস্‌কন্টিনেণ্টাল ট্রেনের খবর সবিস্তারে বললাম। তারা তো রেগেই আগুন, কেন তাদের জাগানো হয় নি। এর উত্তর ছিল যে ইয়াংসে পার হবার সময় যখন আমাদের গাড়ি দু টুক্‌রো করা হল আবার জুড়ে দেওয়া হল তখন আমাদের তো তোমরা জাগাও নি।

এবার আমাদের পশ্চিমমুখে লম্বা পাড়ি, 'হোয়াংহো' পার হয়ে 'গ্র্যাভেলে'র মত আল্‌গা-চুরো পাথরের পাহাড়ের পাশ দিয়ে (যে রকম জায়গায় মাও য়েনানের গুহায় নিজের শিবির স্থাপন করেছিলেন আঠারো বছর আগে—১৯৩৬-এ)। আমাদের হাতে অফুরন্ত সময় তখন, আমরা আমাদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে 'স্পেশ্যালিস্ট' যাঁরা তাঁদের ভাষণ শুনলাম, আমাদের ট্রেনের ড্রয়িংরুমে বসে। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র (আমাদের দলের উপাধ্যক্ষ) চীনের সমবায় সমিতির কথা বললেন। এদেশের গ্রামীণ সমবায় সমিতিগুলিতে সাড়ে নয় কোটি 'মেম্বর'—এরা গ্রামবাসী। সমিতিগুলির কাজ শহরের জিনিস যা চাষীদের দরকার, শহর থেকে এনে গ্রামে উচিতমূল্যে বেচা, আর গ্রামে উৎপন্ন জিনিস শহরে বেচা বা বেচবার সুবিধা করে দেওয়া।

আমাদের সহযাত্রী 'জার্ণালিস্ট' ডিপি. জেন, চীনের খবরের কাগজ বিষয়ে তাঁর গবেষণার কথা শোনালেন। 'পিপল্‌স্ ডেলি' হল এদেশে প্রধান সংবাদ পত্র, গ্রাহক আট লক্ষ—সম্পাদকীয় সমিতি দুশো সত্তর জনের—দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংবাদ দেশ মধ্যে প্রচার করে। এটি অবশ্য চাইনিজ্ কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ। এতে একটি 'কলম্' থাকে যাতে পার্টির উচ্চপদস্থ মেম্বরদের প্রশংসা বা কঠোর সমালোচনা থাকে। কৃষকদের জন্য এই কাগজ বিশেষ আয়োজন করে। যে কৃষকদের চাষবাসে খুব উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের নামধাম, কার্যপ্রণালী সবিস্তারে দেওয়া হয়।

১৭ই অক্টোবর আমরা সিয়ান্ পৌঁছুলাম। এর পুরাতন নাম হল 'চাঙ্গান'

—বহু শতাব্দী এ নগর চীনের রাজধানী ছিল। শিল্পে, সাহিত্যে, সব বিষয়ে সমৃদ্ধিতে সে যুগে জগতের সভ্যতা ও কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল। আর চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ও বিস্তার এই চাঙ্গান বা সিয়ানেই হয়েছিল।

এই অতি পুরাতন শহরের বাইরে একটি নতুন বড় হোটেলে আমরা উঠলুম। তারপর জলযোগ সেরে এখান থেকে আট-নয় মাইল দূরে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখতে গেলাম। এখানে হাজার বছর আগে চীনের এক সম্রাজ্ঞী স্নান করতে বড় ভালবাসতেন। রাস্তার দু ধারে 'পপ্‌লার' গাছের সারি। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ 'বারামুলা' শ্রীনগরের রাজপথ মনে করিয়ে দেয়। আর ছিল 'পার্সিমন' গাছ ফলে ভরা। পার্সিমন (এ হ'ল এর জাপানী নাম, আর এই নামেই এ ফল এখন সর্বত্র পরিচিত) ঠিক পাকা লাল টোমাটোর মত দেখতে আর খেতে গুড়ের মত মিষ্টি। সিয়ানে থাকতে সাধ মিটিয়ে আমরা পার্সিমন খেয়েছিলাম।

উষ্ণপ্রস্রবণটি চার-পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে কয়েকটি চীনে মাটির টালি বাঁধানো সুন্দর চৌবাচ্চায় পড়ছে। খুব আরামে এখানে নাওয়া গেল, তারপর কাছেই একটু উঁচু জায়গায় উঠে সেইখানে পৌছুলাম যেখানে ১৯৩৬ সালে চিয়াংকাই-শেক্ প্রথমে মাঞ্চুরিয়ায় 'ওয়ারলড' চ্যাং সো-লিনের পুত্রের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তারপর তাঁর বিষম শত্রু 'কমিউনিস্ট'দের কবলে হস্তান্তরিত হয়েছিলেন। সে যাত্রা চো-এন লাই চিয়াংএর প্রাণরক্ষা করেন।

সেদিন সেখানে নতুন চীনের জনসাধারণের মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্প দেখলাম। একটি সৈনিক পুরুষ আমাদের কিছু দূরে এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত স্তূপ দেখালেন। ওটি হল চীনে প্রথম ইতিহাস যুগের সম্রাট চীনবংশীয় শি-হুয়াংটির (যাঁর বংশের নামে দেশটির নাম চীন হয়েছে) সমাধিস্থান। এই স্তূপ ইজিপ্টের পিরামিডের মত বিশালকায়। আজকাল যে ভূখণ্ডটিকে আমরা উত্তর চীন বলে থাকি—হোয়াং হো নদের চারিপাশে ও ইয়াং উ সির উত্তরে ভূভাগ—সবটাই শি-হুয়াংটির সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের চৌ নৃপতি বংশের (১১০০ B C) রাজত্বকালের অনেক নিদর্শন কাছাকাছি মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। হোয়াংহোর বাঁকের এই অঞ্চলটি হল চীনের ইতিহাসের ও সংস্কৃতির উৎপত্তি স্থান।

ভারত ও চীনের সম্পর্কেরও গোড়াপত্তন Changan (Sian) থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে ফাহিয়ান এইখান থেকে তাঁর ভারত-তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। চাঙ্গান নগরেই কুমারজীব খ্রীঃ পঞ্চম

শতাব্দীর গোড়াতেই বৌদ্ধ ধর্মের শতাধিক পুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতবর্ষ থেকে যত পণ্ডিত চীনে গিয়েছিলেন কুমারজীব তাঁদের মধ্যে জ্ঞান ও মনীষায় সর্বশ্রেষ্ঠ। Sianএ তখন এক তাতার নৃপতি রাজত্ব করছিলেন, তিনি কুমারজীবের পাণ্ডিত্যে ও ব্যবহারে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে কুমারজীবকে একটি রাজকন্যার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন। কুমারজীব বৌদ্ধ ভিক্ষু, অনেক আপত্তি করেছিলেন, রাজার কাছে তাঁর আপত্তি টিকলো না। এইজন্য কুমারজীব বড় দুঃখে শিষ্যদের বলেছিলেন যে আমি যা বলি তাই করো, আমি যা করি তা কোরো না।

আর সবার চেয়ে বড় কথা হল চাঙ্গান বা সিয়ান থেকে তীর্থযাত্রী-চূড়ামণি হিউয়েন সাং তাঁর ঐতিহাসিক ভারতযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন (খৃঃ সপ্তম শতাব্দী)। ষোলো বছর (৬৩০-৬৪৫ খৃঃ) ভারতের সর্বত্র ঘুরে হিউয়েন্ সাং সিয়ানে ফিরে এই নগরীতেই আমাদের দেশ থেকে যে অসংখ্য পুঁথি এনেছিলেন, সে সবের অনুবাদ শুরু করেন। Tang সম্রাট এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য তাঁর প্রিয় বন্ধু হিউয়েন সাংকে চাঙ্গানের প্রসিদ্ধ Pagoda Ta yen-ta (করুণার মন্দির) ওঁর বাসের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। এই প্যাগোডার প্রবেশদ্বারে সম্রাট তাই সুংএর আদেশ লিখিত দুটি শিলালিপি রয়েছে। লিপিকার চীনের একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফিস্ট্। প্যাগোডাটি খুব উঁচু আর এর উপর তলা থেকে Wei নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ বড় সুন্দর দেখায়। আমাদের গাইড্ বললেন যে পুরাকালে এই জায়গাটিতে চাঙ্গানের কবিসমাগম হত—কবিরা তাঁদের সুধাপাত্র Weiএর জলে ভাসিয়ে দিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকতেন, যখন ওগুলি বেশ ঠাণ্ডা হ'ত তখন জল থেকে তুলে পান করতেন।

T'ang যুগ চীনের শ্রেষ্ঠ কবিদের (Li-po, Tu-fu. Po-chui প্রভৃতিদের) যুগ। হিউয়েন সাং মারা গেলেন আর তাঁর সমাধি ঐখানেই হবার কথা ছিল। কিন্তু T'ang সম্রাট বললেন যে সকালে উঠেই প্রিয় বন্ধুর সমাধি ঠিক সামনেই দেখতে চান না। তাই ঐ মহাভিক্ষুর চিতাভস্মরাশি রাজভবন থেকে আট-ন মাইল দূরে একটি বাগানের মধ্যে একটি মন্দিরে রাখা হয়েছে। আমরা সেখানেও গিছলাম। সমাধি-মন্দিরের সামনে ফুলবাগানে বেশ ফুল ফুটে আছে, একটি অতি বৃদ্ধ ভিক্ষু সেখানে জপ করছে, আর মন্দিরের ঠিক পিছনে একটি বড় প্রস্তরফলকে খোদিত হিউয়েন স্যাংএর আর তাঁর দুজন

সহযাত্রীর প্রতিকৃতি দেখা গেল, কাঁধে পুঁথির ভার আর পুঁথিগুলি রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য তার ওপর ছাতা পিঠের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। নীচে লেখা ছিল বহু দূরে, মরুভূমি, পাহাড় পর্বত নদনদীর ওপারে, বহু রাজ্যে বহু তীর্থ স্থানে ইনি পর্যটন করেছিলেন। সেদিন হিউয়েন সাংএর কর্মস্থল আর সমাধি দেখে এসে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলাম। তার পরদিন এখানকার পুরাতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়াম দেখলাম, এখানে সেই 'শিলালিপি অরণ্য' রয়েছে যার কথা অনেকের কাছে শুনেছিলাম। বহুকালের অসংখ্য শিলালিপি এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে—তার মধ্যে একটি মনে হ'ল যেন আমাদের দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। আর এইখানেই T'ang যুগের বিখ্যাত মার্বেলের ঘোড়ার ছয়টি প্রতিমূর্তি আছে আর্ট হিসাবে যা শ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনীয়। একটি ঘোড়া নাকি চুরি গেছে আর শোনা যায় সেটি আমেরিকার বোস্টন মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। এই T'ang সম্রাটকে মধ্য-এশিয়ার কোনো করদ রাজ্য এই ঘোড়াগুলি উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট এই ঘোড়াগুলি এত ভাল-বাসতেন যে তিনি এদের শ্বেত-মর্মরের প্রতিমূর্তি গড়ান।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটি আড়াইশো বছরের পুরনো লামা মন্দির দেখতে গেলাম। মঠাধ্যক্ষ তিব্বতী লামা, সবল সুস্থ দেহ, চীন কংগ্রেসের সদস্য। ভারতের লিপিতে লেখা এখানে পুরাতন কাগজপত্র ইনি আমাদের দেখালেন আর কতকগুলি নকল আমাদের দিলেন। মঠের দেওয়ালে সুন্দর লতা উঠেছে, ফুলগুলি মুক্তার মত—এই কি সংস্কৃত কাব্যের অতিখ্যাত মুক্তালতা? মন্দিরটির শান্তিময় পরিস্থিতি বড় ভাল লেগেছিল।

রাত্রে আমাদের হোটেলে চীনের বিখ্যাত লোককথা 'The Monkey'র পুতুল নাচ হ'ল। এই 'Monkey' যে-সে বানর নয়, ইনি হলেন আমাদের রামায়ণের হনুমান, হিউয়েন সাংকে তাঁর তীর্থপর্যটনে সাহায্য করছেন। আর ইনি হলেন বিদ্রোহের প্রতীক, দেবতাদেরও অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। 'The Monkey' মাওসেতুংএর বড় প্রিয় গল্প। সেই সন্ধ্যা বেলাই আমরা সিয়ান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রেলওয়ে স্টেশনে সিয়ান অধিবাসী যাঁরা আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন, আমাকে তাঁদের ধন্যবাদ দিতে বলা হ'ল। আমি বললাম যেখানে কুমারজীব, ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাংএর পদধূলি পড়েছে, সেখানকার প্রত্যেক ধূলিকণা আমাদের ভারতবাসীদের কাছে পবিত্র, মোটেই তুচ্ছ করবার জিনিস নয়। এ কথাটা সবায়ের ভাল লেগেছিল।

তার পরদিন ভোরে গাড়ি লোয়াং স্টেশনে থামলো। গাড়ির জানলা থেকে একটি সাদা রঙের বাড়ি দেখা গেল, আমাদের গাইড বললেন এটিই হ'ল শ্বেত অশ্বমঠ যেখানে সম্রাট মিংটি কাশ্যপ মাতঙ্গ ও তাঁর সঙ্গীকে তাঁর নিজ সাম্রাজ্যে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তিনি তার কয়েক মাস আগে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে সোনার রঙের একটি দেবমূর্তি পশ্চিম দিক থেকে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করছেন। পরদিন সভাপণ্ডিতেরা এই স্বপ্নের মানে বুঝিয়ে দিলেন যে ভারত-ভূমি থেকে বৌদ্ধ ধর্ম তাঁর সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি তখন সুদূর পশ্চিমে লোকলস্কর পাঠালেন যে যাঁরা এই মহাব্রতে ব্রতী হয়ে পাহাড় পর্বত মরুভূমি পার হয়ে আসছেন, তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে। এই সৈন্যদল পশ্চিম দিকে অনেকটা এগিয়ে দেখতে পেলো যে গোবি মহামরুর মধ্যে দুটি বৌদ্ধ ভিক্ষু, একটি সাদা ঘোড়ার ওপর ধর্মপুস্তক চাপিয়ে পুব দিকে চলেছেন। চীনা সৈন্য তখন তাঁদের দুজনকে নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা হল। সম্রাটের কাছে খবর গেল। তিনি লোয়াংএ (কিছুদিনের জন্য তখন এ নগরই দেশের রাজধানী ছিল) এঁদের জন্য অপেক্ষা করলেন ও এঁরা এসে পৌঁছুলে এঁদের সাদা ঘোড়ার স্মৃতিরক্ষার জন্যে "হোয়াইট হর্স মোনাস্টারি" সুন্দর বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করলেন (একষট্টি খৃষ্টাব্দে)। আমাদের গাড়ি এখানে বেশীক্ষণ থামলো না। আমাদের নেমে গিয়ে মঠ দেখা হল না।

তার পরদিন সকালে (২১শে অক্টোবর) আমরা ইয়াং সিকিয়াং পার হলাম। আমাদের রেলগাড়িটি মধ্যিখান থেকে খুলে দু-ভাগ করা হল। তারপর দুটি বড় 'টাগে' এ দুটি ভাগ চড়িয়ে আমাদের নদী পার করা হল। আমরা গাড়ির জানলা দিয়ে এ দৃশ্যটি বেশ উপভোগ করলাম।

এবার আমরা ন্যান্কিং (দক্ষিণ রাজধানী) পৌঁছলাম। এখানে একটি সুন্দর হোটেলে ওঠা গেল। (এখানকার বিছানাও 'আর্টিস্টিক'—এমন সুন্দর কারুকার্যের নমুনা যে না ঘুমিয়ে দেখবার মতন।) তারপর পারপল্ হিলে সান্-ইয়াট্ সেন মেমরিয়াল আমাদের দেখাতে নিয়ে গেল। উমাজী এখানে সান্ইয়াট্ সেনের সমাধির উপর পুষ্পমাল্য দিলেন। এখানকার দুধারের গাছগুলি—সাইপ্রেস্ 'উইপিং উইলোর' মতন ডাল ঝোলা আর চেনারের সারিবন্দি লাইন (প্রত্যেক গাছে ঠিক পাঁচটি করে ডাল) বাস্তবিকই নতুন রকমের। এইখানে তখন একটি ক্রিসান্থিমাম্ শো হচ্ছিল। লতানে ক্রিসান্-থিমাম্ এখানে প্রথম দেখলাম। চীনাদের মতে এই ফুল তারাই শত শত বৎসর

যত্ন করে এর যত উন্নতি করেছে, জাপানীরা চীনের কাছ থেকে নিয়ে এর জন্য জগতে নাম কিনেছে।

এখানে এই পার্‌পল্‌ হিলেরই আর একদিকে চীনের শেষ খাঁটি চীনা রাজ-বংশের মিং সম্রাটদের সমাধি আছে। পাহাড়ের গা দিয়ে আমাদের গাড়ি চললো অনেকগুলি পুরাতন ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে। এক জায়গায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন একটি বিদুষী চীনা মহিলা। তিনি আমাদের একটি স্মারকস্তম্ভ দেখালেন। তাতে খোদাই আছে—'সম্রাট কাংশি মিং সম্রাটদের গৌরবময় যুগের প্রশংসা করছেন।' মহিলাটি বললেন যে লিপিটি ইতিহাসে একটি প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। সম্রাট কাংসি (১৬৬২-১৭২৩) হলেন মাঞ্চু বংশের মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। এঁর সময় তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া জয় করে মাঞ্চু-বংশ চীন সাম্রাজ্যকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে পরাক্রান্ত দেশ করে তুলেছিলেন। আর মিং বংশ ধ্বংস করে মাঞ্চুরা চীন হস্তগত করেন। তাই মাঞ্চু সম্রাট যে এরকম করে মিং বংশের গুণকীর্তন করছেন সত্যিই এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। এই অতি পুরাতন রাস্তায় অতি পুরাতন বিশালকায় উট, ঘোড়া প্রভৃতির মূর্তি আছে। সান্-ইয়াট সেন্ মাঞ্চু সাম্রাজ্য পতনের পর এই সব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে চীন আজ বিদেশী মাঞ্চুদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করেছে।

তার পরদিন সকালবেলা, আমরা রেনিং ফ্লাওয়ার হিলে (পুষ্পবৃষ্টি পাহাড়ে) চড়লাম। এখানে বহুশতাব্দী পূর্বে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকের উপর স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল, তারপর চিয়াং কাইশেকের সময় এইখানে হাজার হাজার কমিউনিস্টদের বধ করা হয়। এখানে নানা রঙের ছোট ছোট পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়। আমরাও এক এক বাক্স নুড়ি এখান থেকে এনেছিলাম। ঐ পাহাড়টির এখন শহীদ পাহাড় নতুন নাম হয়েছে।

ঐ বিদুষী মহিলার কাছেই শুনলাম যে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের সময় থেকেই চীনা ভাষার মাধ্যমেই আন্তর্জাতীয় সব কাজ চলতো। তাই এখন বেশী কিছু ভাষা-সমস্যা নেই—তবে কয়েক বছর হয়তো দুটি ভাষার (একটি দেশের আর একটি বিদেশীয়) ব্যবহার করতে হবে। (আগে ইংরাজির চলন ছিল, দিন কতক উনিশ'শ উনপঞ্চাশের পর রুশ ভাষা ইংরাজির জায়গা প্রায় নিয়েছিল।) হ্যান্‌কিংএ আমাদের একটি ভোজ দেওয়া হয়। এই ব্যাঙ্কোয়েটে দু-তিনটি প্রফেসরের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা ভাল ইংরাজি জানেন। তাঁরা আমাদের টাইপিং বিক্ষোভের

কথা বললেন। সে এক ভীষণ কাণ্ড হয়েছিল, এক কোটি লোকের প্রাণনাশ হয়েছিল। বিখ্যাত চীনেমাটির 'প্যাগোডা' (জগতে অতুলনীয়) এই সময়েই ধ্বংস হয়ে যায়। এই টাইপিং বিক্ষোভের সঙ্গে একশ বছর পরের মাও-এর কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান অনেক বিষয়ের সাদৃশ্য রাখে। এই সময়েই ভারতে সিপাহী স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। চীনা প্রফেসররা আমাদের বলেন যে এই সিপাহী যুদ্ধ চীনকে 'আফিং সমরে' কিছুদিন ইয়োরোপীয় মহাশক্তিদের (বৃটেন, ফ্রান্স) হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বৃটিশ সৈন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে কোথাও যেতে পারেনি। বছর কয়েক আগে (১৯৬৮ সালে) শুনেছিলাম যে মাও ভারতে পিকিং দূতাবাসে সিপাহী সংগ্রামের শেষ দিকটার heroine ঝাঁসীর রাণীর সিনেমা দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত দূতাবাসে ছিলেন ঐ ছবি দেখবার জন্য।

২৩শে অক্টোবর আমাদের রেলগাড়ি শাংঘাই স্টেশনে পৌছল। সেখান থেকে বাসে ও মোটার কারে আমরা একটি চোদ্দতলা স্কাইস্ক্রেপার কিংকং হোটেলে গিয়ে উঠলাম। শাংঘাই চীনের সবচেয়ে বড় শহর, বাষট্টি লক্ষ লোকের বাস, তার মধ্যে আট লক্ষ শুনলাম ছাত্রছাত্রী। মাঞ্চু শাসন কালের শেষ দিকে শাংঘাই চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের কুক্ষি-গত হয়ে পড়ে। এখানে একদিকে যেমন চরম বিলাসিতা দেখা যেত অন্যদিকে তেমনি ভীষণ দারিদ্র্যও তারই সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ছিল। এখানকার bar নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও জমকালো ছিল ও এই শহরেই শীতকালে শতাধিক ভিখারীর মৃতদেহ রোজ সকালে ফুটপাতে দেখা যেত। শাংঘাইয়ের গুণ্ডা তো গুণ্ডা-জগতে অদ্বিতীয় ছিল—আর শাংঘাইয়ের অভ্রভেদী অট্টালিকাও এশিয়ার প্রথম Skyscraper। ১৯৪৯এ ইয়োরোপীয় ধনকুবেররা যখন এখান থেকে চলে গেলেন, আর বিলাসসামগ্রীর চাহিদা যখন আর রইল না, তখন বহির্জগৎ ভেবেছিল যে শাংঘাইয়েরও পতন অনিবার্য। কিন্তু তা হয়নি —শাংঘাই এখন বিলাসপণ্যের জায়গায় চীনের কোটি কোটি গ্রামবাসীর উপযোগী দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস তৈরী করে আগেকার সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সত্যিই এ এক আশ্চর্য পরিবর্তন। ভিখারী ও বেশ্যা—দুই-ই এখানে কয়েক লক্ষ ছিল—এখন আর এ শহরে দেখা যায় না।

এই শাংঘাইয়ে ১৯২৫ সালে সেই ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়েছিল যা হ'ল চীনে সাম্যবাদের (Communism) প্রথম আবির্ভাব। এই শহরেই

১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেক্ রক্তগঙ্গা বইয়ে এই কমিউনিজম তথনকার মত গুঁড়িয়ে দেন। চো এন্-লাই কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে শাংঘাই থেকে পালান। তারপর জাপানীদের হাতে পড়ে ইয়োরোপীয় ও চীনেদের সমান দুর্দশা হয়েছিল—ও বিষয়ে জাপানীরা 'সাম্যবাদ' ঠিক বজায় রেখেছিল।

আমরা সেদিন মাদাম সান্ইয়েৎ সেনের নামে স্থাপিত বাচ্চাদের নার্সারি স্কুল দেখলাম। বেশ ছোট থেকে সাত-আট বছরের বালক-বালিকারা খুব খেলাধূলা, নাচগান করলো। বাচ্চাদের স্বাস্থ্য দেখবার মত। তারপর আমরা Doctor Sun yat Senএর (নিজের) বাড়ি দেখতে চললাম। বাড়িটি শহরের গোলমাল থেকে দূরে—সত্যিই যেন একটি শান্তিনিকেতন। এর একটি ঘরে মাদাম সান্ ইয়েৎ সেনের একটি বিয়ের সময়ের ছবি আছে। ছবিটি বড়ই সুন্দর, উপকথার রাজকন্যার মত।

এরপর শাংঘাইয়ের জগৎবিখ্যাত 'বাঁধ' দেখলাম। একদিকে স্কাইস্ক্রেপার (ব্যাঙ্ক, ব্যবসার কেন্দ্রের অভ্রভেদী অট্টালিকা) আর একদিকে জাহাজ, junk (জঙ্ক্—চীনা বড় নৌকা) ছোট নৌকা ভরা Whampoa নদী। আগেকার মত ব্যস্তসমস্ত ভাব হয়ত আর নেই, তবুও 'Bund' আমাদের খুব ভাল লাগলো। এই Whampoa নদীরই তীরে আর এক জায়গায় সেই ঐতিহাসিক Military Academy ছিল যেখানে Chiang Kai-shek, Borodin, Chou En-lai আর Ho Chi Minh দিন কতক একসঙ্গে কাজ করেছিলেন।

'বাঁধ' থেকে গেলাম 'যুব ভবনে'। মার্বেলের মেঝেওয়ালা এই বিরাট ভবনটি ছিল একটি বৃটিশ ধনকুবেরের। এখন এটি হয়েছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বড় একটি 'ক্লাব', নানা রকমের খেলার (ঘরের ও বাইরের) এখানে বন্দোবস্ত আছে। সুন্দর পড়বার ঘর আর লাইব্রেরী দেখলাম। অনেক ছেলেমেয়েরা চীনা বই, খবরের কাগজ, পত্রিকা প্রভৃতি পড়ছে। একটি বড় Galleryতে অনেক যন্ত্রপাতির ছোট ছোট নমুনা সাজানো আছে। আর প্রকাণ্ড 'হল'টিতে জোরে বাজনা বাজছে ও নাচ হচ্ছে। আমাদের দলের কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশ নাচলেন আর তার পুরস্কার হিসাবে তাঁদের Young Pioneersএর Badge ও tie দেওয়া হল। আমাদের সত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার মসূরীর লোক, উনি বললেন যে মসূরীতে অনেক বড় বড় 'বাঙ্গলো' এখন খালি পড়ে থাকে—ওদের দু একটিকে এরকম 'যুবভবন' করে দেওয়া উচিত।

শাংঘায়ের ভারতীয় Consul General শ্রীমুরগেশ ও তাঁর সহধর্মিণী আমাদের সে সন্ধ্যায় ধোসা, ইডলি দিয়ে জলযোগ করালেন, বড় ভাল লাগলো। ওঁদের ছোট মেয়েটি ভরতনাট্যম নাচ নাচলে—চীনে ও নাচ দেখবো ভাবিনি।

২৫শে অক্টোবর—শাংঘায়ের কাস্টমস্ হাউসের অধ্যক্ষ আমাদের কিংকং হোটেলে শাংঘায়ের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা শোনালেন। আগে এ মহানগর বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করতো। ইয়োরোপের বিলাসপণ্য আসতো চীনে ইয়োরোপীয়ান প্রবাসীদের ও কিছু অল্পসংখ্যক ধনী ও শৌখীন চীনা পরিবারের জন্য, আর চীন থেকে রপ্তানি হ'ত কাঁচা মাল, বিদেশীরা বেশ সস্তা দামে (ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশী সস্তা দামে) কিনতে পারতো। এখন এই বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে এখন বড় বড় কলকব্জা তৈরী হচ্ছে—সমস্ত দেশটার জন্য, আর এই কাজের জন্য কাঁচা মাল সমস্ত দেশটা থেকে আসছে। শতকরা আশি ভাগ পাইকারী ব্যবসা সরকারের হাতে, খুচরা ব্যবসা অর্ধেক সরকারী অর্ধেক বেসরকারী। চাল, কাপড়, রাঁধবার তেল এসব একসঙ্গে ration করা।

সে সন্ধ্যায় ছিল দেওয়ালী, আমরা ভারতীয় Consulate Staffএর শ্রীরায়চৌধুরীর বাড়ি দেওয়ালীর ভোজ খেলাম। চৌধুরী-গৃহিণী বললেন যে দুধ, কফি, মাখন বড় দামী, চাকরের মাহিনা মাসিক ষাট টাকা (খাবার খরচ তার নিজের), মাছের দর কলকাতারই মত, ভেড়ার মাংস ছাগ-মাংসের চেয়ে সস্তা।

সে সন্ধ্যায় আমাদের হোটেলে শাংঘাই Fuh-tan University-র ইতিহাসের অধ্যাপক Shang Sze Tsai চীনের আধুনিক ইতিহাসের অনেক কথা আমাকে বললেন। হোটেলের Loungeএ ভিড় ছিল বলে আমার ঘরেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল। বিষয়টি ছিল ডাঃ সান্ ইয়েৎ সেন ও চীনের মুক্তিসংগ্রাম। ওঁর মতে সান্ ইয়েৎ সেন বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি reformer ছিলেন, সংশোধন চেয়েছিলেন, আমূল পরিবর্তন চান নি। অনেকদিন তিনি আমেরিকার কাছে অনেক আশা করেছিলেন। পরে বাধ্য হয়ে রাশিয়ার দিকে ঝোঁকেন। তাঁর ঐতিহাসিক Three peoples principles San Min Chu-i (of the people, by the people, for the people) হ'ল জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও বোধ হয় সমাজবাদ (Socialism)। এই Socialism আস্তে আস্তে সাম্যবাদের (Communism) দিকে এগুচ্ছিল। তবে তিনি

Classwar (সমাজের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম—মধ্যবিত্তদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবীদের সংঘর্ষ) মানতে চান নি। তিনি বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করতেন—মাওসে-তুংএর ভরসা ছিল কৃষকদের উপর। তাঁর মিং সম্রাট বংশের উপর খুব ভক্তি ছিল, পুরাতনকে বাদ দিতে তিনি চাইতেন না। সত্যকথা বলতে সান্ ইয়েৎ সেন ভাবুক, গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন—কর্মী ছিলেন না। সান্এর গণতন্ত্রের আদর্শ ছিল আমেরিকার পৃথক পৃথক ক্ষমতাকেন্দ্র—শাসন বিভাগ, ব্যবস্থাপক বিভাগ ও বিচার বিভাগ। মাওএর নিউ ডেমক্রেসিতে এ পৃথক ব্যবস্থা মোটেই নেই। মাওএর হ'ল 'সেন্ট্রালাইজড ডেমক্রেসি'—কেন্দ্রীভূত গণতন্ত্র। যদি সান্ আরও কিছুদিন বাঁচতেন হয়তো কমিউনিজমের দিকে আরও খানিকটা এগুতেন।

লালচীন ভিতর বাহির সব বদলাচ্ছে—কি করে এত খরচ করতে পারে এর সেই জবাব পেলাম যা পিকিংএ শুনেছিলাম—সব কলকারখানার কাজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া এই হল এই সমস্যার সমাধান আর সেই সঙ্গে দেশের লোকের 'ডিটারমিনড্' উইল—একতা আর উন্নতির আন্তরিক সংকল্প।

২৭শে অক্টোবর আমরা শুনলাম নেহরুজী আজ শাংঘাইয়ে আসছেন। টাইওয়ান্ (ফর্মোসা) কিছুদিন থেকে খুব ঘন ঘন প্লেন চীনের ওপর চালাচ্ছিল—সেই জন্যে তাঁর চীনে ভ্রমণ সম্বন্ধে খবরের কাগজে কিছু থাকতো না। আমরা শাংঘাই বিমানবন্দরে গেলাম। সেখানে ছাত্র ও শ্রমজীবীদের বেশ ভিড় জমেছিল। নেহরুজী প্লেন থেকে নেমে ঘুরে ঘুরে ছাত্রমণ্ডলী ও শ্রমিকদলগুলির সঙ্গে দেখা করলেন। শাংঘাইবাসী-ভারতীয়েরা (বেশীর ভাগ শিখ) তাঁর অভ্যর্থনা করলেন। সেই সন্ধ্যায় আমাদের কিংকং হোটেলের ঠিক সামনে একটি বড় প্যাভেলিয়নে নেহরুজীকে শাংঘাইবাসীরা খুব ধুমধামে সংবর্ধনা দিলেন। সেইদিনই সকালবেলা প্যাভেলিয়নটির সামনে বড় বড় পপ্লার গাছ মাটি খুঁড়ে লাগানো হয়েছিল—ওরকম বড় গাছ যে ওরকম করে যেখানে ইচ্ছা লাগানো যেতে পারে জানতাম না। নেহরুজী বক্তৃতা দিলেন ও আমাদের পূর্বপরিচিত পরন্তপে সঙ্গে সঙ্গে চীনে ভাষায় তার অনুবাদ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনালেন। শাংঘাইয়ের গণ্যমান্য কয়েকজন নাগরিক নেহরুজীর ভাষণের উত্তর দিলেন। টাইওয়ানের (ফর্মোসার) প্লেন কাছে কাছেই উড়ছিল—তাই বেশী কিছু করা হয়নি। মাঝরাত্রে আমরা শাংঘাই ছাড়লাম। চীনের সবচেয়ে বড় শহর ছেড়ে এবার আমরা চীনের একটি সবচেয়ে সুন্দর শহর হ্যাঙ্কো-এ তার পরদিন সকালে

পৌঁছলাম। "ওপরে স্বর্গ নীচে হ্যাঙ্কো আর স্থচো"—একটি পুরানো চীনা প্রবাদ। সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে শুনলাম যে ব্রেকফাস্টের জন্য দু ফার্লং দূরে রান্নাবাড়ি ও খাবার ঘরে যেতে হবে। খাবার ঘরের সামনে সবিস্ময়ে দেখলাম যে সামনে রয়েছে একটি সুন্দর খুব বড় হ্রদ, তার চারিদিকে যতদূর দেখা যায় 'পার্কে'র মত মাঠ, গাছপালা আর হ্রদের ওদিকটায় পাহাড়—মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে উঁচু বৌদ্ধ 'প্যাগোডা'। কাশ্মীরের শিকারার মত ছোট ছোট বোটে আমরা হ্রদে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। নৌকাতেই হ্যাঙ্কোর প্রসিদ্ধ সবুজ চা খাওয়া হল। হ্রদটির ঠিক মাঝখানে উঁচু বাঁধ দেওয়া আছে—তার ওপর দিয়ে মোটর ইত্যাদি বেশ যাতায়াত করে। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি পো চুইএর নামে এই বাঁধের নামকরণ হয়েছে। আমরা ঐ পো চুই রোড দিয়ে হ্রদের অপরপাশে পৌঁছুলাম। ওখানকার পাহাড়গুলি সবুজ গাছে ঢাকা, মধ্যে মধ্যে ছোট জল-প্রপাত ঝক্‌মক্ করছে আর অনেক গুহা রয়েছে পাহাড়ের গায়ে, তার মধ্যের বৌদ্ধ মূর্তিগুলি নীচে থেকেও কিছু কিছু দেখা যায়। প্রবাদ এই সমস্ত পাহাড়টি উড়তে উড়তে ভারত থেকে এখানে এসেছিল।

এই বিশালকায় পাহাড়ের তীরে একটি খুব পুরানো, বড় বৌদ্ধমন্দির দেখা গেল; এখন ওটি ভাল করে মেরামত করা হচ্ছে। এইখানে সেবারকার চীন যাত্রায় নেহরুজী একদিন ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা আমরা এখানকার আর একটি পুরানো বৌদ্ধ মন্দিরে ঢুকলাম। প্রবাদ এখানে একটি ভিক্ষু এসেছিলেন, তাঁর ব্যবহার ছিল অদ্ভুত, যদিও তিনি পাগল নন। একদিন তিনি খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন এই মন্দিরের উঠানে, সেই রাত্রে আগুন লেগে মন্দিরটি পুড়ে গেল। মন্দিরের লোকজনের সন্দেহ হয় যে এই ভিক্ষুরই অসাবধানতায় আগুন লাগে। ভিক্ষুকে বলা হয় যে মন্দিরের পুনর্নির্মাণ কাজে সাহায্য কর, নয়তো এদেশ থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই হুকুম শুনে ভিক্ষুটি আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন আর মন্দিরের উঠানের কুয়ো থেকে ইট কাঠ হুড়হুড় করে বেরুতে লাগলো। ভোর হবার আগেই দেখা গেল যে মন্দিরটি আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। সূর্য উঠলে ভিক্ষুও উঠলেন আর বললেন যে কে বললে মন্দির পুড়ে গেছে। আমরা এই কুয়ো দেখেছি—এর ভেতরে জলেতে যেন একটা আলো ঘুরছে। এই ভিক্ষুটির (যিনি পাগল নন কিন্তু যাঁর ব্যবহার ছিল অদ্ভুত) অনেক গল্প হ্যাঙ্কো-এ আজও শোনা যায়।

এই হ্রদের আর একদিকে আমরা 'একেবারে একাকী' পাহাড়ে তার পরদিন

গেলাম। এখানে কবি Lung-fa আলুচারফুল ও সারসদের বিষয় সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। সারসরা কবির খুব সেবা করতো, আলুচারফুল ছিল কবিপত্নী। স্থঙ বংশের এক সম্রাটও এই 'একেবারে একাকী' পাহাড়ে এসে রাজকার্য থেকে বিশ্রাম করতেন। পাহাড়ের গায় ধাপে ধাপে ফুলবাগান নেমে গেছে। এখানে paeony ফুলের চারা দেখলাম, তখন ফুলের সময় নয়। এই paeony হ'ল চীনের 'জাতীয় ফুল'—খুব বড় স্থলপদ্মের মত। পাহাড় থেকে নেমে একটি লতাপাতা ঢাকা ছোট মন্দিরের উঠানে একটি বেদীর ওপর Han যুগের (১৭০০ বছর আগের) একটি লোহার জলভরা গামলা রয়েছে। গামলার দুটি handle ঘষলে ঐ গামলার জলে যেন ঘূর্ণি ওঠে, ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় ফেনা দেখা যায়। আমরা handle ঘষলে কিছুই হ'ল না। আমাদের গাইড হাত দিলেই জলে ঢেউ ফেনা ঠিক ঠিক হ'ল।

কাছেই একটি Chrysanthemum ফুল ভরা বাগানে স্থঙ সাম্রাজ্যের একজন বিখ্যাত সেনাপতির মূর্তি আছে। বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন সভাসদ এঁকে হত্যা করেছিল। এই বিশ্বাসঘাতকদের মূর্তি এখানে আছে। সেইসব মূর্তির ওপর থুথু ফেলতে হয়। এখানে একটি Chrysanthemum ফুলগাছে দুশোর বেশী কুঁড়ি দেখলাম। তবে ফ্রেমের উপর স্তরে স্তরে কুঁড়িগুলি সাজানো রয়েছে। এসব বাগানের মধ্যে জল যাচ্ছে বেশ খরস্রোতে, আর সেই স্রোতে অসংখ্য লাল মাছ দেখা গেল। স্রোতের জলে ওরকম মাছ আর কোথাও দেখিনি।

Hanchow পুতুল (নরম রঙ্গীন পাথরের), জালের ঢাকনা দেওয়া বেতের ঝুড়ি (অনেক জিনিস নেওয়া যায়), রেশমের বোনা ছবি, আরও অনেক কারু-কার্যের জন্যে আর তার হ্রদ ও বাগানের জন্যে চীনের কাশ্মীর নাম অর্জন করেছে।

তিরিশে ও একত্রিশে অক্টোবর—আমরা গাড়িতেই কাটালাম। এখন ফেরবার পালা। দক্ষিণের Cantonএ যাচ্ছি। গাড়ির জানলা দিয়ে দেখা গেল উঁচু পাহাড়ের নীচে দিয়ে সুন্দর একটি নদী যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এইটিই হ'ল Pearl নদী—নীচে গিয়ে Cantonএর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের দিকে এগুবে। গাড়ির বসবার ঘরে চীনে যা যা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেই সেই বিষয়ে আলোচনা করা গেল।

৩১শে সন্ধ্যায় Cantonএ পৌঁছলাম। আমাদের বাসস্থান ছিল Victory হোটেল, Pearl নদীর একটি খালের উপর। হোটেলের হলে একটি দু-তিন

ফুটের বামন গাছ ছিল অনেকটা আমাদের বাঙ্গলা 'ঞ'র আকারের। চীনের ঐ অক্ষরটি হ'ল—কেবল অক্ষর নয় পুরো একটি কথা, আর সেই কথার মানে হল শান্তি।

১লা নভেম্বরে আমরা সব আগে গেলাম Yellow Flower Hill Memorialএ। এইখানে ১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের প্রথম দিকে বাহাত্তরজন শহীদ প্রাণ দিয়েছিল। আমেরিকাবাসী চীনেদের অর্থসাহায্যে এই স্মারক ভবনটি তৈরী হয়। এখানে একটি আমেরিকান স্টাইলে স্বাধীনতার স্ট্যাচু আছে।

তারপর আমরা গেলাম Mao Tse Tung's Peasant Training Centre-এ। এখানে মাও কৃষকদের শিক্ষা দিতেন—লেখাপড়া, সাম্যবাদ ও গেরিলা যুদ্ধ কৌশল। মাওয়ের ক্লাসরুম আমাদের দেখানো হ'ল। তাঁর চেয়ার টেবিল এখনও সযত্নে রাখা আছে।

বাসে চড়ে পাহাড়ের উপর Sun Yat-sen Memorial Tower দেখতে গেলাম। নীচেই বৃহৎ স্টেডিয়াম, পঞ্চাশ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারে। পাশেই মিং যুগের পাঁচতলা একটি অট্টালিকা—সে পুরানো যুগের পাঁচতলা এ রকম বাড়ি খুব কমই দেখা যায়। ফেরবার সময় দেখলাম সান্ ইয়েৎ-সেন হল, পুরাতন ও নূতন স্টাইলের সংযোগে নির্মিত। এখন থিয়েটার হয়েছে। চারিদিকে কাঞ্চন ফুলের (কচ্‌নারের) গাছ ফুলে ভরে ছিল—হেমন্ত কালে এই কচ্‌নার ফুলের খুব সুগন্ধ।

Canton হ'ল জগতের সর্বোৎকৃষ্ট লিচুর জায়গা। এইখান থেকেই লিচু আমাদের দেশে গিছল। এখানের একটি জলাশয়ের নাম Lichee Bay। এরই চারিধারে এখানকার জগৎজোড়া নামের লিচু। আমরা তো লিচুর সময়ে যাইনি—আমরা Cantonএ লিচুর মোরব্বা (চিনিতে পাক করা লিচু) খেয়েছি।

সান্ ইয়েৎ-সেন্ ইউনিভারসিটিতেও আমাদের গাইডরা আমাদের নিয়ে গিছলেন। এখানে লাইব্রেরিতে অনেক ইংরেজি বই (চীনে এই প্রথমবার) দেখলাম। একটি বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলা এই ইউনিভার্সিটির Staff-এ ছিলেন।

এই Canton ভারত-চীনের আর একটি সংযোগ স্থল। যারা সমুদ্র পথে ভারত চীনের মধ্যে যাতায়াত করতেন—তাঁরা Cantonএ আসতেন বা এখান থেকে যেতেন (Gunavarman, I-tsing প্রভৃতি)। স্থলপথের যাতায়াতের রাস্তা ছিল—চাঙ্গান (সিয়ান)।

২রা নভেম্বর (১৯৫৪) আমরা হংকংএ ফিরে এলাম—এবার Shamrock হোটেলে। ভিখারী, পকেটমার, রাত্রে চোরের ভয়, দোকানে দরদস্তুরের ধস্তাধস্তি আবার এ সব ভুগতে হ'ল। পঁয়তাল্লিশ দিন চীনে এ সব থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছিলাম। টাইফুনের ভয়ে দু-তিন দিন আরও হংকংএ থেকে যেতে হ'ল। মাঝরাতে (যত দূর মনে পড়ে) নভেম্বরের ছ তারিখে কলকাতায় ফিরে এলাম। চীনযাত্রীর ডায়েরি এবার শেষ হ'ল।

প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় বিদেশ যাত্রা

দেশে ফিরে আসতে না আসতে আমার মেজ ছেলে রাজের (ক্যাপ্টেন—রাজরাজ চ্যাটার্জী—সিগ্‌নালস্) বিয়ের আয়োজনে সপরিবারে লেগে গেলাম। আমার ছেলের ইচ্ছে ছিল যে পরিবারে দু-একজন সমর বিভাগে নিযুক্ত আছেন সেই রকম জায়গায় ওর বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়। বাঙ্গালীর ঘরে ওরকমটি পাওয়া মুস্কিল মনে হয়েছিল, কিন্তু অনেকদিন আগের পরিচিত (কিন্তু মধ্যে অনেকদিন যাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি) শৈলেশ রায় মহাশয় আমাকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করেন। ওঁর কয়েকটি ভাই আর্মিতে উচ্চপদস্থ অফিসার, ভগ্নীপতিও মিলিটারিতে। রায় মহাশয়ের বড় মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে রাজরাজের বিয়ের যখন কথা উঠলো, তখন আর দেরী করা হ'ল না। আমি চীন থেকে ফিরলাম আর শৈলেশবাবু জাপান থেকে ফিরলেন নভেম্বর মাসে। ১৯৫৫র জানুয়ারিতে রাজুর বিয়ে হয়ে গেল।

এর দিন কতক পরে কলকাতা গেলাম। বাবা ও সুজনের মারা যাবার পরে কলকাতায় উড্‌ স্ট্রীটের বাড়ি আমার ভাল লাগতো না। এবার আমাদের ঐ বাড়ির অংশ সুজনের স্ত্রী ও ছেলেকে বেচে দিলাম। কয়েক মাসের মধ্যেই ঐ টাকার কিছুটা খরচ করে মীরট ছাউনির ৯১ B. C. Linesএ পুরনো একটি বাংলো কিনে সেটিকে ভাল করে মেরামত করে নেওয়া হ'ল। প্রায় এক একর জমির মধ্যে মাঝারি রকমের বাড়ি, চারিদিকে বাগান করবার জায়গা আছে (অবশ্য জমিটা leaseএ, পুরো মালিকানা স্বত্ব নেই)। ব্যবস্থা ভালই হ'ল। আমরা কুড়ি বছর এইখানেই আছি। ইউক্যালিপটাস, গোল্ডমোহর প্রভৃতি গাছ আমরা যা লাগিয়েছিলাম এখন তেতলার সমান উঁচু হয়েছে। ভাল গোলাপও লাগানো হয়েছিল, জলের অভাবে অনেকগুলি মরে গেছে। তবে গোলনচাঁপা, ডবল জবা, শিউলি ইত্যাদি ভালই হয়েছে। এত রকমের গোলনচাঁপা এখানে আর কারো বাগানে নেই। আমাদের ফুলের ওপরই ঝোঁক ছিল, সব্‌জি আর ফলের তত শখ ছিল না। তাই সব্‌জি ও ফল হয়ও নি।

১৯৫৫ সালেই শেষের দিকে আমার দিল্লীর Indian School of Inter-

national Studiesএ কাজ হ'ল South East Asiaর ওপর কয়েকটি ছাত্র নিয়ে ও সব দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর রিসার্চ করা। দেশ তো অনেকগুলি দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার—আমি তার মধ্যে Indochina ও Indonesia নিয়ে কাজ আরম্ভ করলাম। ক্যাম্বোডিয়া (কম্বুজ), জাভা, সুমাত্রা নিয়ে তিরিশ বছর আগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আমার 'থিসিস' লিখেছি—এ সব জায়গার আধুনিক অবস্থার বিষয় আমার খুবই ভাল লাগবার কথা—আমিও খুব আগ্রহে এ সব কাজ শুরু করলুম। আমার ছাত্ররাও সৌভাগ্যবশতঃ পরিশ্রমী ও উৎসাহী বেরুলো। তার মধ্যে ডাঃ বিশাল সিং আমার ইণ্টারন্যাশনাল স্টাডিজ থেকে অবসর নেওয়ার পর আমারই পদে নিযুক্ত হয়েছে। দুঃখের বিষয় শ্রী বমব্ওয়াল, যাকে ভিয়েট্নামের বিষয় গবেষণা করতে পাঠানো হয়েছিল, সে সেখানে গিয়ে ইণ্টারন্যাশনাল কমিশনে (যার অধ্যক্ষ ভারতেরই এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন) এত গুরুত্বপূর্ণ কর্মে ব্যস্ত হ'ল যে থিসিসের কিছুই করে উঠতে পারল না। Bombwalএর যেমন ইংরাজি লেখা ভাল ছিল তেমনি ছিল তার 'ফ্রেঞ্চ' ভাষার উপর দখল। আমি বড়ই আশা করেছিলাম যে ওর ভিয়েৎনামের থিসিস্ গবেষণা কাজের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হবে। Dr. Bombwal এখন হরিয়ানার একটি গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ক্যাম্বোডিয়ায় আধুনিক ইতিহাসের থিসিস্ লিখে ভি. এম. রেড্ডি বেশ নাম করেছে। কয়েকমাস হ'ল ক্যাম্বোডিয়া ও প্রিন্স সিহানুক শীর্ষক যে বই লিখেছে সেটি আমাকে উৎসর্গ করেছে। ইণ্টারন্যাশনাল স্টাডিজের স্মৃতি আজ দশ বছর পরেও আমার মনে খুব উজ্জ্বল রয়েছে। আমার সহকর্মী অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন তো বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন—যেমন সর্দার পাণিকার (কে এম পাণিকার)। তিনি ফ্রান্সে ভারতের দূত হয়ে যাবার পর তাঁর জায়গায় এলেন ডাঃ তারাচন্দ। জাপানী প্রফেসার ইনোকি, ডাঃ আলীম (এখন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর), প্রঃ সুবিমল মুখার্জি (এখন ইণ্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ডে ইনি আছেন), প্রঃ রামাণি (এখন স্কুল অফ্ ইণ্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ডীন্) প্রভৃতি। প্রঃ পপ্পাই (সেক্রেটারি জেনারেল আই. বি. ডব্লিউ. এ.), ডাঃ আপ্পা ডোরাই (ডিরেক্টর আই. এম. আই. এস্.) এঁরা স্কুল কর্তৃপক্ষের লোক হলেন। তবে এঁদের সঙ্গেও আমার সৌহার্দ্যের সম্বন্ধই ছিল। ১৯৫৫-১৯৬১—এই ছয় বছর ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজের ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছ থেকে যে আশাতীত ভাল ব্যবহার পেয়েছিলাম, তার জন্যে জীবনের এই অংশটি বাস্তবিক বড়ই ভাল

ভাবে কেটেছিল। খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র আর ভারতের সব প্রদেশের এরা হল বাছা বাছা ছাত্র আর তাদের সঙ্গে তাদের ও আমারও মনোনীত বিষয় নিয়ে কাজ। এই কাজের জন্য ইণ্ডোনেশিয়া ও ইণ্ডোচায়নার কয়েকটি রাষ্ট্রের দূত ও কন্সাল প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ পরিচয়, নতুন ভাষা শেখবার চেষ্টা—এ সব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এ সময়টা মনের আনন্দেই কেটেছিল। শিক্ষক জীবনের গোড়া থেকেই এ রকম কাজ পেলে মনে হয় আমি অনেক দিকে খুব এগুতে পারতাম। আমার সাধনার বিষয় 'এশিয়ার নব যুগ' সত্যই যথোচিত রূপে সিদ্ধ হত।

দিল্লীতে থাকবারও প্রথম দিকটায় খুব সুবিধা হয়েছিল। ইন্টারন্যাশানাল স্টাডিজ তখন ছিল সাপ্রু হাউসে। তার কাছেই কন্‌স্টিটিউশন্ হাউসে লোক-সভার (পার্লিয়ামেণ্টের) সদস্যরা থাকতেন। সেখানে কিছু ঘর খালি থাকলে কিছু অন্য ব্যক্তিও থাকতে পারতেন। প্রায় আড়াই বছর আমি ও আমার স্ত্রী কন্‌স্টিটিউশন্ হাউসে ঘর নিয়ে ছিলাম। ঐখানেই খাবারদাবারের বন্দোবস্ত ছিল। আমরা চীন যাত্রায় নেত্রী উমা দেবীর (পণ্ডিত নেহরুর বৌদিদির) ডাইনিং হলের টেবিলে সীট্ পেয়েছিলাম। সেই টেবিলে সিতামৌ-এর মহারাজ কুমার রঘুবীর সিং বসতেন। তিনি ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস বিষয়ে সত্যই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীতে বাইরে থেকে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই টেবিলেই খাওয়াদাওয়া করতেন। অনেকের সঙ্গে এই ডাইনিং হলে পরিচয় হয়েছিল। উমাদেবীও আমাদের দুজনকে বাড়ির লোকের মত দেখতেন। মীরট থেকে কেউ এলে এখানে তাঁদের জন্য ঘরেরও বন্দোবস্ত হয়ে যেত—সুতরাং কোনো অসুবিধাই হত না। বিজু মীরা টুটু প্রায়ই আসতো, নাতি-নাতনীরা দিল্লী বেড়িয়ে যেত। বেয়াইবাড়িও (শৈলেশ রায় মশায়ের বাড়ি) কাছেই ছিল, প্রায়ই যাতায়াত হত। সে কন্‌স্টিটিউশন হাউস আর নেই —সব ভেঙেচুরে চার-পাঁচতলা অট্টালিকা তৈরী হয়েছে। আমরা কিন্তু পুরানো বাড়িতে বেশ সুখে ছিলাম।

১৯৫৭ মে মাসে ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজে খবর এল যে পিনাঙে সাউথ ইস্ট এশিয়ান হিস্ট্রী কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হবে। ওরা আমাদেরও ঐ সভায় যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেছিল। ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজ, দিল্লী, আমাকে ওখানে পাঠানো স্থির করলেন—তবে খানিকটা খরচ আমাকেই দিতে হবে এই শর্তে। আমি তাতে কোনো আপত্তি করলাম না। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স প্লেনে কলকাতায় পৌঁছুলাম, সেখান থেকে বি. ও. এ. সি. প্লেন আমাকে ব্যাঙ্কক্

(থাই রাজধানী) নিয়ে যাবে। কলকাতায় বি. ও. এ. সি. প্লেনের জন্যে মাঝরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। ব্যাঙ্ককে যখন এ প্লেন পৌছুল তখন সেখান থেকে যে প্লেনে পিনাং যাবার কথা ছিল সেটি বেরিয়ে গেছে। আমাকেও বি. ও. এ. সি. বাসগাড়ি একটি ভাল হোটেলে নামিয়ে দিল। দোতলার বেশ ভাল ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এর আগের বার (উনিশ'শ তেইশ সালে) তো আমি একটি মুদির দোকানে ছিলুম। শুনলাম যে দুদিন আমাকে ঐখানেই থাকতে হবে। আমি ভাবলাম বি. ও. এ. সি. এই হোটেলের খরচ দেবে, আমি চূড়ালঙ্করন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আর একবার দেখে নিই। পরে কিন্তু বি. ও. এ. সি. এই হোটেল খরচ কিছুই দেয়নি।

যাহোক আমি একটি শ্যামদেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্যে চূড়ালঙ্করন যুনিভার্সিটি তো পৌছুলাম। ইতিহাস বিভাগে গিয়ে শুনলাম যে ঐ বিভাগে হেড প্রফেসর স্বস্তিকুল তার আগের দিন পিনাং গেছেন। ঘণ্টাখানেক হিস্ট্রি স্টাফ রুমে গল্প করা গেল। শ্যামদেশ, থাইল্যাণ্ড ছোট রাজ্য হলেও নিজেদের কারও চেয়ে কম ভাবে না। পিনাঙে প্রঃ স্বস্তিকুল আমাকে বলেছিলেন যে থাইদেশই সমস্ত ইণ্ডোচায়না অঞ্চলটা ইসলাম ধর্মের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ মালব তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। স্বস্তিকুল আরও বলেছিলেন যে এই শতাব্দীতে থাইদেশই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলটিকে কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে বাঁচাবে। ওখানে হিস্ট্রি লেক্চারারদের কাছে শুনলাম যে আমি যেন সায়াম সোসাইটিতেও ঘুরে আসি। ওখানে এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে খুব ভাল কাজ হচ্ছে। হোটেলে ফেরবার পথে সায়াম সোসাইটি দেখে এলাম। ওখান থেকে একটি ইংরাজি পত্রিকা 'Journal of the Siam Society' আমাদের International Studiesএর জন্য দরকারী বোধ হল। আমি এই জার্নালের জন্য অর্ডার দিয়ে গেলাম। আর শুনলাম যে থাইল্যাণ্ডে এক মহাপণ্ডিত প্রিন্স ধনিনিবত ইংরাজিতে শ্যামের আধুনিক ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিশেষের জন্য ওটি এখনও ছাপা হয়নি। যতদূর জানি ও বই ছাপা হয়নি এখনও—আর যতদিন শ্যামদেশে সামরিক শক্তি রাজশক্তিকে কাবু করে রেখেছে ততদিন কোনো প্রিন্সএর ওরকম বই বেরুতে পারে না।

এরই মধ্যে একবেলা থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআনন্দসহায়ের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলাম। ইনি সুভাষ বসুর I N A তে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি আমাদের ছাত্রদের এ বিষয়ে কাজ করতে বললেন—আর এ

কাজে তাদের সাহায্য করতে রাজী ছিলেন।

ইচ্ছে ছিল নদীর ধারে কতগুলি Wat (বাটী-মন্দির) দেখে আসি, কিন্তু বৃষ্টির জন্য সে আর হ'ল না। তারপর দিন ভোরবেলা Planeএর বাস আমাকে হোটেল থেকে নিয়ে গেল—রাস্তায় আর একটি বড় হোটেল থেকে একটি পাকিস্তানী ভদ্রলোককেও তুলে নিল, তারপর এয়ারপোর্টে আমাদের নামিয়ে দিল। পাকিস্তানী ভদ্রলোকটি আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি জানবার জন্য খুব উৎসুক ছিলেন। এয়ারপোর্টে যেখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয় সেখানে আমরা দুজনেই পাসপোর্ট অফিসের টেবিলে রেখে দিলাম। প্লেন ছাড়বার কয়েক মিনিট আগে পাসপোর্ট ফিরিয়ে নেবার জন্যে যখন আবার অফিসে গেলাম টেবিলে আমার পাসপোর্ট দেখতে পেলুম না। পাকিস্তানী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম তিনি নিজেরটি ফেরত পেয়েছেন কিনা। তিনি ফিরে পেয়েছেন কিন্তু আমারটির বিষয় কিছু বলতে পারলেন না। আমি তো মহা মুস্কিলে পড়লাম, বিদেশে পাসপোর্ট হারানো, বিশেষতঃ পিনাঙের পথে, যেখানে Communist Emergency পুরোদমে চলছিল। কি আর করবো পিনাং-যাত্রী প্লেনে গিয়ে বসলাম, ভাবলাম কোনোক্রমে পিনাং 'হিস্ট্রি কনফারেন্সে' বোধ হয় যোগ দিতে পারবো, তারপর দিল্লী ফিরে যেতে হবে। এ যাত্রায় আর ইন্দোনেশিয়া ও ক্যাম্বোডিয়া হলো না। পিনাং বিমান বন্দরে পৌঁছেই পাসপোর্ট দেখতে চাইল। যখন বললাম যে ব্যাঙ্কক বিমান বন্দরে হারিয়ে গেছে, তখন ওখানকার পোর্ট অফিসারের সন্দেহ হল। আমার সুটকেস্ খুলে দেখলে, Communism in South-East Asia বই সামনেই ছিল, তা দেখে আমার উপর সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। ভাগ্যিস সেই সময় "হিস্ট্রি কনফারেন্স" থেকে একটি ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে বিমান বন্দরে এসেছিলেন, তা না হলে আমাকে সেখানে অনেকক্ষণ আটকে রাখতো। আমি অবশ্য কনফারেন্সের নিমন্ত্রণ পত্র দেখিয়ে পোর্ট অফিসারকে খানিকটা আশ্বস্ত করতে পেরেছিলাম। আট-নয় মাইল গিয়ে একটি English Teacher's Colonyতে ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে দিলেন। দু-তিনটি ইংরাজ দম্পতি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁদের খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। খানিকক্ষণ পরে ওঁদের একজন আমাকে একটি বই দেখালেন আর জিজ্ঞেস করলেন আমি তো ঐ বই লিখেছি। বইটি দেখলাম সার এ. সি. চ্যাটার্জীর লেখা। উনি বিলেতে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন। আমি সবিনয়ে আমার hostদের বললাম যে সার এ. সি. চ্যাটার্জী,

চ্যাটার্জী বটে কিন্তু আমার (বি. আর. চ্যাটার্জীর) সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একটি সাধারণ শিক্ষক, সার এ. সি. চ্যাটার্জী হলেন Knight ও অতি উচ্চ-পদস্থ অফিসিয়াল। চা পর্ব শেষ করে ওঁদের একজন তাঁর ছোট মোটরটি করে আমাকে কনফারেন্সের জায়গায় নিয়ে গেলেন। রাস্তার দুধারে সাদা গোলন-চাঁপার বড় বড় গাছ। গোলনচাঁপা হল মালায়ার জাতীয় পুষ্প। সন্ধ্যার সময় গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম, কনফারেন্স তখন পুরোদমে চলছে। হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কাপড় ছেড়ে আবার বেশভূষা পরে ভিড়ের জায়গায় যাবার মত উদ্যম ছিল না। কনফারেন্স হলের ওপরে দোতলায় একটি ঘর আমার জন্যে ঠিক করা ছিল। বিছানা পাতাই ছিল, শুয়ে পড়লাম, নীচে কনফারেন্সের বক্তৃতা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পাশের ঘরেই ছিলেন Dr. Singhal ও তাঁর বিদুষী স্ত্রী শ্রীমতী দেবাহুতি। সকালবেলা উঠে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল। পিনাঙে অবস্থান কালে তাঁরা আমার খুবই আদর যত্ন করেছিলেন। তারপর ধুতি চাদর পরে বাঙ্গালী বাবু বেশে কনফারেন্স হলে উপস্থিত হলাম। ভারত থেকে আমিই একলা এসেছিলাম, Singapure University থেকে Prof. Parkinson (পরে Parkinson Law প্রকাশ করে বিখ্যাত হয়েছেন) ও Drs. Singhal (স্বামী, স্ত্রী), হংকংএর Prof. Brian Harrison, Australiaর Canborra University থেকে Dr. Bastin, Malayaর সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজা Sir Uda, পিনাঙের চীনা Mayor Mr. Ho, English Teacher's Colony থেকে কয়েকটি ইংরাজ শিক্ষক আর স্থানীয় কয়েকজন মালয়, চীনা ও ভারতীয় ভদ্রলোক ও মহিলা কনফারেন্স হলে সমবেত ছিলেন। পিনাঙের মেয়র মিঃ হো ছিলেন আমাদের host—তিনিই Chinese Club আমাদের কনফারেন্সের জন্য দিয়েছেন।

এক সপ্তাহ (৮ই জুন থেকে ১৪ই জুন ১৯৫৭) আমরা সকালে কনফারেন্সে বসতাম, বিকেল বেলা পিনাং দ্বীপে বা মালায়ায় ঘোরাফেরা হত। একদিন সকালবেলা দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সমস্ত দিন মালায়ায় রবারজঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীতীরে কাটানো হল। তখন কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে, অনেক জায়গায় রবার জঙ্গলে তারের বেড়া দেওয়া, তার ওধারে কমিউনিস্টদের হাতে পড়বার ভয় আছে। দু-একটি রেস্ট হাউসে বৃটিশ অফিসাররা রয়েছেন। সমুদ্রতীরে বৃটিশ নৌ-সেনা হল্লা করছে শোনা গেল। সে সময় সিঙ্গাপুর য়ুনিভার্সিটির প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ সলিভান য়ুনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী নিয়ে কয়েকটি পুরানো সাইটসএ খনন

করছিলেন। একটি বাঙ্গালী ছাত্রী দেখলাম মাটি পাথর ঝুড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বাঙালী শুনে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কইলে। একটি পাহাড়ের চূড়ার ওপর থেকে দেখা গেল সমুদ্রতীরে সেই জায়গাটি যেখানে পনেরশ' বছর পূর্বে রক্তমৃত্তিকার মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত দান করেছিলেন বোধ হয় এ ভূমিখণ্ডটি, আর সেইখানেই পাওয়া গেছে একটি শিলালিপি। তাতে বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্রটি খোদিত আছে "যে ধর্মা হেতু প্রভবা তেষাম হেতুং তথাগতোঃ অবদৎ। তেষাম চ যো নিরোধঃ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ।" এটি হল মালায়ার নর্থ ওয়েলেস্‌লি প্রভিন্সের পূর্ব উপকূলে। আরো দু-একটি প্রাগৈতিহাসিক স্থান দেখলাম—দু-এক জায়গায় খুব সাবধানে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে কমিউনিস্ট গেরিলা বাহিনী আক্রমণ করতে পারে। দু-একটি খননের জায়গায় শুনলাম যে মিঃ কার্তরিচ ওয়েলস্‌ (সখের প্রত্নতাত্ত্বিক) আগেই খনন করে গেছেন এবং সত্যিকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মত মোটেই ঠিক রকমে করেননি। ভাল করতে গিয়ে অনেক ক্ষতি করেছেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় পিনাঙের মেয়রের বাগানে গার্ডেন পার্টিতে আমাকে একটি ইয়োরোপীয়ান্‌ ভদ্রলোক খুব উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কার্তরিচ ওয়েলস্‌এর খনন কাজ সম্বন্ধে কি মতামত শুনেছি। আমি বললাম যে তাঁকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গালাগালিই দিয়েছে। তিনি এ শুনে খুব হাসলেন বটে কিন্তু আমার মনে হয় তিনিই ছিলেন মিঃ কার্তরিচ ওয়েলেস্‌।

আর একদিন আমাদের কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হল পিনাঙের পাহাড়ের চূড়ায়। ফিনিফিউলার রেলওয়ে দিয়ে—তার মানে দুটি ট্রেন, পরস্পর লোহার কাছি দিয়ে বাঁধা, পাহাড়ের গায়ে খাড়া চড়ছে। একটি নামছে অন্যটি উঠছে। ট্রেনের মধ্যে সিটগুলি গ্যালারির মত সাজানো। পাহাড়ের চূড়া প্রায় সমতল, সেখানে একটি সুন্দর পার্ক করা হয়েছে। পাহাড়ের নীচে ট্রপিকাল জঙ্গল। ওপরে বিলাতি মরসুমী ফুল চমৎকার ফুটে রয়েছে। বাগানের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস রয়েছে। সুন্দর বড় বাঙলা, চারিদিকে কতরকম টবে লাগানো চমৎকার ছোট গাছ। ওপরে চারিদিকে খুব ঘোরা হ'ল—এখানে সেদিন কোনো মিশনারি স্কুলের বাচ্চারাও বেড়াতে এসেছিল, জায়গাটি ছিল হৈ চৈ হাসিখুশীতে ভরা—আর নীচেকার দৃশ্য বাস্তবিকই অপূর্ব। তিন ধারে সমুদ্র, বন্দরে ছোট ছোট রণতরী (ফ্রিগেট্‌, গানবোট প্রভৃতি) ওপর থেকে খেলনার মত দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে ও নীচে গোলনচাঁপা, বুগেনভেলিয়া ইত্যাদি ফুলে ভরা—rambastan (লিচুর মত এর ফল) গাছ লাল ফল ভরা—সব মিলিয়ে যেন একটি

রঙ্গীন ছবি।

নীচে চাঁদনী রাতে সিংগল সাহেবের মোটরে স্ট্র্যাণ্ড রোডে বেড়িয়েছি। সমুদ্রের ধারের রাস্তায় আলো, বড় বড় বাড়িগুলিতে আলো, বন্দরের জাহাজগুলিতে আলো। এসব আলোতে পিনাং পরী রাজ্যের মত দেখায়। পিনাং মালয় নাম—মানে সুপারিদ্বীপ—বড় সুন্দর জায়গা—যদিও এই হল গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'পুলিপলম'। তখন যাদের 'লাইফ সেন্‌টেন্স' দণ্ড দেওয়া যেত—যে কারাবাস মরণেই শেষ হয়—তাদের 'পুলিপলম' (পুলো মানে দ্বীপ মালয়ের ভাষায়) বা পিনাং পাঠানো হত। অনেক পরে আন্দামানদ্বীপে এই বেচারাদের পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

আমাদের কন্‌ফারেন্সে ঠিক হল যে একটি ষান্মাসিক পত্রিকা সাউথ ইস্ট এশিয়ার ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ে কন্‌ফারেন্স প্রকাশ করবে। এর জন্য U N E S C O র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে যে ঐতিহাসিকেরা কাজ করছেন তাঁরা যেন নিজেদের মধ্যে সহযোগ করবার ব্যবস্থা রাখেন আর এক দেশের কর্মীরা যেন অন্য দেশে গিয়ে এই কাজ করতে পারেন। এ সব দেশের ভাষা [মানে, বাহাসা, ইন্দোনেশিয়া, খমের (ক্যাম্বোডিয়ান), ভিয়েত-নামীজ, বর্মী ইত্যাদি] পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনও একটি কেন্দ্রে একটি ভাল লাইব্রেরী ও আর্চাইভ গড়ে তুলতে হবে। আর দু বছর পরে হয় সিঙ্গাপুরে বা ব্যাঙ্ককে আরও বড় করে সাউথ ইস্ট এশিয়া হিষ্ট্রি কন্‌ফারেন্স করার চেষ্টা করতে হবে।

সিংগল দম্পতির কৃপায় এখানে আমার খাওয়াদাওয়ার কোনো কষ্ট হয়নি। কর্তা চাইনীজ্ রেস্তরাঁতে মাছ মাংস খেতেন, গিন্নী ছিলেন নিরামিষাহারী। আমরা প্রায়ই ফলের বাজারে গিয়ে মালয়ের নতুন নতুন ফল কিনতাম—ম্যাঙ্গোস্টিন্, র‍্যামবানস্টান (ঝালর দেওয়া লিচু, গন্ধটা একটু চড়া), ডুরিয়ান্ (কাঁঠালের মত খুব মিষ্টি, একটু উগ্রগন্ধ), অ্যাভোকেডো (দেখতে সুন্দর নাসপাতির মত তবে মিষ্টতা কম)। আর একটি ঠিক পাহাড়ি আলুর মত ফল (ভেতরে চার-পাঁচটি কালো বিচি) ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশতঃ 'র‍্যাম্‌বানস্টান্' (মালয় লিচু, গোল নয় ডিম্বাকৃতি, রেশমী সুঁয়োয় ঢাকা) এত মিষ্টি যে ঘরে ফল রাখবার জো ছিল না, লাল পিঁপড়েতে ভরে যেত। একটি হিন্দুস্থানীর দোকানে রুটি, নিরামিষ তরকারি ও 'মালাই' পাওয়া যেত, সেখানেও রুটি ও মালাইএর লোভে মাঝে মাঝে যাওয়া হ'ত। সেই দোকানী সুভাষ বসুর পিনাংএ আসার

গল্প করতো আমাদের সঙ্গে।

কন্‌ফারেন্স শেষ হল—সে সময়টা স্থানীয় নাগরিকদের মনের অবস্থা বিশেষ ভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিল। কারণ মালায়ায় 'স্বাধীনতা দিবস' শীঘ্রই ঘোষিত হবে। বিলাত থেকে তার মঞ্জুরি এসেছে। বেশ বোঝা গেল যে চীনা আর ভারত-বাসী যারা মালায়ায় অনেকদিন (অনেকে দু-তিন পুরুষ) আছে, তারা যেন ভয় পেয়েছে। এতদিন মালায়ার মালেরা চাষবাস করত, পুলিসে কাজ করত, দপ্তরে চাপরাসী হত—আর ব্যবসা বাণিজ্য চীনা বা ইয়োরোপীয়ানদের হাতে ছিল। ওকালতি, ডাক্তারি, লোকশিক্ষা দেবার কাজ ভারতীয়েরা প্রায় একচেটে করে নিয়েছিল। সুতরাং ভয় হওয়া স্বাভাবিক যে মালেরা এবার এর শোধ তুলবে। দেশে ফিরে আসার পর মালায়ার স্বাধীনতা দিবসে আমি মালায়ার মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে কয়েক মিনিটের 'টক' দিয়েছিলাম।

১৪ই জুন—পিনাঙের চীনে মেয়র একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনালেন ও তার প্রমাণ দেখালেন। গত শতাব্দীতে পিনাঙে চীনাদের 'লজ' (আমরা যাকে মেসনিক লজ বলি সেই রকম) ছিল, আবার লজে লজে ঘোর শত্রুতাও চলতো। এই রকম দুটি লজের মারামারিতে যখন কয়েক শ লজ মেম্বর হত হ'ল তখন সন্ধি হল, যে কুয়োতে অসংখ্য মৃতদেহ ফেলা হয়েছিল সেখানে একটি শান্তির মন্দির স্থাপন করা হ'ল। আমরা সেই মন্দির দেখতে গেলাম, অদ্ভুত তার কারুকার্য। আমাদের যাঁরা এখানে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঐ লজ মেম্বরদের বংশধর। দক্ষিণ চীনের লজগুলির নিয়মাবলী খানিকটা ওয়েস্টার্ণ মেসনিক লজের অনুরূপ—হয়তো ইয়োরোপ চীনের কাছ থেকে এ 'সাইনস'গুলি নিয়েছে—দক্ষিণ চীনের লজগুলি ছিল anti-Manchu dynasty centres। পিনাঙের একটি চীনা মঠেও আমাদের খুব অভ্যর্থনা হয়েছিল—আর সেখানে যেমন 'ফ্রায়েড রাইস' (নিরামিষ) খেয়েছিলাম, অমনটি আর কোথাও খাইনি। ওখানের একটি বৌদ্ধ (চীনা) মন্দিরও খুব বৃহৎ ব্যাপার ও খুব সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জানি না মালায়ার স্বাধীনতার পরে এখন পিনাঙের চীনাদের অবস্থা কিরূপ।

১৫ই জুন ১৯৫৭—প্রঃ সিংগল আমাকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিলেন। পিনাঙে যে এক সপ্তাহ এত সুখে ছিলাম তার জন্য সিংগল দম্পতির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

যখন আমাদের বিমান সুমাত্রার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন বিমানের ক্যাপ্টেন্ (ডাচ কে. এল. এম্. বিমান) মাইকে আমাদের জানালেন যে আমরা ভূবিষুব-

রেখা পার হচ্ছি—আর যাঁরা এই রেখা প্রথম পার হচ্ছেন তাঁদের তিনি অভিনন্দিত করছেন। আর আমাদের উপহার দেওয়া হল একটি নেপচুনের (বরুণদেবের) রাজসভার ছবি আর একটি চীনামাটির খুব ছোট 'ডাচ কুটীর', তার মধ্যে creme de menthe ভরা আর সীল্ করা। ছবিটি রঙীন ও খুব ছোট (অ্যামস্টারডামে লিখলে বড় ছবি পাওয়া যায়), বরুণদেব ত্রিশূল হস্তে সিংহাসনে আসীন, চারিদিকে জল—মার্মেডরা (পরীরা) সাঁতার কাটছে আর নানারকমের সামুদ্রিক জীব ঘিরে রয়েছে।

জাকার্তা (যবদ্বীপের ও সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী) পৌঁছতে দেরী হল না। তখন বিমানবন্দরে সবাই একটি সুন্দরী 'জাভানীজ্' মহিলার অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। খুব সম্ভবতঃ উনি রাষ্ট্রপতি ডাঃ সুকর্ণের স্ত্রী হবেন। একটি পোর্টারের সাহায্যে একটা 'বেচা' ধরে ভারতীয় দূতাবাসের দিকে চললাম। পাঁচ-ছ মিনিট পরেই 'বেচাওয়ালা' আমাকে একটি নির্জন ছোট 'কম্পাউণ্ডে' নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। অনেক ডাকাডাকির পর (তখন ভোরবেলা) একটি পশ্চিম পাকিস্তানের (ওয়েস্ট পাঞ্জাব) মুসলমান ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে বললাম যে আমি ভারতের দূতাবাস বা কনস্যুলেট্এ যেতে চাই, বেচাওয়ালা আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। পাঞ্জাবী মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন যে আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, চা খান, তারপর আমি আপনার ওখানে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব। পাকিস্তান, হিন্দুস্তান তো প্রতিবেশী মিত্র দেশ। যাক, তাঁকে অনুরোধ করায় তাঁর চাকর বেচা নিয়ে এল আর তিনি বেচাওয়ালাকে কোথায় যেতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। এবার রিক্শাওয়ালা আমাকে ভারতীয় দূতের অফিসের প্রথম সেক্রেটারি শ্রীরামমূর্তির ফ্ল্যাটের নীচের তলায় নিয়ে হাজির করলো। ডাকাডাকি করে রামমূর্তিজীকে পাওয়া গেল। আমি তাঁকে বললাম যে আমি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ওপর গবেষণা কাজে এসেছি, কিছুদিনের জন্য জাকার্তায় থাকবার বন্দোবস্ত যেন তিনি করে দেন। মিসেস মূর্তি তখনই আমাকে ওপরে ডেকে নিয়ে গেলেন, আমার স্নান ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে দিলেন; ইতিমধ্যে মিঃ মূর্তি আমাকে কাছেই একটি হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত ফোনে করে দিলেন। খানিকক্ষণ পরে উনি নিজে গিয়ে আমাকে সেই হোটেলে রেখে এলেন।

তখন ইন্দোনেশিয়াতে পার্লামেন্টের জন্য নির্বাচন দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়ে গেছে। অগণিত দ্বীপপুঞ্জ থেকে নির্বাচনপ্রার্থী ইন্দোনেশিয়ান গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রাজধানী

জাকার্তায় পেঁছে গেছেন। সব হোটেল ভরা, আমি তো একটি মাঝারি গোছের হোটেলে একটি আউট-হাউসের মত ব্লকে একটি ইন্দোনেশিয়ান্ শিক্ষকের সঙ্গে একটি ছোট ঘর শেয়ার করলাম। মিসেস মূর্তি এসব শুনে আমাকে তাঁদের বাড়িতেই নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। আমি বিকেল বেলাটা ওঁদের ড্রয়িং রুমে কাটাতাম। এর বেশী তাঁদের আর কষ্ট দিলাম না। হোটেলেই রইলাম। এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। জাকার্তা বেশ গরম জায়গা, রাত্রে মশারীরও দরকার হয়, কিন্তু কোনো রকম পাখার বন্দোবস্ত নেই। হোটেলের মালিককে বললাম যে একটি ছোট 'টেব্‌ল ফ্যান' পেতে পারি কিনা তার ভাড়া আমিই দেব। তিনি তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন—যেন এরকম কথা কখনও শোনেননি। তাঁর কাছে শুনলাম যে ইন্দোনেশিয়াতে পাখার হাওয়া বিশেষতঃ রাত্রিবেলা, বড়ই অস্বাস্থ্যকর। কোনো বাড়িতে পাখা চালানোর ব্যবস্থা নেই। এই বলে তিনি আমাকে একটি ছোট কাগজের হাতপাখা প্রেজেন্ট করলেন। আমার তখন মনে পড়লো ডাচ বইয়ে পড়েছিলাম যে ডাচেরা ব্যাটেভিয়ায় (জাকার্তার ডাচ যুগের নাম) রাত্রে গরম কাপড় পরে শুতো, যাতে ঘাম হয়। তা না হ'লে শরীর খারাপ হ'ত। একটু বেশী রাত্রি হলে আমারও তেমন কষ্ট হত না।

আমাদের দূতাবাসে প্রথমে শুনেছিলাম যে আমাদের ইন্টারন্যাশানাল স্টাডিজের ছাত্র বিশাল সিং যোগ্‌য়াকার্তায় (দক্ষিণ জাভায়) গজমদ বিদ্যালয়ে 'রিসার্চ' করছে। পরদিনই দূতকার্যালয়ের ইন্‌ফরমেশন্ অফিসের কাছে খবর পেলাম যে কিছুদিন হল বিশাল সিং জাকার্তায় ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস্‌এ ভর্তি হয়েছে। ও যে বিষয় নিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ান্ পলিটিক্যাল্ পার্টিস্—তার জন্যে ওর জাকার্তায় থাকাই ঠিক ছিল। জাকার্তা হল রাজধানী, যোগ্‌য়াকার্তা এখন একটি মফঃস্বল শান্তিময় পুরানো শহর।

ফোনে বিশাল সিংকে পাওয়া গেল। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। ওকে না পেলে হোটেলের যে খাওয়াদাওয়া ও ঘরের কষ্ট ছিল তার জন্যে আমাকে তিন চার দিনের মধ্যেই জাভা ছাড়তে হত। ওর সঙ্গে গোড়ায় ওর প্রফেসরদের সঙ্গে দেখা করা গেল। প্রঃ সুদিমান ('ল' প্রফেসর) খুশী হলেন যে বিশাল সিং জাকার্তায় এসেছে। তিনি 'আদল বিধান' (আদত 'ল' কাস্টমারিন) সম্বন্ধে দু-একটি কথা বললেন, আর বললেন ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আদত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধান। রাষ্ট্রপতি সুকার্ণোরও সেই মত। সুদিমান তার পরদিনই বিদেশ যাত্রা

করলেন। জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশ্যাল সায়েন্সেস্ বিভাগের হেড প্রঃ Don Arn তখন জাপানে ছিলেন। তাঁর জায়গায় কাজ করছিলেন মাদাম্ বুদিয়ার্যো। ইনি উচ্চশিক্ষিতা যবদ্বীপের বিদুষী মহিলা—জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কথা বললেন। ইংরাজি বেশ ভাল বলতে পারেন। তাঁরই কাছে শুনলাম যে প্রাচীন যবদ্বীপের ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ প্রঃ পূর্বকরকত কিছুদিন থেকে জাকার্তায় নেই, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ঘুরছেন তাঁর কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে। পরে ওঁর একটি চিঠি পেয়েছিলাম, আমার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করে ছিলেন ঐ চিঠিতে। জাকার্তায় বিশাল সিংএর পড়াশুনার ব্যবস্থা দেখে নেওয়ার পর আমাদের স্কুল অফ্ ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজের জন্যে এখানে আর কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে ভাববার সময় পেলাম। জাকার্তায় বিখ্যাত বইয়ের দোকান 'পেমহানুগুয়াণ্ট'এ বিশাল সিং নিয়ে গেল। দোকানের মালিক মিঃ সুজাত্মকো সোস্যালিস্ট নেতা তখন জাকার্তায় ছিলেন। তবে তাঁর দোকান থেকে ইণ্টারন্যাশনাল স্টাডীজ দিল্লীতে বেশীর ভাগ বাহাসা ইন্দোনেশিয়ার লেখা বই (অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষায় লেখা) পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হল। ইন্দোনেশিয়া দশ বছর আগের সরকার প্রকাশিত ডাচ ভাষা একেবারে পরিত্যাগ করেছে। এখন সরকারী কাজ বর্তমান শিক্ষা, সাহিত্য ও ব্যবসা বাহাসা ইন্দোনেশিয়ার মাধ্যমে চালানো হচ্ছে—আর স্বীকার করতেই হবে যে মোটের ওপর ভালভাবেই চলছে। ইন্দোনেশিয়ার অনেক নতুন চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—কিন্তু এই ভাষা-বদল কৃতকার্য হয়েছে। দিল্লী ফিরে গিয়ে আমি আমার ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলেছিলাম যে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া বাস্তবিকই দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সফল হয়েছে। তার পরদিন স্টেট্স্ম্যান্ আমার এই বক্তৃতার রিপোর্টে লিখলেন যে আমি বলেছি বাহাসা ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অসফল হয়েছে। আমাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী জাভানীজ দূতালয়ের কাল্চারাল্ সেক্রেটারি ডাঃ সুজনো খবরের কাগজে এই রিপোর্ট পড়ে বললেন, সত্যিই কি আমি বাহাসার ব্যর্থতা লক্ষ্য করেছি! আমি বললাম মোটেই নয়, স্টেট্স্ম্যান্ উল্টো বুঝেছে। আর আমি এ খবর কাগজে লিখে পাঠিয়েছি। ভুলটা সংশোধন করবার জন্য। তার পরদিন স্টেট্স্ম্যান্ ভুল স্বীকার করল। সুজনো সন্তুষ্ট হলেন। সুজনো (বা সয়নো) আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। আমাদের বাহাসা শেখবার ব্যাপারে খুবই সহায়তা করেছেন, আর বিশাল সিংকে তো নিজেদেরই আত্মীয়ের মতই দেখতেন। আমার জাভা ভ্রমণেও তিনি চিঠিপত্র দিয়ে জাকার্তা

ও যোগয়াকার্তায় অনেকের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। আর তাঁরই খাতিরে আমরা জাকার্তায়, তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এগারো খণ্ড 'রিপাবলিক্ অফ্ ইন্দোনেশিয়া (সমগ্রদ্বীপপুঞ্জের আধুনিক সমীক্ষা) আর তিন খণ্ডে 'এন্সাইক্লোইপিডিয়া ইন্দোনেশিয়া' আমাদের সাপ্রু হাউসে লাইব্রেরীর জন্যে পেলাম। এই দুটি বৃহৎ পুস্তক বাহাসায় লেখা। এ থেকে বুঝতে পারা যায় ঐ ভাষা কতটা এগিয়েছে।

জাকার্তায় থাকতে একদিন আমরা ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সুতন শাহরীরের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম। শাহরীর ও সুকার্ণো এঁরাই তো ছিলেন ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তিসংগ্রামে অগ্রণী। দুর্ভাগ্যবশত: এখন এ দুজনের মধ্যে সুহৃদভাব একেবারে বিলুপ্ত। তাই আমি আমাদের কথাবার্তার গোড়াতেই বলে ফেললাম (ও রকম বলা ভুল হয়েছিল) যে আমরা দূর দেশে থাকি। আমরা তো এ বিরাট দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের তিনজনকে, সুকার্ণো, আপনি (শাহরীর) ও হাট্টাকে দেশের তিন মহানেতা বলেই জানি। এখন আপনাদের মধ্যে আর সদ্ভাব নেই, সহযোগিতা নেই, এসব শুনে আমরা মনে বড় কষ্ট পাই। এতে দেশেরও সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে। আমার এ কথা শোনা মাত্র শাহরীর যেন খানিকটা বিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে সুকার্ণো কি আপনাদের আমার কাছে পাঠিয়েছেন এ রকম অনুরোধ করতে? উনি যদি আমাদের সহযোগিতা না চান তাহলে আমি আর কি করতে পারি?

আমরা নিজেদের ভুলটা বুঝতে পেরে বিষয়টা বদলে নিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সুকার্ণোর ন্যাশানাল কাউন্সিল বিষয়ে আপনার কি মত? সুকার্ণো পার্লামেন্টের ওপর বিরক্ত হয়ে কিছুদিন হল প্রস্তাব করেছিলেন যে উনি নিজের দেশের কয়েকটি গণ্যমান্য ব্যক্তি বেছে নেবেন (য়ুনিভার্সিটি, সৈনিকবিভাগ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি থেকে) ও তাদের পরামর্শ সব দরকারী বিষয়ে চাইবেন। অনেকের মতে পার্লামেন্টের মত অগ্রাহ্য করে। এর উত্তর তৎক্ষণাৎ শাহরীর দিলেন, 'চার চাকার গাড়ির যেমন আর একটি পঞ্চম চাকার দরকার নেই তেমনি ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশানাল কাউন্সিলেরও কোনো প্রয়োজন নেই।' এখানে শাসন কাজের চারটি চাকা হল (১) সৈনিক বিভাগ (২) পার্লামেন্ট (৩) মন্ত্রীসভা (৪) রাষ্ট্রপতি। গুরুত্ব অনুসারে এই নম্বর দেওয়া হয়েছে। শাহরীর গণতন্ত্রে পুরো বিশ্বাস রাখতেন। আর তিনি সোস্যালিস্ট পার্টিরও নেতা। তাঁর বিশ্বাস—'কিছু সময় না পেতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রই হল শাসনের একমাত্র উপায়।'

আর এদিকে সুকার্ণো' যেন ক্রমশঃই গণতন্ত্রে বিশ্বাস হারাচ্ছিলেন। তাঁর-

জায়গায় তিনি এখন 'গাইডেড্ ডেমক্রেসি' চালাতে চান। 'গাইডেড্' মানে হল সুচালিত—গণতন্ত্র অচল হলে কাজ হবে না। এখনও দেশের লোক 'আনগাইডেড্' ফ্রী ডেমক্রেসি বোঝে না, দেশের লোককে কিছুদিন এ বিষয়টি ভাল করে বোঝাতে হবে। বিশেষজ্ঞরা তাদের পথপ্রদর্শকরূপে দেশের লোকদের দেখাবেন কি করে গণতন্ত্র এই বাস্তব জগতে চলতে পারে। সুদূর ভবিষ্যতের জন্য নির্ভেজাল democracy আপাতত: তোলা থাক, শিক্ষিত, বহুদর্শী যথার্থ কর্মীরা বর্তমান অবস্থায় হাল ধরুন। নয়ত নৌকাডুবি হবেই হবে।

জাকার্তা বড় শহর। এইটি হল এর পুরানো নাম জয়ক্রাতনের (ক্রাতন মানে রাজভবন) অপভ্রংশ। ডাচ আমলে এর নাম হয়েছিল ব্যাটেভিয়া, ডাচেদের চলে যাবার পরে জাকার্তা হয়েছে। শহরের মধ্যে দিয়ে রাস্তার পাশাপাশি অনেক জায়গায় খাল আছে। এগুলি হল্যাণ্ডের অ্যাম্স্টারড্যাম প্রভৃতি শহরের অনুকরণ। জালান নুসাস্তারা (জালান = রাস্তা, নুসাস্তারা = দ্বীপপুঞ্জ) জাকার্তায় প্রসিদ্ধ রাস্তা, মধ্যে বড়খাল অনেকটা পাকা বাঁধের মধ্যে দিয়ে গেছে, একধারে বড় বড় দোকান। দু-একটি বড় ডাচ দোকান তখনও ছিল। ভ্যান্ডর্প ও কল্ফ্—এককালের বিখ্যাত বইয়ের দোকানে তখনও (১৯৫৭ সালে) কিছু ভাল বই পাওয়া যেত। আর পাওয়া যেত সুন্দর বলী দ্বীপের গাছের গুঁড়ি থেকে খোদাই করা চমৎকার খেলনা (দামও চমৎকার)।

এবার আমরা (আমি ও বিশাল) যোগ্য়াকর্তা গেলুম। আমি গেলুম জগদ্বিখ্যাত বোরবুদুর ও প্রম্বানম্ দেখবার জন্যে, বিশাল তার গজমদ য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর হার্জনের (অর্জুনোর) সঙ্গে দেখা করে নিজের কাজের বিষয়ে তাঁর নির্দেশ নেবার জন্য।

যোগ্য়া আমার খুব ভাল লেগে ছিল। গণ্ডগোল নেই, ভারতের ছাপ যেন এখানে কিছু আছে। ডাঃ সুজনোর ভাই এখানে কাজ করেন, তিনি আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। গজমদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ হার্জনোর সঙ্গে সর্বপ্রথম দেখা করলাম। তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর বিষয়ে অনেক বই দেখলাম। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে ভারতে ফিরে গিয়ে যেন আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো স্বামীজিকে যোগ্য়া পাঠাই। এখানে একটি রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি স্থাপন করতে তিনি (অর্জুনো) কিছুদিন থেকে চাইছেন।

তার পরদিন বোরবুদুর দেখতে গেলাম। ধানের ক্ষেতের মধ্যে একদিকে

একটি আগ্নেয়গিরি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর একদিকে বরভূধর (সত্যিই বর-ভূধর) বৌদ্ধধর্মের গরিমা যেন আজও প্রচার করছে। একটি পাহাড়কে স্তূপে পরিণত করা হয়েছে। আর নীচে থেকে ওপরে উঠতে পাহাড়ের গায়ে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী শক্ত পাথরে খোদিত রয়েছে। কতগুলি প্যানেল বাস্তবিক অপরূপ। যত ওপরে ওঠা যায় খোদায়ের কারুকার্য কমতে থাকে। সব ওপর ধাপে কয়েকটি খালি ছোট স্তূপ। খালি মানে শূন্য। বোরবুদুর ভোলবার জিনিস নয়। আর এর বিষয়ে ডাচেরা সুন্দর বই লিখেছেন। সিলভেঁ লেভির (সুমহান ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ) মতে প্রসিদ্ধ বুদ্ধের জীবনী 'ললিত বিস্তবে'র সচিত্র সংস্করণ হল বরভূধর।

সেইদিনই প্রম্বানম দেখলাম চড়্‌চড়ে রোদ্দুরে। কিন্তু মন্দিরগুলি (তিনটি মন্দির, মধ্যেরটি ভাল অবস্থায়) দেখতে দেখতে চড়া রোদ্দুরের কথা ভুলে গেলাম। মধ্যের মন্দিরের গায়ে রামায়ণের bas relief পৃথিবীর যে কোনো আর্ট গ্যালারির গৌরব হতে পারে। আর এখানে একটি পার্বতীর মূর্তি (পুরো statue) আছে, ওরকম সুন্দর মূর্তি আমি আর কোথাও দেখিনি। প্রম্বানমের চারিদিকে অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠের ভগ্নাংশ। এরই খুব কাছে চণ্ডী (মন্দির) মেনডুতে (Tchandi Mendoot) সেই অপূর্ব বোধিসত্ত্বের মূর্তি দেখলাম যার প্রশংসা কত জায়গায় পড়েছি। এই মূর্তিটি যেন চেয়ারে বসে আছেন।

সবশেষে গজমদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। গজমদ হলেন প্রায় ছশ বছর আগের মজপাহিতের (বিল্বতিক্ত সাম্রাজ্যের) প্রধানমন্ত্রী। কোনো রাজসভাসদ একে ঠাট্টা করলে ইনি বলেছিলেন যে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের সব দ্বীপগুলি জয় করতে না পারলে উনি মাথার চুল চূড়া বেঁধে রাখবেন না। মজপাহিতের নৌবাহিনীর নায়ক নলের সাহায্যে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণ করে ছিলেন। জাভা, বলী, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিজ্, স্পাইস আইল্যাণ্ডস, নিউ গিনি প্রভৃতি দ্বীপে মজপাহিতের সম্রাট Hayam Wurak ওরফে রাজসনগর একচ্ছত্র নৃপতি ছিলেন। এখন সুকার্ণোর উচ্চাভিলাষ ছিল যে তিনি আজকের ইন্দোনেশিয়াকে মজপাহিতের সমতুল্য করে তুলবেন।

গজমদ বিশ্ববিদ্যালয়টি যোগ্যাকার্তার সুলতানের ক্রাতনে (রাজভবনে) অবস্থিত। সুলতান ক্রাতনের যে অংশে এখন থাকেন তার প্রবেশদ্বারের উপর লক্ষ্মীর মূর্তি রয়েছে। . শুনেছি লক্ষ্মীদেবীর আরতি এখনও করা হয়। সুলতানের

নামে এখনও ভুবন উপাধি যুক্ত আছে।

আমি জাকার্তায় ফিরে এলাম। বিশাল ডাঃ হার্জানোর কাছে পড়বার জন্যে যোগ্য়ায় রয়ে গেল। দু'তিনদিন দিনের বেলাটা ভারতীয় দূতাবাসেই কাটালাম। তখন জেনারেল ইলেকশন্ খুব জোরে চলছে। P. K. I (সাম্যবাদী দল) বেশ জিতছে, মাস্যুমি (গোঁড়া মুসলমান) খুব হারছে, অনেকেরই মন বিচলিত। এই পরিস্থিতিতে আমি রুস্লান আবদুল গনির (সুকার্ণোর প্রিয় পরামর্শদাতা) সঙ্গে দেখা করলাম। উনি তো প্রেসিডেন্টের খুব ভক্ত। উনি বললেন যে গণতন্ত্রের জন্য দরকার ক্ষমতাশালী মধ্যবিত্ত সমাজ। ইন্দোনেশিয়াতে তো তা নেই। তাই এখানে প্রথমে চাই গণতন্ত্রে শিক্ষানবিশি স্টেজ্—'গাইডেড্ ডেমক্রেসি'। তারপর কোনো সুদূর দিনে গণতন্ত্রও কৃতকার্য হতে পারে। আর সাম্যবাদও এখন চলতে পারে না। যে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী এখন কোনো রকমে কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাপন করছে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করাই হল এখনকার কর্তব্য। এই হ'ল 'মারহেনিজম্' (যে সব লোকের একদিনের খোরাক বন্ধ হলে, তার পরদিন অনাহারে থাকতে হয় তারা হল 'মারহেন্')। সুকার্ণো এখন মারহেনিজম্ নীতি অবলম্বন করে দেশের উন্নতি করতে চান।

ভারতের দূতাবাসে আর শ্রীরামমূর্তির বাড়িতে ভালই দিনগুলি কাটছিল, হঠাৎ 'ফ্লু'তে শুইয়ে দিলে। মাস কয়েক থেকে মালায়ায় 'ফ্লু'র প্রকোপ চলছিল, ওর ভয়েই অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি পিনাং কন্ফারেন্স-এ আসেন নি। আমারও ভয় হ'ল যে ঐ হোটেলে আমি জ্বর গায়ে পড়ে থাকবো। আমার পাসপোর্টও বেশী দিনের ছিল না। আর সবচেয়ে বিপদ হল তখন ইন্দোনেশিয়ার 'রুপিয়া' শোচনীয়ভাবে পড়তে লাগলো। জ্বর ছাড়তেই আমি সোজা দিল্লীর জন্যে প্যাসেজ্ বুক্ করলাম। বড় সাধের 'ক্যাম্বোডিয়া' (কম্বুজ) যাত্রা রদ করতে হল। অনেক কষ্টে জাকার্তা-সিঙ্গাপুর-রেঙ্গুন-ঢাকা-দমদম-পালম্ রুটে দু-তিনটি এয়ারলাইনএ নামা-উঠা করে জাভা থেকে বেরুবার ব্যবস্থা হল।

যাবার আগে আমাদের ভারতের দূত পার্থসারথি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলাম। ওঁর কাছে ইন্দোনেশিয়ার অনেক কথা শুনতে পেলাম।

জাকার্তা বিমান বন্দরে আমাদের ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডীজের আমেরিকান হিস্ট্রির প্রফেসর অগ্‌বর্ণ সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। উনি ইউ. এস.-এ ফিরছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যেমন বিদ্বান তেমনি হাসিখুশি। কয়েক মাস পরে শুনলাম তিনি

মারা গেছেন। উনি ছিলেন সোসিওলজির একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। ওঁর মত অমায়িক আর যথার্থ পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় হওয়া আমি আমার জীবনের মহাসৌভাগ্য বলে মনে করি।

আমার বিদেশ ভ্রমণ এবার শেষ হল। এরপর নিজের দেশের দক্ষিণ দিকটি কিছু কিছু দেখেছি (পুনা, গোয়া)। কিন্তু এ তো নিজেদের ঘরের কথা। এখন আশী পেরিয়েছি, শরীর ও মন দুই-ই জবাব দিতে বসেছে। এখন বাইরের দিক থেকে মন সরিয়ে ভেতরের দিকে মন বসাবার চেষ্টায় আছি—(৮ই নভেম্বর উনিশশ একাত্তর) জীবনটা এখন বহির্মুখী (objective) ছেড়ে অন্তর্মুখী (subjective) ধারায় চলুক।

॥ পরিশিষ্ট ॥

ফিরে এসে কন্‌স্টিটিউশন্‌ হাউসে আর জায়গা পেলুম না। দু-এক মাস বেয়াইবাড়ি (শ্রীশৈলেশ রায়ের তোগলক্‌ ক্রিসেণ্টএর সুন্দর বাঙলোতে) আরামে থেকে তাঁদের বুঝিয়েসুঝিয়ে লাজপৎ নগরে (দিল্লীর নতুন কলোনিতে) বাসা নিলাম। খোলা জায়গা, একটি ঘরের জায়গায় দুটি ঘর ও রান্নাঘর ইত্যাদি পাওয়া গেল। তবে সাপ্রু হাউস থেকে অনেক দূরে পড়লো। ট্যাক্সি করে যাওয়া রোজ রোজ ত সম্ভব হল না। যা হোক স্কুটার রিকৃশ কখনও বা বাসে (পারতপক্ষে বাসে নয়) আর অন্য উপায় না থাকলে অগত্যা ট্যাক্সিতে ইণ্টার-ন্যাশানাল স্টাডীজ্‌এ পৌছনো যেত। বাসায় ফেরবার সময় আবার অনুরূপ সমস্যা দাঁড়াতো। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে সাপ্রু হাউসের অনেক 'ফাংশান'ই বাদ দিতে হত। তবে লাজপৎ নগরে ভাল দুধ, নিজেদের মনের মত খাবার, একটু 'প্রাইভেসি'—এসব সুবিধাগুলি তো আমরা পেয়েছিলাম। আর দিনকতক মুটু (নটরাজ—আমাদের সবচেয়ে ছোট—তৃতীয় ছেলে) দিল্লী ফ্লাইং ক্লাবে ট্রেনিংএর জন্যে এইখানেই ছিল। সেটা সবায়ের পক্ষে সুবিধা হয়েছিল। আর মজার ব্যাপার হয়েছিল যে আমাদের দুজনকে (স্বামী-স্ত্রীকে) সেকেলে বুড়ো মনে করে প্রতিবেশীরা যেন খানিকটা কৃপার চক্ষে, খানিকটা সমীহ করে দেখতো। মোটের ওপর এই শহরতলীতে ভালই ছিলাম।

কিন্তু সংসারে দুঃখ কষ্ট বাদ দেওয়া যায় না। আমার স্ত্রীর বোনপো অনিলের (প্রসিদ্ধ বাঘ শিকারী অনিলদেব মুখোপাধ্যায়—এ. ডি. মুখার্জি নামেই খ্যাত) বড় ছেলে অরুণ—আমাদের নাতির দলে বয়সে, বিদ্যাবুদ্ধিতে সবচেয়ে বড়, দু-একদিন আমাদের লাজপৎ নগরের বাসায় এসে রইল। দিল্লীতে এসে কত ভাল ভাল বই কিনেছে দেখালো। তারপর বিকেলের দিকে দিল্লীর ঠিক উল্টো দিকে খাইবারে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে বলে চলে গেল। বলে গেল ঐখান থেকেই লক্ষ্মৌ চলে যাবে ওর বাবা-মার কাছে। তার পরদিন আমি সাপ্রু হাউসে ফোন পেলাম যে অরুণ মারা গেছে, আমরা যেন মীরাট যাই। অনিলরা সবাই তার পরদিন মীরাট পৌছুচ্ছে। তার আগেই যেন আমরা রমামন্দিরে (আমার শাশুড়ী ঠাকরণের বাড়ি) এসে যাই। মীরাটে সেদিনটা বড় ভয়ানক দিন। এরা

সবাই লক্ষ্ণৌ থেকে এল। মুটু তখন লক্ষ্ণৌ ফ্লাইং ক্লাবে ছিল। ও তো ওদের সঙ্গে এল, যেন পাথরের মত হয়ে গেছে, বাকশক্তি হারিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল অরুণ আত্মহত্যা করেছে, আর এরা কয়েক ঘণ্টা লক্ষ্ণৌ হস্‌পিটালে মুমূর্ষু ছেলেটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, মনে হয়েছিল বুঝি বেঁচে যাবে, তারপর যেমন ডাক্তার বলেছিলেন 'The patient had not the will to live' বাঁচাতে পারা গেল না। এই সব দেখে মুটুর ওরকম অবস্থা হয়েছিল।

এর পরিণাম শোচনীয় হয়েছিল। অনিলের মা (অরুণের ঠাকুরমা) আর অনিলের দিদিমা (আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী) কিছুদিন আগে পরে এঁরা দুজনেই যেন অরুণকে দেখবার জন্যে চলে গেলেন। রমামন্দিরে আর বাড়ির কেউ রইল না। এখন ঐখানেই হয়েছে মীরাটের 'সুপার মার্কেট'—'আপকা বাজার'।

এইসব দুর্ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডীজ ছাড়লাম। আমার তখন সত্তর বছর বয়স , ডাঃ আপ্পাডোরাই (ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজের ডিরেক্টর) নিজেই বললেন যে এখন আমার ছুটি হওয়া উচিত, তবে যেন মাঝে মাঝে আমি সাপ্রু হাউসে আসি, ছাত্ররা উৎসাহ পাবে ও সহকর্মীরা খুশী হবে।

১৯৫৫- বছর সাপ্রু হাউসে ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজে মনের আনন্দে কাজ করেছি, আর ছাত্র, কলিগ্‌দের সৌহার্দ্য পেয়েছি। জীবনের আর একটি অধ্যায় সমাপ্ত হল। ভেবেছিলাম যে অবসরপ্রাপ্ত লোক সব ঝঞ্ঝাট্ থেকে মুক্ত হবে। একেবারে ছুটি পাবার জন্যে উৎসুক ছিলাম, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। চাকরি থেকে অব্যাহতি পাবার আগেই টেলিগ্রাম এল যে মুটু (নটরাজ—ছোট ছেলে) বোম্বাই জুহু 'বীচে' প্লেন অ্যাক্‌সিডেণ্টে বেশী রকম আঘাত পেয়েছে। আমার মেজ ছেলে রাজরাজ (তখন ক্যাপ্টেন্) তখন খড়্গ্‌বাস্‌লা মিলিটারি এ্যাকা-ডেমিতে সিগনাল্‌স্ বিভাগে ট্রেনীদের শিক্ষা দিত। সে বোম্বাইয়ে ওর হাসপাতালে থাকবার ব্যবস্থা করলো আর কিছুদিনের মধ্যেই ওকে খড়্গ্‌বাস্‌লায় নিজের কাছে নিয়ে গেল (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫-)। আমার ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজে কাজ থাকায় তখুনি যেতে পারলাম না, মুটুর মা-ই প্রথমে ওর কাছে যেতে পারলেন। মুটুর পিঠে ও নীচের চোয়ালে জখমটা গুরুতরই হয়েছিল, ওর দাদা—আমার বড় ছেলে বিজয়রাজ ওকে ঐ ফ্লাইংএর কাজ ছেড়ে যে কোনো অন্য লাইনে যেতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু নটরাজ মোটেই রাজী হল না। রাজরাজেরও সেই মত ছিল যে ওকে ওরকম করে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়।

কিছুদিন খড়্গা বাস্লায় আমরা সবাই একত্রে ছিলাম। তারপর মুটু আবার নিজের ফ্লাইং কোর্স শেষ করবার জন্যে চলে গেল, আমরা মীরাটে ফিরে এলাম। আমাদের দিল্লীতে থাকতে থাকতেই মুটু ফ্লাইং লাইসেন্স পেল। কিছুদিন চা বাগান অঞ্চলে আসামের এক প্রাইভেট্ এয়ার ট্রানস্পোর্ট কোম্পানিতে কাজ করলো। তারপর উনিশ-শ বাষট্টি সালে 'নেফায়' চীন আক্রমণের সময় এয়ার ফোর্সে ছিল। এখন ও ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্-এর পাইলট্। কখনও আসামে কখনও বা নেপালের দিকে ফকার ফ্রেণ্ডসিপ প্লেন নিয়ে যায়। ওর অনেক দিনের সাধনা সফল হল। তবে ও ওড়ে (হাওয়ায়, অন্য অর্থে নয়), সে জন্যে আমাদের দেশের বাপ মা ওকে কন্যাদান করতে নারাজ দেখা গেল। আমরা ভয় পেয়েছিলাম ওর বিয়ে আমরা দেখে যাব কিনা।

উনিশ'শ একষট্টি সালের শেষের দিকে আমার চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এল। ওখানে আমার দশ-বারো বছর আগের কৃতী ছাত্র বুদ্ধপ্রকাশ ইতিহাস বিভাগেই বেশ উচ্চ পদে ছিল। আমি সেইখানেই কয়েকদিন থাকবো স্থির করেছিলাম। বেশ আরামে সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম, সাহারান্পুর স্টেশনে গাড়ি থেমে গেল, শোনা গেল সেদিন আর কোনো গাড়ি আগে বা পিছু কোনো দিকে যাবে না। তবে ট্রুপ ট্রেন (সৈন্য বোঝাই ট্রেন) আপ্ অ্যাণ্ড ডাউন লাইনে খুব চলছে। আমাদের একজন সহযাত্রী খবর নিয়ে এলেন যে গোয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে গোলযোগের আশঙ্কা আছে। ওদিকেও সৈন্য পাঠানো হচ্ছে।

তার পরদিন অতিকষ্টে তো চণ্ডীগড় পৌঁছানো গেল। চণ্ডীগড় যেমন সুন্দর জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়টিও তেমনি সুন্দর। আমার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী। আমি আমার 'টকে' কম্বুজে ও যবদ্বীপে বৌদ্ধ শ্রমণ ও শৈব ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করেছিলাম। তাঁদের অক্ষয়কীর্তির কথা বলেছিলাম। আমার বক্তব্য শেষ হলে দ্বিবেদীজি বেশ মজার কথা বললেন ব্রাহ্মণদের বিষয়ে। একবার শান্তিনিকেতনে মঙ্গোলিয়া থেকে কয়েকটি বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছিলেন। তাঁদের শান্তিনিকেতন খুব ভাল লেগেছিল। একদিন দ্বিবেদীজির সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁরা শুনলেন যে উনি ব্রাহ্মণ। ওঁরা তো বিশ্বাস করতেই চান না যে উনি, অমন একটি অমায়িক ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ হতে পারেন। দু-তিন বার তাঁরা ওঁকে বললেন যে উনি ঠাট্টা করছেন, উনি কখনই

ব্রাহ্মণ হতে পারেন না। দ্বিবেদীজি আশ্চর্য হয়ে ওঁদের জিজ্ঞেস করলেন যে ওঁরা ব্রাহ্মণ শব্দের কি মানে করেন। ওঁরা যেন ভয়ে ভয়ে বললেন যে ব্রাহ্মণরা তো রাক্ষস, মানুষ খায়। ওদের কবলে পড়লে তো আর বাঁচবার আশা থাকে না। তখন বোঝা গেল যে মঙ্গোলিয়াতে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মরাক্ষস একই বস্তু। অতি ভয়ানক ব্যাপার।

মীরাটে ফিরে এসে শুনলুম যে রাজরাজ গোয়া অভিযানে গেছে। মনু (রাজুর স্ত্রী) আর্থরাইটিসে ভুগছে আগ্রায়। আমাদের আগ্রা যেতে হবে বিনা বিলম্বে। দেরী কিন্তু হল কেন না মীরাটে তখন আমরা দুজনেই ছিলাম। বিজুরা (আমার বড় ছেলে বিজয়রাজ) ও তার স্ত্রীপুত্র কয়েকদিন পরে বাড়ি ফিরে আসতেই আমরা আগ্রা পৌঁছুলাম। ট্রেনে গাড়ির জানলার শার্সি বাঁ হাতের দুটি আঙুলের ওপর পড়ে ও দুটি আঙুল থেঁতো হয়ে যায়। কিছুদিন তো ভয় ছিল ও আঙুল দুটি বুঝি হারাতে হয়। যাক, তা হয়নি কিন্তু আঙুল সারতে দেরী হওয়ায় ডাক্তারেরা ধরে ফেললেন যে আমার ডায়াবিটিস্ হয়েছে। গরম দুধে বেশ করে গুড় (মীরাটের গুড় চমৎকার) বা চিনি দিয়ে খাওয়া বন্ধ হল। এখনও সে সব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়।

এদিকে মনু আর্থরাইটিসে খুব ভুগলো। আর সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হল রাজুর (মেজর রাজরাজের) গোয়ায় জীপ্ অ্যাক্সিডেন্ট। ওরা তিনজন অফিসার রাত্রিবেলা জীপে যাচ্ছিল মাইল দশেক দূরে এক জায়গায়। রাস্তার অবস্থা ছিল খারাপ, জীপের অবস্থা তথৈবচ, জীপ পড়লো বিশ ফুট নীচে খাদে। খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে এদের প্রাণরক্ষা হয়েছিল তবে আঘাত খুবই গুরুতর হয়েছিল। রাজু তো দু মাস হাসপাতালে ছিল। প্রথম দু সপ্তাহ সংকটময় অবস্থায়। এখনও মাঝে মাঝে ওর পিঠে ব্যথা হয়।

উনিশ-শ বাষট্টি (১৯৬২) সাল বেশীর ভাগ দুর্ভাবনায় কাটলো। ছিলাম আমরা আগ্রার সবচেয়ে ভাল জায়গায়—মল রোডের সিসিল ম্যানসানস (তখন মিলিটারির হাতে)। তাজমহল হেঁটেই বেড়িয়ে এসেছি—পূর্ণিমার আলোতে। অমাবস্যার অন্ধকারেও দেখেছি। আমার ভাই সুজনরাজের বেয়াই শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী মহাশয়ের বাঙলা লাইব্রেরীর ভাল বাছাই করা বই পড়বার সুযোগ পেয়েছি। তবে রাজু ও মনুর অসুখের জন্য দুজনেরই মনে দুর্ভাবনা বরাবরই ছিল।

দুর্ভাবনার তো এ সংসারে অন্ত নেই। আগ্রায় থাকতে থাকতে খবর পেলাম

যে বাদল (শক্তিকুমার—আমার জাঠতুতো ভাই সনৎকুমারের ছেলে) হার্টফেলিওর হয়ে হঠাৎ মারা গেছে। বছর দুয়েক আগে তার বিয়ে আমরাই দিয়েছিলাম। ওর অকালমৃত্যুতে মনটা বড় দমে গেল।

দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিজের কাজ নিয়ে থাকায় কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আগ্রা থেকেই দুবার দিল্লী গেলাম। একবার একটি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বিষয়ের সেমিনারে আর একবার সাউথ ইষ্ট এশিয়ান্ ট্যুরিজম্ সংক্রান্ত একটি থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি ঐ অঞ্চলের এক ছাত্রছাত্রী গোষ্ঠীকে দিল্লী, আগ্রা ও আর আমাদের দেশের দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে একটা শর্ট টক্ দিতে। নন্ অ্যালাইন্‌মেণ্ট সেমিনারে ভাগ নিয়েছিলেন সিংহলের, ফিলিপাইনের ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দূতেরা। তবে পাকিস্তানী দূত কিছু বলেননি, কেবল শুনেই গেলেন। পাকিস্তানী দূত বাঙ্গালী (পূর্ববঙ্গের) বেরুলেন, আমার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথাবার্তা বললেন। আমি তাঁকে বললাম আমি লাহোরেই পড়াশুনা করেছি আর লাহোর আর একবার দেখে আসতে চাই। তিনি বলেছিলেন যে আমি যদি চাই স্বচ্ছন্দে লাহোর যেতে পারি।

মীরাট ফিরে গিছলাম, কিন্তু উনিশ-শ বাষট্টি সালের অক্টোবর বড়ই দুঃসংবাদ নিয়ে এল। কতদিন থেকে ভারত চীন মৈত্রীর স্বপ্ন দেখছি, উনিশ-শ চুয়ান্ন সালে চীন ঘুরে স্বপ্নটা যেন বাস্তব রূপ নিচ্ছিল। এবার সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। রাজ-রাজকে (মেজর রাজরাজ চ্যাটার্জি) হিমালয়ের কোনো দূর দুর্গম স্থানে যেতে হবে, মনু, টুকি, বাবলুর কাছে থাকবার জন্যে আবার আগ্রা এলাম। এক সন্ধ্যার কথা খুবই মনে আছে। নেফায় আমাদের মারাত্মক হার হয়েছে। চীনা সৈন্যবাহিনী আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে। আগ্রা থেকে বড় একটি সৈন্যদল বিমান পথে নেফা যাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, তারি অপেক্ষায় আমরা সিসিল ম্যান্‌সানস্‌এ বসে আছি। অতগুলি প্লেন যোগাড় করতে কিছু দেরী হচ্ছে শোনা গেল। রাতটা কেটে গেল। অপেক্ষায় থাকতে হল। রেডিওতে শোনা গেল যে চীনা বাহিনী ফিরে যাচ্ছে। আসামের মধ্যে এগিয়ে আসবার সংকল্প ছেড়ে দিয়েছে। রাজু ও অন্যান্য অফিসাররা, যাদের কাছে আমি তখন এসব শুনছিলাম, তারা একবাক্যে এ খবর শুনে বললে, এ যেন কেউ গালে চড় মেরে বললো আই অ্যাম সরি। এর চেয়ে যুদ্ধ হয়ে যাওয়া ভাল ছিল। যাই হোক এখন তো যুদ্ধবিশারদদের মতে এটা চীনের কৃপার নিদর্শন নয়। হিমালয় পার করে ভারতের মধ্যে ঢুকে যুদ্ধ চালানো চীনের পক্ষে অসম্ভব হত। শীতকালে

তো সমস্ত চীনা বাহিনী ধ্বংস হয়ে যেত। হিমালয়ের পরপার থেকে কোনো রকম সাহায্য আর আসতে পারতো না।

এরপর কয়েক বছর এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা লেখবার মত নেই। কিছু নিজের ইচ্ছামত পড়াশুনা করেছি। ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডিজের কাজ (বাড়ি বসে যা করা যায়) মাঝে মাঝে করেছি। আমার আগেকার লেখা বইয়ের (ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মডার্ন জাপান, মডার্ন চায়না বিষয়ক পুস্তক) পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ আমাদের মীরাট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র চন্দ্রপ্রকাশের সাহায্যে প্রকাশ করতে পেরেছি। নতুন বই একটি 'সাউথ ইস্ট এশিয়া ইন্ ট্র্যান্‌জিশন্' লিখেছি, আমার চারটি রিসার্চ স্কলারের সহযোগিতা পেয়েছি এ কাজে। ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচায়নার সমসাময়িক বৃত্তান্ত এতে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির প্রথম সংস্করণ বেশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যবস্থা এখনও হয়ে উঠলো না।

পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে। নাতিনাতনীরা বড় হয়েছে, সুস্থ সবল হয়েছে, লেখাপড়া বেশ করছে, দুইটি দৌহিত্রীর বিয়ে হয়েছে। তার একটি 'বেবি শো'র প্রাইজ পাবার মত চৎমকার মেয়েও হয়েছে। আমরা প্রমাতামহ প্রমাতামহীর দলে উঠেছি। ঈশ্বরের কৃপায় সংসারযাত্রা মোটের ওপর ভালই হয়েছে। ছেলেরা, জামাইরা ভাল কাজ ভালভাবে করছে। মেয়ে দুটি নিজেদের সংসার বেশ গুছিয়ে চালাচ্ছে। এমনি করে উনিশ-শ সত্তর সালের মার্চ মাসে পৌছনো গেল।

আমরা স্বামী-স্ত্রী তখন গোয়ায় আমাদের ছোট জামাইয়ের সমুদ্রের উপর সুন্দর কোয়ার্টার্সে আছি। একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশের ঘরে টেলিফোনে কথা হচ্ছে শুনলাম। পরিচিত গলায় কে বলছে, বাবা মাকে বলে তাঁদের বুঝিয়ে তাঁদের অনুমতি নাও। উঠে পড়লাম। ছোট জামাই আমাদের ঘরে এসে বললে যে হুটু (আমাদের ছোট ছেলে নটরাজ, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্‌এর পাইলট্) বিয়ে করতে চায়। আপনাদের সম্মতি চাইছে।

আগেই বলেছি যে হুটু 'হাওয়াই জাহাজে' হাওয়ায় ওড়ে, তাই ওর বিয়ে হওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জামাই কৈলাসনাথের মুখে এ কথা শুনে আমাদের তো বড়ই আশ্চর্য বোধ হল। কৈলাস ধীরেসুস্থে বলতে লাগলো যে হুটু একটি ভাল পরিবারের সুশীলা, সুশ্রী, অল্প বয়সের কুমারীকে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন প্রদেশের। হুটু কিন্তু ওকেই বিয়ে করবে স্থির করেছে আর খুবই

আশা করছে যে আমরা এ বিয়েতে মত দেব। তার পরদিন ফোনেতে আমার সঙ্গেও স্নটুর (নটরাজের) কথা হল। আমি মেয়েটির কথা আরও কিছু জিজ্ঞেস করলাম। তারপর আমাদের সম্মতি জানালাম। স্নটুর মা প্রথমে তো বিলক্ষণ বিচলিত হয়েছিলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ সময় চুপ করে ছেলের সঙ্গে (উনি আবার 'কোলের ছেলে', যদিও ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা) পাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এসব ভেবেচিন্তে রাজী হলেন। আমি তখন আমার বড় ছেলে বিজয়রাজকে (মীরাট কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান) আর মেজ ছেলেকে (লেঃ কর্ণেল রাজরাজ চ্যাটার্জী, মিলিটারি কলেজ অফ টেলিকমিউনিকেশন্ এন্‌জিনিয়ারিং, মাউ) খবর দিলাম আর বোম্বায়েতে স্নটুর বিয়েতে আসতে লিখলাম। বিজুর স্কুটার অ্যাক্সিডেণ্টে গুরুতর রূপে আঘাত লেগেছিল। ওর আসা সম্ভব ছিল না। রাজু ছুটি পেল না সুতরাং আমাকেই বিয়ে দিয়ে বরকনের সঙ্গে যেতে হল। ব্যাপারটা সত্যিই নাটকীয় রূপে ঘটেছিল। তবে আমি ও স্নটুর মা এ বিয়েতে সম্মতি দিয়ে ভুল করিনি। কিছুদিনের মধ্যেই বিজুর সেই স্কুটার অ্যাক্সিডেণ্টের ফলে ব্রেনে ব্লড্‌ক্লট্‌ হল। শরীরের ডান দিকটা পক্ষাঘাতের মত প্রায় অচল হয়ে পড়্‌লো। দিল্লীর অল্ ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সস্‌এ অপারেশন্ করে সেই ক্লট্‌টা বার করে দিলে তৎক্ষণাৎ হাত পা আবার সহজ ভাবে সচল। কয়েক দিনের মধ্যেই বিজু বাড়ি ফিরে এল। এই দুঃসময়ে এবং এরপর আমাদের দুই বুড়োবুড়ীকে সেবাযত্নে আমাদের নতুন বৌমার যে রকম নিজের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিছল তাতে তিনি পরিবারের সকলেরই প্রিয়পাত্রী হয়েছেন। ঈশ্বর করুন নিজে সুখী থাকুন ও সবাইকে সুখী রাখুন।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। এবার আমার স্মৃতিকাহিনী শেষ করা যাক। মন ও শরীর রীতিমত জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গৃহিণীরও বানপ্রস্থ অবলম্বনের বয়েস হয়েছে। সবচেয়ে ছোট নাতিটি—স্নটু-আইভির সদানন্দ শিশুটি—আর তার চেয়ে তিন বছর বড় ভাইটি এখন তাঁর নয়নের মণি। আমাদের জীবনবৃত্তান্ত এইখানেই সমাপ্ত করার ঠিক সময়।

তবে অনেক বছর ধরে যে প্রশ্ন মনে বার বার জেগেছে, যে বিষয়ে অনেকের মত নিতে চেষ্টা করেছি, অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি, সেই সমস্যাটির (যার কথা আগেও বলেছি) উল্লেখ করে এই লেখা শেষ করব। প্রশ্নটি নতুন কিছু নয়, মানুষ বোধ হয় চিরকালই এর উত্তর খুঁজেছে। তবে এর উত্তর পেয়েছে কি ?

খুব সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করছি :—"ঈশ্বর মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান তবে তাঁর জগতে দুঃখ কষ্ট এত কেন ?" অনেক ভেবেছি, এ বিষয়ে মহা মহা পণ্ডিতদের ধারণা বুঝতে চেষ্টা করেছি। সকলেই বোধ হয় এ রকম করে আর নিজের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আমার নিজের ধারণা হল যে সৃষ্টিকর্তা এক বিরাট শক্তি, বিরাট প্রবাহের মত ভালমন্দ এই পরিস্থিতি থেকে আরও ভাল, আরও মঙ্গলময় জগতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা প্রত্যেকে তাঁর এই এগুবার পথে সহযোগিতা করছি। আমাদের কৃত মন্দ কাজ তাঁর এগুবার পথে বাধা দেয়। প্রত্যেক ভাল কাজ তাঁর সর্বমঙ্গলময় লক্ষ্যে পৌঁছুতে সাহায্য করে। জীবনের শেষ দিকটা এই ধারণার অনুসারে চালাতে পারব কি ?

॥ শেষ ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	Prof,	Prof.
৭	শিখেদের	শিখ্‌দের
২৪	জয়কিষণ	হরকিষণ
২৫	যস্তেসা	যস্তেমা
৩০	বলেছো	বলেছে
৫৫	প্রেসিডেণ্ট	রেসিডেণ্ট
৬৪	কীডিস্‌	স্যদেস (Coedes)
৬৪	বের্গাঁ	বেরগাইন্‌ই (Bergaigne)
৬৮	ওয়াদেন	ওয়াথেন (Wathen)
৭০	সেজদা	মেজদা
"	মন্রো	মানোরা
৭১	purpoise	porpoise
"	জলে পড়ায়	জলে ঐ পড়ার
৭৩	wngon Lit	Wagonlit
"	hyons	Lyons
"	Ferench	French
"	ক্যানেল	চ্যানেল (Channel)
৭৪	Gara	Java
৮৬	পরীক্ষায়	পরীক্ষার্থীর
৮৭	ছেলে ভাল	ছেলে—ভাল
৮৮	আমাকে,	আমাকে
৯০	কিন্তু সুস্বাদু	কিন্তু সুস্বাদু,
৯১	Corotএর	Corotর (করোর)
"	Indepents	Independents
৯৩	আন্দোলন	আন্দোলনে
৯৪	Blagden,	Blagden
৯৭	Eaude cologne	Eau de Cologne
"	জানে	জানেন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৭	করেছে	করেছেন
„	জেস্	ভাস্ (vase)
৯৮	কিংস	কিংস্
১০২	de	die
„	Funiculer	Funicular
১০৩	আমান্নুলার	আমান্নুলার
১০৭	১৯ বছর	২২ বছর
„	বিয়াল্লিস	ছেচল্লিস
১০৮	প্রভৃতিতে	প্রভৃতিতে ও
১১২	যদুনাথ সিংহ।	যদুনাথ সিংহ,
১১৯	Webbley-scott	Webbley-Scott
১২১	এখনও Lt. Colonel	এখন ও Full Colonel
„	Israels	Israel
১২২	বেসিন	বেসিল (Basil)
১২৫	ভাইস্গুরু	ভাই গুরু
১২৬	সিয়াসারে	মিরাসার
১৩৭	লাসা	লামা
১৩৯	চুটো	চুটে
১৪২	তার থেকে।	তীর থেকে
১৪৩	জান ডার্ক	Jeanne d' Arc
১৫১	দৃশ্যের ছুটি	landscape
১৫৭	ডাল ঝোলা	ডাল ঝোলা গাছ
১৬২	জ্যালঙ্কো	হ্যাঙ্কৌ
১৬৩	সুচো	সুচৌ
১৭০	মলেব	মালায়া
১৭৪	বাহাসা, ইন্দোনেসিয়া	বাহাসা-ইন্দোনেসিয়া
„	আর্চাইড	আর্কাইড
১৭৭	কাস্টমারিন	কাস্টমারি 'ল'
১৭৮	Don Arn	Von Arx

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৮	পুইকরকড	পূর্বচরক
”	পেমহানগুয়ান্ট্	Pembanguan
”	প্রকাশিত	প্রচলিত
”	সয়লো	স্থয়নো
১৭৯	নাপেত্তে পারে	লাগতে পারে
১৮২	মারহেনিজ্ম	মারহায়েনিজ্ম
”	মারহেন	মারহায়েন